আল্লামা শিবলী নু'মানী

ইসলামী দর্শন

ইসলামী দর্শন

ইসলামী দর্শন

আল্লামা শিবলী নু’মানী

ইসলামী দর্শন

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পঞ্চদশ শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ইসলামী দর্শন ঃ
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
এম. এম., এম. এ. (ট্রিপল), এম. ফিল
সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু-ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ৯৮৭
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগার
ইসলাম-দর্শন
২৯৭.০১

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর, ১৯৮১
ভাদ্র, ১৩৮৮
জিল্‌কদ, ১৪০১

প্রকাশ করেছেন ঃ
মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ
এম. এ. কাইয়ুম

ছেপেছেন ঃ
তাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৬এ/১, কোর্ট হাউজ স্ট্রীট, ঢাকা-১

বেঁধেছেন ঃ
সোসাইটি বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
২৬, কুমারটুলী লেন, ইসলামপুর রোড, ঢাকা-১

মূল্য ঃ ৪০.০০

ISLAMI DARSHAN : Islamic Philosophy written by Allama Shibli Numani in Urdu and translated by Muhammad Abdullah into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah.

Price Tk. 40·00 ; U. S. Dollar : 5·00

প্রসংগ-কথা

কোন্ কোন্ মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্-রসূল, কুরআন-হাদীস, ইহকাল-পরকাল, শরীঅত-তরীকত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করা অপরিহার্য—এসব জানা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এ ছাড়া কি তত্ত্ব বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো এবং ফলে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সম্পর্কে নানা মতবাদের উদ্ভব হলো, তা অনুধাবন করাও আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে যুগে যুগে অন্য ধর্মাবলম্বী ও বিধর্মীদের দিক থেকে ইসলামের ধর্মীয় মতবাদ, সামাজিক বিধি-বিধান, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও নির্দেশনা এবং সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, আবার অন্য দিক থেকে ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্যের গুণ-গানও করা হয়েছে এবং এই সৌন্দর্য-সুরভির আকর্ষণে মোহিত হয়ে বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং তাদের শক্তি-সামর্থ্য, তাদের ভাবধারার প্রগতিশীলতা আর যুগোপযোগিতাও জগদ্বাসীর সামনে দিন দিন ভাস্বর থেকে ভাস্বরতর হয়ে উঠছে। আমাদের কর্তব্য, আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিধর্মীদের দিক থেকে ইসলামের বিধি-বিধান যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে বা হচ্ছে এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে মুসলিম তরুণদের মনে নিজ ধর্ম সম্পর্কে যে সব সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে, তা নিরসন করা, অন্যদিকে অমুসলিম মহল থেকে ইসলামের যেসব সর্বজনীন মূল্যবোধের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে, তা তুলে ধরা।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা নাস্তিকদের দিক থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনীত হয়েছে বা আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের মনে নিজ ধর্ম সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ে যেসব প্রশ্ন জাগে, সে বিষয়ে তিনি সম্যকভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও আধুনিক পদ্ধতিতে উর্দু ভাষায় 'ইল্মুল-কালাম' ও 'আল-কালাম' নামক দু'টি বই রচনা করেন। প্রথমোক্তটিতে তিনি 'ইল্মে কালাম' তথা

ধর্মীয় বিশ্বাস শাস্ত্রের মূলনীতি, 'ইল্‌মে কালাম'-এর ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরেন। শেষোক্তটিতে ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলো এবং ইসলামী বিধি-বিধানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিবৃত যাবতীয় বিষয়ের খুঁটিনাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

বাংলা সাহিত্যে এরূপ একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল্লামা শিবলী রচিত 'ইল্‌মুল-কালাম' ও 'আল-কালাম' নামক গ্রন্থদ্বয় বাংলায় রূপান্তরিত করে 'ইসলামী দর্শন' নামে অভিহিত করেন এবং তা দু'খণ্ডে বিভক্ত করেন। প্রথম খণ্ডে 'ইল্‌মুল-কালাম' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'আল-কালাম-এর অনুবাদ স্থান লাভ করে। অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলা সাহিত্যের এ প্রয়োজন পূরণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্-কে জানায় আন্তরিক মুবারকবাদ।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক,
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাং, ঢাকা—২২। ৮। ৮১

উৎসর্গ

স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ
আমার পত্নী ওয়াযীফা বেগম-কে

—অনুবাদক

দ্বিতীয় খণ্ড

আল-কালাম

ইসলামী দর্শন
দ্বিতীয় খণ্ড

আধুনিক ইল্‌মে কালাম

গ্রন্থের প্রথমাংশেই বলা হয়েছে যে, প্রাচীন ইলমে কালামের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক ইলমে কালাম গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ইলমে কালামকে সাজানো গোছানোর ফলে যে নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে আধুনিক ইলমে কালামরূপে আখ্যায়িত করা হলে তা মোটেই অসমীচীন হবে না। নিম্নে বিষয়টির বিশ্লেষণ করা হচ্ছেঃ

পাঠকগণ পূর্বেই অবগত হয়েছেন যে, ইল্‌মে কালামের বিভিন্ন শাখা রয়েছে এবং সেগুলোর বর্ণনায় কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ বিভিন্ন পদ্ধতিও অবলম্বন করেছেন। পূর্বসূরিগণ যে বর্ণনা-রীতি অবলম্বন করেছিলেন, সেটাই ছিল সত্যিকারের ইলমে কালাম। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, বর্তমানে পূর্বসূরীদের একটা রচনাও খুঁজে পাওয়া যায় না। 'মিলাল ও নিহাল্‌', 'তফ্‌সীর-ই-কবীর' এবং ইলমে কালামের অপরাপর গ্রন্থে পূর্ববর্তীদের কিছু কিছু উক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইলমে কালামের জরুরী বিষয়গুলো অনুধাবনের জন্য এসবের পুরো-পুরি সংকলন করা প্রয়োজন।

পরবর্তীদের মধ্যে যাঁরা বাস্তবধর্মী ছিলেন, তাঁরা ব্যতিক্রমধর্মী পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা পাঠ্যসূচীভুক্ত পুস্তকগুলো রচনা করতেন জনসাধারণের মতিগতি অনুসারে। কিন্তু তাঁদের প্রকৃত ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করতেন অপরাপর গ্রন্থে। শেষোক্ত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাই নির্দেশ দিতেন যে, এগুলো যেন সাধারণ্যে প্রকাশ না করা হয়। এ প্রসংগে ইমাম গাযালী রচিত 'কাওয়াইদুল্‌ আকায়েদ্‌', 'ইক্‌তেসাদ্‌', 'তাহাফাতুল্‌-ফালাসিফাহ্‌' এবং আরো অন্যান্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

পূর্ববর্তিগণ বিভিন্ন স্থানে তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রথমোক্ত রচনাবলী সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় এ মন্তব্য করেছেনঃ এগুলোর মধ্যে

যে সব কথা বিবৃত হয়েছে,তা প্রকৃত কথা নয় ; জনগণের প্রচলিত ধ্যানধারণা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই এগুলো রচিত হয়েছে।

ইমাম গাযালী স্পষ্টতঃই বলেছেন যে, তিনি সাধারণ্যে প্রচলিত গ্রন্থসমূহে তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন নি।

'জওয়াহিরুল্ কুরআন' নামক গ্রন্থে তিনি কুরআন কেন্দ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

"কাফেরদের সাথে তর্কবিতর্ক করা—এটা হলো একটি বিশেষ বিদ্যা। এ বিদ্যা থেকেই ইলমে কালামের সৃষ্টি। এর উদ্দেশ্য হলো—বিদা'তসমূহ রোধ করা এবং সন্দেহ দূরীভূত করা। বিষয়টি পরিচালনা করার দায়িত্ব বর্তায় মুতাকাল্লিমদের (কালামশাস্ত্রবিদদের) উপর। আমি বিষয়টি দু'টি পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছি : কতগুলো গ্রন্থ লিখেছি সাধারণ লোকের জন্য। 'রিসালা-ই-কুদ্‌সিয়া' এ শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার কতগুলো রচনা করেছি ওঁদের জন্য, যাঁরা জন-সাধারণের উর্ধ্বে রয়েছেন। 'আল্-ইক্‌তেসাদ্ ফিল্ ই'তেকাদ্' নামক গ্রন্থটি এ শ্রেণীভুক্ত। এ বিদ্যার লক্ষ্য হলো জনসাধারণের আকীদা অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিদা'তের অনুপ্রবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখা। এ বিদ্যায় সাধারণত গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করা হয় না। আমার 'তাহাফাতুল-ফলাসিফাহ্', 'মুস্‌তায্‌হিরী' (বাতিনিয়াদের খণ্ডনে রচিত), 'হুজ্জাতুল্-হক্', 'কাসিমূল্ বাতিনিয়াহ্' এবং 'কিতাবুল্ মুফাস্‌সাল্ লিল-খিলাফ্ ফী উসূলীদ্‌দীন্' শীর্ষক গ্রন্থগুলো এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।"

এ স্বীকারোক্তির কথা বাদই দিলাম। ইমাম গাযালীর গ্রন্থাবলী স্বয়ং এ বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করছে। ইলমে কালামের কিতাব-সমূহে তিনি যে সব আকায়েদ জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে তিনি অন্যান্য রচনায় বলেছেন : এ সব আকায়েদের আসল রূপ অন্য কিছু! এখানে যা বিবৃত হয়েছে, ব্যাপারটি মূলত তা নয়!

ইমাম গাযালী সে সব রচনায় ইসলামের আসল আকায়েদ এবং সেগুলোর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি সূক্ষ্ম কৌশলে গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। এজন্যই সংক্ষিপ্ত ও সহজ হওয়া সত্ত্বেও সে গ্রন্থগুলো জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়নি। আল্লাহর সত্তা, গুণবলী, কর্ম এবং কেয়ামত সংক্রান্ত আকায়েদকে

তিনি 'ইহ্-ইয়াউল্-উলুম' এবং অন্যান্য গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেন। 'জওয়াহিরুল্ কুরআন' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

"আমার হাতে সময় ছিল খুবই কম ; অসুবিধা ও বিপদ ছিল অনেক ; বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারী বলতে গেলে ছিলই না। তা সত্ত্বেও আমি সাধ্যমত আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী, কর্ম এবং কেয়ামত—এ চারটি বিষয়ের প্রাথমিক তত্ত্বকথা কোন কোন রচনায় বর্ণনা করেছি। কিন্তু আমি সেসব গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিনি। কেননা, অধিকাংশ লোকই এসব তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম। এতে তাদের লাভ না হয়ে ক্ষতিই সাধিত হয়। যাঁরা এসব বিষয়ে কিছুটা জানেন-শোনেন বলে দাবী করে থাকেন, মূলত তাঁরাও অজ্ঞ। এ ধরনের রচনাবলী কেবল সেই সব লোকের কাছেই প্রকাশ করা উচিত, যাঁরা প্রকাশ্য জ্ঞান লাভে পূর্ণতা অর্জন করেছেন ; কু-রিপু দূর করে নিজেদের মধ্যে সু-প্রবৃত্তি গড়ে তুলেছেন ; দুনিয়ার লোভ-লালসা ত্যাগ করেছেন ; যাঁরা সত্যের অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই জানেন না ; তদুপরি তাঁরা হবেন মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সরল প্রাণের অধিকারী। এসব রচনাবলী যাঁদের হস্তগত হবে, তাঁদের পক্ষে সেগুলো এমন লোকের কাছে ব্যক্ত করা হারাম হবে, যারা উপরিউক্ত গুণাবলীর অধিকারী নয়।"

ইমাম গাযালীর নিম্নলিখিত কথাগুলো ভাল করে চিন্তা করে দেখুন, তিনি বলেন ঃ "সাধারণ লোকের পক্ষে গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এরূপ বৃথা চেষ্টায় লাভ না হয়ে তাদের ক্ষতিই সাধিত হয়।" কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, ইমাম গাযালী কেবল সাধারণ লোক সম্পর্কেই এ কথাগুলো বলেছেন। তাই আলেম-বর্গের কাছে গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করতে কি অসুবিধা রয়েছে? এ সন্দেহ দূর করার জন্যেই ইমাম গাযালী বলেছেন ঃ বর্তমানের আলেম-বর্গও সাধারণ লোকের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম গাযালীর মতে, কেবল উপযুক্ত শ্রোতার কাছেই গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করা যায়। উপযুক্ত শ্রোতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ এরূপ ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থের লেশমাত্র নেই। এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আসল সত্য প্রকাশে সাধারণ লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তাই সত্য শ্রবণের জন্য উপযুক্ত হবে সেই ব্যক্তি, যে সাধারণ লোকের মোটেও পরোয়া করে না।

ইমাম রাযীর জীবন-চরিতে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে, আসল কথাটা তিনি কি অদ্ভুত ভংগিতে প্রকাশ করেছেন। ইব্নে রুশ্দ্ তাঁর রচনাবলীতে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, জনসাধারণের কাছে আসল হকিকত বর্ণনা করা উচিত নয়।

আধুনিক ইলমে কালাম-রচয়িতাদের উচিত, এ মহৎ লোকেরা যে সব সম্পদ অস্পষ্ট রেখে গেছেন, তা জনসমক্ষে তুলে ধরা।

প্রাচীন ইলমে কালামে কেবল ইসলামী আকায়েদ নিয়ে আলোচনা করা হতো। কারণ তখন বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করতো, তা ছিল আকায়েদ সংক্রান্ত। কিন্তু বর্তমানে ধর্মকে ঐতিহাসিক, নৈতিক, তমুদ্দুনিক—বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে দেখা হয়। ইউরোপে আকায়েদের দিক থেকে কোন ধর্মকে ততটা দূষণীয় বলে মনে করা হয় না, যতটা তাকে আইনগত ও নীতিগত বিষয়াদির দিক থেকে মনে করা হয়। তাঁদের মতে, কোন ধর্ম যদি একাধিক বিবাহ, তালাক, দাসত্ব বা যুদ্ধকে বৈধ বলে মনে করে, তবে সেটাই সে ধর্মের অযথার্থ ও বাতিল বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য সব চাইতে বড় যুক্তি। তাই ইলমে কালামে এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত। ইলমে কালামের এ অংশটি হবে 'আধুনিক ইলমে কালাম'।

এর জন্য যা সবচাইতে বেশী প্রয়োজন, তা হলো: এর যুক্তি-গুলো হবে সাদাসিধে ; তাহলে যেন তা খুব শিগগীর উপলব্ধিতে আসে এবং মানুষের মনে রেখাপাত করে। প্রাচীন ইলমে কালামে থাকতো জটিল ভূমিকা, যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত পরিভাষা এবং খুব সূক্ষ্ম চিন্তা-মূলক কথাবার্তা। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্য নীরব হয়ে যেতো, কিন্তু তাদের মনে বিশ্বাস ও অভিজ্ঞানের উদয় হতো না।

মোটকথা, আধুনিক ইলমে কালাম সংকলনের সময় এ বিষয়-গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সর্বশেষে সে সব মহৎ লোকদের নামগুলোও বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন, যাঁরা এই ইলমে কালামের উৎসমূল। তাঁরা হলেন: আবূ মুসলিম ইস্ফাহানী, কাফ্ফাল্, ইব্নে হায্ম্, ইমাম গাযালী, রাগিব ইস্ফাহানী, ইব্নে রুশ্দ্, ইমাম রাযী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম

সারা বিশ্বে এ মর্মে হৈ-চৈ সৃষ্টি হয়েছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন নাকি ধর্মের বুনিয়াদকে শিথিল করে দিয়েছে। দর্শন ও ধর্মের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমনি হৈ-চৈ সব সময়েই উত্থিত হয়ে আসছে। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু যে বিষয়টি নতুন, তা হলোঃ আজকাল দাবী করা হচ্ছে যে, প্রাচীন দর্শনের ভিত্তি ছিল অনুমান ও অনুসিদ্ধান্তের উপর। তাই সে দর্শনবলে ধর্মকে উৎখাৎ করা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে, আধুনিক দর্শনের ভিত্তি হলো —পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। তাই ধর্ম এর সামনে টিকে থাকতে পারে না।

এই আওয়াজটি উঠেছে ইউরোপ থেকে এবং তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। এটা কতটুকু সত্য বা অসত্য, তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।

গ্রীসে পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, আল্লাহতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা—এ সবকে এক সঙ্গে বলা হতো দর্শন। কিন্তু ইউরোপীয় জ্ঞানীরা সঠিক নীতির অনুসরণ করে এগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করেনঃ যে সব বিষয়ের হকিকত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে, সেগুলোকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'বিজ্ঞান' রূপে। আর যেগুলো পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার নাগালের বাইরে, সেগুলোকে অভিহিত করা হয়েছে 'দর্শন' রূপে।

আধুনিক গবেষণা-লব্ধ বিষয়াদি সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা হলোঃ এগুলো নিশ্চিত ও বিশ্বাস্য। এ ধারণায় মস্তবড় গলদ রয়েছে। তা হলোঃ কেবল বিজ্ঞান-প্রমাণিত বিষয়গুলোকেই সত্য ও সুনিশ্চিত বলে মনে করা যায়, অন্য কিছুকে নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিজ্ঞান-প্রমাণিত তত্ত্ব নিয়ে ইউরোপীয় বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু দর্শনের ব্যাপারটা তদ্রূপ নয়।

বর্তমান ইউরোপে দর্শনকেন্দ্রিক নানা চিন্তাধারা রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে এমন তীব্র মত-বিরোধ রয়েছে যে, সে সবগুলোকে যদি সত্য বলে ধরা হয়, তবে একই বস্তুকে একাধারে সাদাও বলতে হবে, আবার কালোও বলতে হবে।

এখন দেখা উচিত, ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে? বিজ্ঞান যে সব বস্তুকে সত্য বা অসত্য বলে প্রমাণিত করে, সেগুলো সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই। হরেক বস্তুতে মৌল উপাদান কতটুকু বা পানিতে কি কি উপাদান রয়েছে বা বাতাস কতটা ভারী বা আলোর গতি কতটুকু বা ভূ-গর্ভে কয়টি স্তর রয়েছে—এসব হলো বিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রশ্ন। ধর্মের সাথে এগুলোর কোন সংযোগ নেই। আল্লাহ্ আছে, কি নেই বা মৃত্যুর পর আর কোন জীবন রয়েছে কি-না বা ভাল-মন্দ বলে কোন বস্তু আছে কি-না বা প্রতিদান ও শাস্তি সঠিক কি-না—এসব প্রশ্ন নিয়েই ধর্ম বোঝা-পড়া করে। এগুলোর মধ্যে এমন কোন্ বিষয়টি রয়েছে, যাতে বিজ্ঞান প্রশ্রয় পেতে পারে? বিজ্ঞানের শিক্ষকগণ যদি এ সম্পর্কে কিছু বলে থাকেন, তবে এতটুকু বলেছেন যে, এসব বস্তু সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই; অথবা বলেছেন যে, এগুলো পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে; অথবা বলেছেনঃ আমরা এগুলো বিশ্বাস করি না; কারণ আমরা কেবল সেই সব বস্তুকেই বিশ্বাস করি, যা পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের অজ্ঞতার দরুনই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। বিজ্ঞানীরা যখন বলেনঃ এ বস্তু সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই, তখন অজ্ঞ লোকেরা তার অর্থ করে, 'এ সব বস্তু নেই বলেই আমরা জানি।' অথচ এ দু'টি কথার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে।

ইউরোপে বিভিন্ন কাজের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ চিহ্নিত রয়েছে। সে মহাদেশে প্রত্যেক বিষয়ের লোক নিজ নিজ কর্ম ভাগ করে নিয়েছে। প্রতিটি দল নিজ কর্ম নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, তারা বিভাগীয় দায়িত্ব ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায় না। তন্মধ্যে একটি দল হলো জড়বাদীদের। এদের বিষয়বস্তু হলো—জড় পদার্থ। এ সম্প্রদায় জড়বস্তু সম্পর্কে অনেক অদ্ভুদ রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয় "এরা ধর্ম, আল্লাহ্ ও আত্মায়

অবিশ্বাসী।" কিন্তু মূলত এরা এ সব বিষয়ের কোনটাতেই অবিশ্বাসী নয়। এ সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো—এগুলো প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় না। অধ্যাপক লিট্রা এ সম্প্রদায়ের একজন বড় নেতা। তিনি বলেন, বিশ্বের আদি ও অন্ত সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। তাই বলে কোন চিরন্তন অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অধিকার যেমন আমাদের নেই, তেমনি সেগুলোকে সত্য বা অসত্য বলে প্রমাণিত করার দায়িত্বও আমাদের নেই। জড়বাদীরা 'প্রথম জ্ঞান' (আক্‌ল-এ-আউ-ওয়াল)-এর অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে না। কারণ, জড়বাদ এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। জড়-বাদীরা বলে, "আমরা দৈব জ্ঞান স্বীকার করি না, আবার অস্বীকারও করি না। তার সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায় না।"

ফরাসীর কোন এক চিকিৎসা বিজ্ঞান পত্রিকায় এ মর্মে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল যে, মানুষের মস্তিষ্কে যে ফস্‌ফরাস থাকে, সে উপাদান থেকেই চিন্তা ও বোধ-শক্তির উৎপত্তি হয়। বীরত্ব, সরলতা, শালীনতা—এ সব মানবীয় গুণ হলো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন-সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। এর প্রত্যুত্তরে ফরাসীর জনৈক খ্যাতনামা জ্ঞানী ও পদার্থবিদ প্লামার-ইয়ন অপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি প্রথমোক্ত নিবন্ধকারকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

"এমন কথা আপনার কাছে কে বললো? লোকের ধারণা হবে যে, আপনার শিক্ষকরাই বোধ হয় আপনাকে এ শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না। আমি জানি না, আপনার এ নিরর্থক দাবী বেশী বিস্ময়কর, নাকি তথাকথিত বিদ্যার দাবি-দারদের আস্পর্ধা? নিউটন কোন বিষয় বর্ণনা করার সময় বলতেন, "বাহ্যত এমনি হবে বলেই মনে হয়।" কেপলার সব সময় বলতেন, "তোমরা বিষয়গুলোকে এরূপ বলে মনে করতে পার।" অথচ আপনি বলছেন, "আমরা প্রমাণ করছি; আমরা নাকচ করছি; এটা আছে; ওটা নেই; এটা জ্ঞানেরই সিদ্ধান্ত; জ্ঞান এটা প্রমাণ করে দিয়েছে।" আপনার এ-সব দাবিতে জ্ঞানমূলক যুক্তির লেশও নেই। আপনি বোকামির দরুন দুঃসাহস করে বিদ্যা-বুদ্ধির ঘাড়ে এত বড় বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন? আপনি যা বলছেন, তা যদি জ্ঞানীদের

কানে পড়ে (এবং পড়বেই তো, কারণ আপনি হলেন জ্ঞানের সন্তান), তবে আপনার বোকামি দেখে তাঁদের হাসির উদ্রেক হবে। আপনি বলছেন, "জ্ঞান প্রমাণ করে দিচ্ছে; নাকচ করে দিচ্ছে"—এসব কথা উচ্চরণ করে আপনি হতভাগা জ্ঞানের ওষ্ঠে একটি বড় ও ভারি শব্দের বোঝা তুলে ধরছেন, যাতে হয়তো জ্ঞানের অন্তরে অহংকারের উদয় হতে পারে। প্রিয়, মনে রাখুন—জ্ঞান এসব বিষয়ের কোনটাকে সমর্থনও করে না, আবার অস্বীকারও করে না।"

এগুলো ছিল জ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কিন্তু অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী জড়বাদীরা নিজেদের সীমারেখা ছাড়িয়ে নৈতিবাচক দাবী করে বসে। এদের বাড়াবাড়ি ও কৃত্রিম আভা আমাদের দেশের নও-জোয়ানদের চোখকে ঝল্‌সে দিয়েছে। তাই আমাদের বিশেষ চিন্তা করে দেখতে হবে যে, তারা তাদের দাবির প্রতিষ্ঠায় কি ধরনের যুক্তি পেশ করছে? দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের কয়েকটি উক্তির উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

ডক্‌টর শেফ্‌লার বলেন, "আত্মা হলো স্নায়ু-উদ্ভূত একটি জড়াত্মক শক্তি। ডায়ার শ' বলেন, "আত্মা এক প্রকার প্রক্রিয়া জনিত গতি।" বুশ্‌নার বলেন, "মানুষ জড় পদার্থ থেকে উদ্ভূত।" দু. বুওয়া রিমন বলেন ঃ "স্নায়ুসমূহে এক প্রকার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ রয়েছে। যাকে আমরা 'চিন্তা' বলে আখ্যায়িত করে থাকি, তা-হলো জড় বস্তুর একটি গতি।" ডু. ডুট্রশে ছিলেন একজন বড় পদার্থ-বিজ্ঞানী। তিনি বলেন, "জীবন প্রকৃতির বাঁধাধরা নিয়মাধীন বস্তু নয়, বরং তা হলো এমন একটি দৈব ব্যতিক্রম, যা জড়বস্তুর সাধারণ নিয়ম বিরুদ্ধ।" কোন এক বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, মস্তিষ্কে যে ফস্‌ফরাস রয়েছে, সেই উপাদান থেকেই চিন্তা-শক্তির উদ্ভব হয় এবং যে সব বস্তুকে আমরা অকপটতা, বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বলে আখ্যায়িত করে থাকি, তা হলো—দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তরঙ্গমালার নামান্তর।

উপরিউক্ত অভিমতগুলোকে আমরা কি নিশ্চিতরূপে সত্য বলে মনে করতে পারি? এগুলোর উপর ভিত্তি করে এটা কি দাবি করা যায় যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মার অসারতা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ

হয়েছে বা আত্মাকে অস্বীকার করেছে। আসল কথা হলো-ধর্ম ও বিজ্ঞানের গণ্ডি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম যে সব বস্তু নিয়ে আলোচনা করে, বিজ্ঞান তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মের সাথে দর্শনের বিরোধ দেখা যায়। তাই বলে দর্শনের অভিমত-সমূহকে নিশ্চিত সত্য বলে পরিগণিত করা যাবে না। দর্শন শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। কোন কোন মতবাদে আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করা হয় না। আবার কোন কোন মতবাদে তাঁর অস্তিত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করা হয়। কোন কোন দার্শনিক আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আবার কেউ তা অস্বীকার করেন। এক সম্প্রদায়ের কাছে যা নৈতিকতার মাপকাঠি বলে বিবেচিত, তা অন্য সম্প্রদায়ের কাছে সমর্থনযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় ধর্মের সান্ত্বনা হলো ঃ

"তুমি কি দেখেছ! লেগেছে লড়াই দুশমনে দুশমনে।" জটিলতা ও গড়বড়ির সৃষ্টি হয় ঐ সময়, যখন বিজ্ঞান বা ধর্ম নিজ নিজ গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যের সীমারেখায় অনুপ্রবেশ করে। এই সীমা লংঘনই নাস্তিক ও ধর্ম-অবিশ্বাসীদেরকে তাদের চিন্তাক্ষেত্রে নাস্তিক্যের ইন্ধন যুগিয়েছে। সত্যিকার বলতে গেলে, এই দ্বন্দ্বই নাস্তিকতা ও ধর্ম-হীনতামূলক চিন্তাধারার দ্বার খুলে দিয়েছে।

পূর্বকালে ইউরোপে ধর্মের গণ্ডি এত প্রশস্ত ছিল যে, জ্ঞানমূলক কোন বিষয়ই ধর্মীয় আলোচনা ও ধর্মীয় হস্তক্ষেপ থেকে বাদ পড়তো না। এ উদ্দেশ্যে স্পেনে 'অনুসন্ধান' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাজ ছিল—যারা ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলবে, তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং তাদেরকে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা। এই নিরিখে ১৪৮১ খ্রীঃ হতে ১৪৯৮ খ্রীঃ এই আঠার বছরে দশ হাজার দু'শ' বাইশটি লোককে ধর্মহীনতার অভিযোগে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। এ সমিতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার লোককে কাফের ও ধর্মহীন বলে আখ্যায়িত করে। এর মধ্যে লক্ষাধিক লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

কি কি কারণে নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতো, তা নিম্ন ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হবে। কোপার্নিকাস বাত্‌লিমুসের

নীতি অস্বীকার করেন এবং প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী ও চাঁদ ইত্যাদি সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে। এতে 'অনুসন্ধান সমিতি' এ মর্মে ফতোয়া দিল যে, কোপানিকাসের অভিমত ঐশ কিতাব-বিরোধী। তাই তিনি ধর্মান্তরিত ও কাফের।

গ্যালিলিও ছিলেন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। তিনি কোপানিকাসের সমর্থনে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে। এতে 'অনুসন্ধান সমিতি' ফতোয়া দিল যে, তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। তদনুসারে তাঁকে হাঁটু গেড়ে বসানো হলো এবং আদেশ দেওয়া হলো যে, তিনি যেন এ মত প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তিনি নিজ মতে অবিচল ছিলেন বলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। দশ বছর কাল তিনি কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন।

কলম্বাস যখন নতুন দ্বীপ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সফরে যেতে চাইলেন, তখন গির্জা থেকে ফতোয়া দেওয়া হলো যে, এ ধরনের ইচ্ছা ধর্ম-বিরোধী। 'পৃথিবী গোলাকার'—এ ধারণা তিনি যখন ব্যক্ত করলেন, পাদরীরা তখন তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলে উঠলেন : এ বিশ্বাস পবিত্র কিতাব-বিরোধী।

মোটকথা, পাদরিগণ প্রত্যেক প্রকার আবিষ্কারকেই নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতেন। কিন্তু তাঁদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেননা, তাঁদের পক্ষে অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে নাস্তিকতার অভিযোগের মধ্য দিয়েই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার লাভ করে।

পাদরীদের কুসংস্কার যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারেনি। শিক্ষিত সমাজ মনে করলেন, যা পাদরীদের ধ্যান-ধারণা, সেটাই ধর্ম। এই নিরিখে তাঁরা দৃঢ়ভাবে এ মত পোষণ করতে লাগলেন যে, ধর্ম মাত্রই জ্ঞান-বিরোধী এবং হকিকতের (বাস্তব সত্যের) পরিপন্থী। এই যে ধারণা শিক্ষিত সমাজের অন্তরে শিকড় গজালো, তা আজও মুছে যায় নি। এর প্রতিধ্বনি আজও ইউরোপে ধ্বনিত হচ্ছে।

ধর্মের স্বরূপ যদি সত্যই এমনি হয়, তবে তা কিছুতেই বিজ্ঞানের সামনে তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু ইসলাম তার জন্মলগ্নেই ঘোষণা

করেছিলঃ "বৈষয়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তোমরাই ভাল বোঝ।" বলা বাহুল্য, প্রাচীন বিজ্ঞান বা আধুনিক বিজ্ঞান—এ সবই পার্থিব বিষয়। এগুলোর সাথে কেয়ামত ও পরকালের কোন সম্পর্ক নেই।

এটা অবশ্য লক্ষণীয় বিষয় যে, ইসলাম ধর্মে শত শত সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এত মতবিরোধ ঘটেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে কাফের বলেও আখ্যায়িত করেছে। এ আখ্যাদান কেবল বড় বড় বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, নিতান্ত ছোট-খাট ব্যাপারেও তারা একে অপরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ করে দিয়েছে। এত সব সত্ত্বেও এটা জোরগলায় বলা যায় যে, জ্ঞানমূলক তথ্য উদ্ঘাটন বা আবিষ্কারের অজুহাতে কোন ব্যক্তিকে কখনো কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয় নি। প্রাচীন তফসীরবিদ-গণের ধারণা ছিলঃ বৃষ্টি আকাশ থেকেই বর্ষিত হয়—আকাশে একটি দরিয়া আছে; মেঘ সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে বারি-পাত ঘটায়। তাঁদের আরো ধারণা ছিলঃ সূর্য কানায় কানায় ভরা একটি কূপে নিমজ্জিত হয়; জমিন সমতল, গোলাকার নয়; যেসব নক্ষত্র আকাশ থেকে খসে পড়ে, সেগুলো হলো শয়তানের প্রতি নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তফসীরবিদ্গণ এসব কথা কুরআনের ভাষা থেকেই প্রমাণ করতেন। ইমাম রাযী প্রাচীন তফসীরকারদের এসব উক্তি তাঁর 'তফসীর-ই-কবীর' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন।

যখন আব্বাসীদের জ্ঞান-সাধনার যুগ সূচিত হলো এবং দর্শন ও পদার্থবিদ্যার প্রসার ঘটলো, তখন থেকেই জ্ঞান-সাধকেরা উপরিউক্ত ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেন। তা সত্ত্বেও কোন লোক, এমনকি একজন তফসীরকারও এসব মত-পোষকদের কাফের বা কুরআনের অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করেন নি। মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলেনঃ কুরআন সৃষ্ট ও নশ্বর। তাই মুহাদ্দিস সম্প্রদায় তাঁদেরকে কাফেররূপে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তাঁরা (মু'তাযিলা) যে যাদুর হকিকত বিশ্বাস করেন না, সেজন্য কেউ তাঁদেরকে কাফের বলে অভিহিত করেনি। মোটকথা, অনুসন্ধানকার্যে যতই অগ্রগতি হোক না কেন, দেখতে পাবেন যে, মুসলমানেরা তথ্যের অনুসন্ধান বা আবিষ্কারকে কখনো ধর্মের পরিপন্থী বলে বিবেচনা করেনি। বরং গবেষকগণ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, পার্থিব ঘটনা-প্রবাহ,

জ্যোতির্বিদা ও অন্যান্য বিষয়াদি নুবুওয়াতের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের চরিত্র সংস্কার ছাড়া নবীদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। শাহ্‌ওলীউল্লাহ সাহেব তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক গ্রন্থে নবীদের নীতি বর্ণনা করে বলেন ঃ

"যে সব বিষয়ের সঙ্গে চরিত্র-সংস্কার বা জাতীয় রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই, সেগুলোর প্রতি নবিগণ মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। যেমন বৃষ্টি, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ও রামধনু সৃষ্টির কারণ, উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের রহস্য, চন্দ্র-সূর্যের গতি, দৈনন্দিন ঘটনা-প্রবাহের কারণ, নবিগণ ও বাদশাহ্‌দের কাহিনী, বিভিন্ন শহরের ইতিহাস—এসব বিষয় নিয়ে নবিগণ চিন্তা-ভাবনা করেন না। তবে এসব বিষয় যদি জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং লোকের বিবেক সেগুলো গ্রহণ করে নেয়, তবে নবিগণও আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনায় পরোক্ষ-ভাবে সেসব কাহিনী উল্লেখ করেন এবং সেগুলোকে ভাবার্থ ও রূপ-কার্থে গ্রহণ করেন। এ কারণেই জনগণ যখন নবী করীমকে চাঁদের হ্রাস ও বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, তখন তাঁর পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে মাসদিন নির্ধারণের যে উপকারিতা সাধিত হয়, সেটাই বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ তারা আপনার নিকট চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। হে রসূল! আপনি বলে দিন ঃ চাঁদ মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ করে এবং হজের কাল নিরূপণ করে।"

শাহ সাহেব নবীদের শিক্ষা ও নীতি সম্পর্কে যে বর্ণনা পেশ করেন, তারপর কে বলতে পারে যে, বিজ্ঞান ও আধুনিক বিদ্যার দরুন ধর্মের কোন ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

ধর্ম মানুষের স্বভাবজাত বিষয়

মানুষ ও জন্তুর মধ্যে তুলনা করুন। জীব-জন্তু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগে নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। তাদের পোশাক তাদের সংগেই থাকে এবং ঋতু পরিবর্তনের নিরিখে তারও পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। দুশমনকে পরাভূত করার জন্য কব্জি, নখ ও দংশন-যন্ত্র সংগে নিয়েই তারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। জীবন ধারণের জন্য যে সব খাদ্যের প্রয়োজন, তা জন্ম গ্রহণের সংগে সংগেই তারা জঙ্গল,

পাহাড়, জল-স্থল, আবাদী-অনাবাদী সব জায়গায় প্রস্তুত দেখতে পায়।

অথচ মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন তার কাছে জীবিকার কোন ব্যবস্থাই থাকে না। তার ত্বক থাকে খুবই স্পর্শকাতর; হাত-পা থাকে দুর্বল; শরীরে কোন পোশাক থাকে না; দুশমন থেকে বাঁচার জন্য তার সংগে শিং বা নখর থাকে না। তদুপরি চারদিকে প্রকৃতির যে সব সৃষ্টি রয়েছে, সবই তার কাছে শত্রু বলে মনে হয়। সূর্যের উত্তাপ, মেঘের বর্ষণ, লু-হাওয়ার ঝাপটা, শীতের প্রকোপ—প্রত্যেক বস্তুই তাকে ধ্বংস করতে চায়।

এ সব বিপদ-আপদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য প্রকৃতি তাকে কোন দৈহিক হাতিয়ার দেয়নি। কারণ, যে অসংখ্য ও জোরালো শত্রুর সাথে তাকে মোকাবিলা করতে হবে, তার জন্য দৈহিক হাতিয়ার যথেষ্ট নয়। এ সব হাতিয়ারের পরিবর্তে প্রকৃতি তাকে এমন একটি সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করেছে, যার ফলে সে সকল প্রকার দুশমনের সংগে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার প্রস্তুত করে নেয়; রোদ, তাপ ও শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা ধরনের পোশাক ও ঘর-বাড়ী তৈয়ার করে; জীব-জন্তুকে পরাভূত করার জন্য তরবারি, খঞ্জর ইত্যাদি প্রস্তুত করে; নদীর উপর পুল নির্মাণ করে; পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে; লোহা গলায়; বিদ্যুৎ বশীভূত করে; বাতাসকে রুখে দেয়—মোটকথা, এভাবে আবিষ্কার করার কিছুকাল পর সে দেখতে পায় যে, সারা পৃথিবী তার করায়ত্ত।

এই সাধারণ শক্তির নাম সার্বিক বুদ্ধি বা মানবিক বুদ্ধি। প্রকৃতির উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যেন ধাপে ধাপে উন্নতি করতে পারে এবং কোথাও থেমে না যায়। তাই সে মানুষকে কোন সময় নিশ্চল ও নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে দেয় না। সে মানুষের বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলোকে নতুন নতুন হাতিয়ার সরবরাহ করে। ফলে মানুষের বিরুদ্ধে নতুন নতুন হামলা চলতে থাকে; একটি রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ত্ত করা হলে অপর একটি নতুন রোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। জানা পৃথিবীর ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হতে না হতেই নব জনপদের সন্ধান মেলে এবং নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়। ভোগ-বিলাসের আশা-আকাঙ্খা বেড়ে যাওয়ার ফলে সুখ-শান্তির

বর্তমান সামগ্রী অপর্যাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধ্য হয়ে মানুষ নব নব সাধ মেটানোর জন্য নব নব প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং অগ্রগতির পূর্ব সীমারেখা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

মানুষ ও অপরাপর সৃষ্টির এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বই হলো মানবিক উন্নতির চাবিকাঠি। এর ফলেই আজ কেবল শত শত নয় বরং হাজার হাজার আবিষ্কার সাধিত হচ্ছে এবং ক্রমাগত তা বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই বাহ্যিক দুশমন ও বিরুদ্ধবাদীর চাইতে আরো বেশী ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক এক শ্রেণীর শত্রু মানুষের আছে, যা তার অভ্যন্তরেই রয়েছে এবং যাদের সংগে তাকে অহরহ কঠিন লড়াই করে যেতে হচ্ছে। লোভ তাকে আত্মীয়, অনাত্মীয়, শত্রু, মিত্র, নিকটবর্তী, দূরবর্তী—সকলের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য প্ররোচনা দেয়। হিংসা চায় যে, বিরোধীরা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে মুছে যাক। শক্তির মোহ চায় যে, সারা পৃথিবী তার সামনে মাথা নত না করা পর্যন্ত অভিযান চালানো হোক। কামাসক্তির লক্ষ্য হলো—দুনিয়ায় কারুর সততা যেন অক্ষত না থাকে। এসব দুশমন থেকে আত্মরক্ষায় বিবেক-বুদ্ধি অনেকটা কাজে আসে। বিবেক সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেঃ তোমরা যদি কারো মান-সম্মানে আঘাত হান, তবে সেও তদ্রূপ করতে উদ্যত হবে; তুমি কাউকে ধ্বংস করতে চাইলে সেও অনুরূপ পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করবে; তুমি অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করলে সেও তোমার প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করবে। কিন্তু কথা হলো এরূপ পরিণামদর্শী বিবেক-বুদ্ধি তো সকলের ভাগ্যে জোটে না। কেবল বিশেষ বিশেষ শিক্ষিত লোকেরাই এ গুণের অধিকারী হয়। এ ছাড়া মানুষকে তার জীবনে এমন অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে প্রতিপক্ষের দিক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় থাকে না; সরকারের অসন্তোষের দুশ্চিন্তা, গুপ্তচরের আশংকা, দুর্নামের সম্ভাবনা—এসবের বালাই মোটেও থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি দৃঢ় বিরুদ্ধবাদী শক্তির মোকাবেলা করতে পারে না। এ সময় অন্য একটি শক্তি বুক ফুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মানুষকে সে সব শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করে। এ শক্তির নাম হলো 'ঈমানের আলো' বা বিবেক-বুদ্ধি। এটাই ধর্মের ভিত্তি।

এ শক্তি মানুষের প্রকৃতিগত। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, অভদ্র, বাদশাহ্, ফকীর, আফ্রিকার বর্বর এবং ইউরোপের শিক্ষিত—সবাই সমভাবে এ গুণের অধিকারী। নিম্নে প্রদত্ত কুরআনের আয়াটিতে এ কথাই বিধৃত হয়েছে ঃ

"সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মের দিকে তাকাও। এটা আল্লাহ্‌র স্বভাব (ধর্ম); এ স্বভাব-মাফিক করেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র স্বভাবে কোন পরিবর্তন ঘটে না। এটাই যথার্থ ধর্ম। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক তা বোঝে না।"

জার্মানীর গিস্‌লার নামক জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ ধর্ম একটি চিরন্তন বস্তু। কেননা, তা যে অনুভূতি থেকে উদ্ভূত, সেটা কখনও লয়প্রাপ্ত হতে পারে না।" ফরাসীর বিখ্যাত জ্ঞানী শিক্ষক রীনান স্বয়ং ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। তিনি তাঁর "ধর্মের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলেন ঃ যে সব পার্থিব বস্তুকে আমরা ভালবাসি বা যে সব পার্থিব বস্তু অবলম্বনে আমরা জীবনে ভোগ-বিলাস করে থাকি, সে সবই লয়প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু ধর্ম পৃথিবী থেকে লয়প্রাপ্ত হতে পারে না এবং এর ক্ষমতায় ভাটাও পড়তে পারে না। এ ধর্ম সব সময় প্রমাণ দেবে যে, জড়বাদভিত্তিক ধর্ম সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ তা চায় যে, মানুষের চিন্তাশক্তি চিরকাল সেই হীন ও মর্ত্য জীবনের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থেকে যাক।"

অধ্যাপক সেবেটা 'ধর্মীয় দর্শন' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ "আমি ধর্মের অনুসারী কেন হলাম? এর কারণ হলো—এছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না! কারণ ধর্মের অনুসারী হওয়াটাই ছিল আমার জন্য স্বাভাবিক; এটা আমার স্বভাবজাত বস্তু। কোন কোন লোক বলবে, এটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে উদ্ভূত বা মতিগতিরই ফলশ্রুতি। আমিও প্রথমে এরূপ ভাবতাম। কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম—যদি তাই হয়, তবে প্রশ্নের পর প্রশ্নই দাঁড়ায় এবং তা সমাধান করার কোন জো থাকে না। আমার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য ধর্মের যতটুকু প্রয়োজন রয়েছে, তার চাইতেও এর বেশী প্রয়োজন অনুভূত হয় সামাজিক জীবনের জন্য। ধর্মের ডাল-পল্লব হাজার বার কাটা হয়েছে। কিন্তু এর মূল সব সময় অটুটই রয়েছে এবং সেখান থেকেই এর নব নব শাখা-প্রশাখা গজিয়েছে। তাই বলতে হয় যে, ধর্ম চিরন্তন বস্তু। এটা কখনও লয়প্রাপ্ত হতে পারে না।

ধর্মের ভিত্তি দিন দিনই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দার্শনিক চিন্তাধারা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা একে আরো সুদূরপ্রসারী করে তুলছে। মনুষ্য জীবন এর উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং এই উৎস থেকেই তা ক্ষমতা লাভ করে থাকে।

দুনিয়ার নৈতিক শৃংখলাবোধকে ধর্মই অটুট রেখেছে। নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা যদি কেবল শিক্ষা-দীক্ষার উপরেই নির্ভর করতো, তবে ইউরোপেই এর মান সবচাইতে উঁচু থাকতো। কারণ সারা পৃথিবীর তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষায় সেখানকার লোকেরাই বেশী অগ্রণী।

ধর্ম স্বভাবজাত বিষয়-এর দ্বিতীয় যুক্তি

পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন ভাষা, গোত্র, দেশ, আকৃতি ও বর্ণভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য। এগুলো বাদ দিলে যে সব বস্তু সকল মানুষের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে ধর্ম অন্যতম। ধর্ম যে স্বভাবগত—এটাই তার একটি বড় যুক্তি। সন্তান-সন্ততির ভালবাসা, প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মত্ততা, গুণের স্বীকারোক্তি—এসব প্রবণতাকে আমরা মানব-স্বভাব বলে আখ্যায়িত করে থাকি। এই আখ্যাদানের কারণ হলো এই যে, দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। আমরা দেখতে পাই যে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি কওম, বংশ ও সম্প্রদায় যে কোন একটি ধর্মে বিশ্বাসী। তাই পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম স্বভাবজাত বস্তু। ধর্মের প্রধান প্রধান যে সব নীতি রয়েছে, তা সব ধর্মেই প্রায় এক ও অভিন্ন। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর উপাসনা, পরকাল ও কর্মের প্রতিফলে বিশ্বাস স্থাপন, দয়া, সহানুভূতি ও সততার মূল্যায়ন, মিথ্যা, প্রতারণা, ব্যভিচার ও চুরির প্রতি ঘৃণা পোষণ—এসব দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্মেরই মৌলনীতি।

প্রকৃতি মানুষে মানুষে গুণগতভাবে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, বিবেক-বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা ইত্যাদি প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহ্ এত বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন যে, যার চাইতে বেশী কল্পনা করা যায় না। এ বদান্যতার নমুনা দেখতে হলে আলেকজাণ্ডার, তৈমুর, অ্যারিস্টটল, প্লেটো, হোমার ও ফিরদৌসীকে দেখা উচিত। অন্যদিকে কার্পণ্য দেখতে হলে মানুষ ও বানরের মধ্যকার সামান্যতম পার্থক্যটুকু দেখা উচিত। এদের মধ্যে এত সূক্ষ্ম

পার্থক্য রয়েছে যে, ডারউইনের নজরেও তা ধরা দেয়নি। তা সত্ত্বেও জীবন ধারণের জন্য যে সব বস্তুর প্রয়োজন, প্রকৃতি তা সকল মানুষকেই সমভাবে দান করেছে। আফ্রিকার অজ্ঞের চাইতেও অজ্ঞ ব্যক্তি এমনিভাবেই পানাহার করে, চলাফেরা করে, নিদ্রা যায় ও কথাবার্তা বলে, যেমন গ্রীসের মহৎ থেকে মহত্তর দার্শনিক এসব প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

এতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের যে অংশটুকু পৃথিবীর সকল কওমের মধ্যে সমভাবে দেখা যায়, তা মানুষের জন্য ছিল অপরিহার্য। তাই প্রকৃতি ধর্মের এ অংশটুকু সকল জাতিকে সমভাবে দান করেছে। অ্যারিস্টটল ও বেন্থাম অনেক যুক্তির পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সত্যতা, সাধুতা, সচ্চরিত্র, জ্ঞান—এসব ভাল গুণ। অথচ আফ্রিকার একজন বর্বরও শিক্ষা-দীক্ষা না থাকা সত্ত্বেও কোন যুক্তি ছাড়াই এসব গুণাবলীকে ভাল বলে জ্ঞান করে।

ইসলাম ধর্ম

ইতিপূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্ম মানুষের স্বভাবজাত। মানুষের সহানুভূতি, ভালবাসা, উদ্দীপনা, প্রতিশোধের বাসনা—এসব ভাবাবেগ যেমন প্রকৃতিগত ব্যাপার, তেমনি তার ধর্মীয় অনুভূতিও স্বাভাবিক উপলব্ধি। প্রকৃতিগত ভাবাবেগ কারো মধ্যে বেশী থাকে, আবার কারো মধ্যে অল্প, কারো ভাবাবেগ সক্রিয়, আবার কারো নিষ্ক্রিয়, আবার দু'চারজন লোক এমনও আছে, যাদের মধ্যে এ সব মোটেই পরিলক্ষিত হয় না। ধর্মীয় প্রেরণার পরিমাণেও তদ্রূপ।

আগেই বলা হয়েছে, ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার কারণ ছিল এই যে, এছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব ছিল না। তাই ধর্মের যে অংশটুকু সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে দেখা যায়, তা খুবই সাদাসিধে ও অপূর্ণ এবং এমনি হওয়ার প্রয়োজনও ছিল। আরো পরিষ্কার কথায়, মানুষের জীবিত থাকার জন্য পানাহার ও শীত-তাপ থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। এজন্য প্রকৃতি অতি সাধারণ মানুষকেও এসব প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করে থাকে। সকলকে উচ্চমানের সামগ্রী দেওয়া প্রকৃতির জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। ক্ষুধা নিবারণের জন্য সামান্যটুকু খাদ্য, থাকার জন্য তৃণ-কুটির ; পরার জন্য গাছের পল্লব দেওয়া হলেই প্রকৃতির ফরয

সম্পন্ন হয়ে যায়। সবাইকে নানা ধরনের নেয়ামত, বড় বড় মহল বা মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ দেওয়া তার কর্তব্য নয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি কতক লোককে কতক লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

এক ধর্মের উপর অন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব

সকল ধর্মের একই অবস্থা—তবে এক ধর্মের উপর অন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি, উপাসনার প্রেরণা, পরকালের ধারণা, প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস, নবুয়তের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন—এ সবই ছিল মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাই সকল সম্প্রদায়ে এ সব ধারণা সমভাবে বিদ্যমান ছিল। কোন সম্প্রদায় বা দলের লোকদের বিশ্বাসে এ ব্যাপারে কোন তারতম্য ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্র গুণাবলী বলতে কি বুঝায়?, কি প্রকারের ইবাদত করা ফরয এবং কেন ফরয? পরকালের হকিকত কি?, প্রতিদান ও শাস্তির উদ্দেশ্য কি?, নবুওয়াতের অর্থ কি?—এসব প্রশ্নের জওয়াব সব ধর্মে একই প্রকার পাওয়া যায় না। যে ধর্ম যতবেশী সঠিক জওয়াব দিতে সক্ষম, সেই ধর্ম তত বেশী যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত।

ইউরোপে ধর্ম-অবিশ্বাসীদের একটি দল আছে এবং ধীরে ধীরে তা বেড়েই চলেছে। ধর্মের প্রতিতাদের অবিশ্বাসের কারণ হলো—তারা বর্তমান ধর্মগুলোতে উপগুলিতে উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না।

ইউরোপ ধর্ম-বিরোধী কেন?

অধ্যাপক লরাউস ধর্মের বিরোধিতা করে বলেন ঃ

"আমি যদি বলি, কেবল সেসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, যা বুদ্ধিসম্মত, তখন আমাকে উত্তরে বলা হয় যে, তা হতে পারে না এবং কখনো হতে পারে না। যে বিবেক বা বুদ্ধি ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়, ধর্মে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়; এতে জ্ঞান-চক্ষুকে এরূপ অন্ধ করে দেয়া হয় যে, অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলীও তখন মামুলি ব্যাপার বলে মনে হয়; সাদাকে কালো বলে ধারণা করা হয়; বিশ্রী বস্তুকে সুশ্রী বস্তু বলে পরিগণিত করা হয়। এখানেই শেষ নয়। এরপরেও ধর্ম এসে দাঁড়ায় এবং বলে ঃ মাথা নত করে দাও। কিন্তু নত করবে কার

সামনে? বুদ্ধির সামনে? ধর্ম উত্তরে বলে, না, তা হতে পারে না। তবে কি প্রকৃতি আরোপিত কর্তব্যের সামনে মাথা নত করা হবে? ধর্ম উত্তরে বলে, না, তাও হতে পারে না। তবে কি অন্তর্নিহিত অনুভূতির সামনে মাথা নত করা হবে? ধর্ম উত্তরে বলে, না তাও হতে পারে না। তবে কি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সামনে? না, তাও হতে পারে না।"

মসিয়ো বেঞ্জামিন ছিলেন ফরাসীর একজন বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি ধর্মের স্বরূপ ও তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি ধর্মের দোষসমূহ বর্ণনা করে বলেন, ধর্ম জ্ঞান-বিরোধী বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এটা সুনিশ্চিত যে, সব ধর্ম একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

বার্টলো বলেন, জ্ঞান এখন পূর্ণ আযাদী লাভ করেছে। তাই ধর্ম তাকে আর চেপে রাখতে পারবে না।

স্বাভাবিক ধর্ম

এ সব ভাষ্যের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় বিধি-বিধান গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী বলেই ধর্ম-অবিশ্বাসিগণ ধর্মকে যথার্থ বলে মনে করে না। তবে যে ধর্মের সকল নীতি বুদ্ধিসম্মত, সে ধর্ম কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এ দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ইউরোপের গবেষকেরা স্বভাবসম্মত ধর্মের একটি কল্পনাভিত্তিক নকশা এঁকেছেন। তাঁরা বলেন, বর্তমান ধর্মসমূহ ভ্রমাত্মক। যদি এমন একটি ধর্ম প্রবর্তন করা হয়, যার বিধি-বিধান হবে নিম্নরূপ, তবে তা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য হবে এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের সাথেও তা তাল মিলিয়ে চলতে পারবে।

স্বাভাবিক ধর্মের কল্পিত নক্শা

জুল সিমন এই বুদ্ধি-সঞ্জাত ধর্মের যে বিস্তারিত নক্শা এঁকেছেন, তা নিম্নরূপঃ

"পরকালীন পুণ্যের অর্থ হলো—মানুষ নীতির অনুসারী হবে। এখন প্রশ্ন জাগে, সেই নীতি কি? তা হলো—নিজের রক্ষণাবেক্ষণ

করা, নিজ স্বভাবে যে সব বৈশিষ্ট্য ও শক্তি সুপ্ত রয়েছে, তা রূপায়িত করা ও তাদের উন্নতি বিধান করা, মানুষকে ভালবাসা, তার সেবা করা এবং আল্লাহ্‌র উপাসনা করা। এখন প্রশ্ন জাগে—আল্লাহ্‌র উপাসনার অর্থ কি? এর মানে হলো—আপন কর্তব্য পালন করা, সৎকাজ করা, দেশকে ভালবাসা, কাজে লেগে থাকা ও কপটতা পরিহার করা—এটাই হলো স্বাভাবিক ধর্ম এবং এটাই স্বাভাবিক উপাসনা।"

এগুলো হলো স্বাভাবিক ধর্মের করণীয় বিষয়। এ ধর্মে যা বিশ্বাস করতে হবে, তা হলো ঃ এমন এক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, যিনি সকল কিছুই করতে পারেন; কোন বস্তুই যাঁর কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না, যাঁর সমস্ত কাজ হবে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সুশৃঙ্খল।

লরাউস বলেন ঃ যদি ধর্মের এ সংজ্ঞাই হয় যে, তা বুদ্ধিসম্মত চিন্তাধারার নামান্তর, তার উদ্দেশ্য হবে মানব জাতিকে একই সূত্রে আবদ্ধ করা এবং তার বৈষয়িক স্বার্থকে এমনিভাবে চরিতার্থ করা, যেমন বুদ্ধিজাত শক্তি দিয়ে চরিতার্থ করা হয়, তবেই তোমরা বলতে পার যে, ধর্ম মানব সমাজের জন্য একটি অপরিহার্য বস্তু।"

একটি উচ্চমানসম্পন্ন ধর্মে কি কি নীতি থাকা উচিত?

একটি যথার্থ, পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন ধর্মে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ থাকা প্রয়োজন ঃ

১. যুক্তির মাপকাঠিতে ধর্মের যথার্থতা ও অসারতা নিরূপণ করা হোক, অনুকরণ বা অন্ধ বিশ্বাসের মাধ্যমে নয়।

২. ধর্মের কোন আকীদা (বিশ্বাস) যুক্তিবিরোধী হওয়া উচিত নয়।

৩. ইবাদতের অর্থ এটা হওয়া উচিত নয় যে, ইবাদতের জন্যেই ইবাদত করা হোক। তাতে এ ধারণাও থাকা উচিত হবে না যে, যত বেশী কষ্ট করা যাবে, ততই আল্লাহ্ খুশী হবেন। বরং মানুষের উপকার সাধন করাই এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইবাদতে সাধ্যাতীত কষ্ট থাকা উচিত নয়।

৪. ধর্মীয় ও পার্থিব কর্তব্যসমূহ এমন সুন্দরভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাতে একটি দ্বারা অপরটির কোন ক্ষতি সাধিত না হয়; বরং উপকারই সাধিত হয়।

৫. ধর্ম যেন নিজেকে যে কোন উন্নত ধরনের তমদ্দুনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ধর্মের বদৌলতে তহযীবতমদ্দুন যেন অধিকতর উন্নতির পথে ধাবিত হতে পারে।

এ গ্রন্থে আমি ইসলামকে সর্বাগ্রে উপরিউক্ত নীতিসমূহের মাপ-কাঠিতে পরীক্ষা করে নিতে চাই।

বুদ্ধি ও ধর্ম

সর্বাগ্রে দেখা উচিত, পৃথিবীর ধর্মসমূহ বুদ্ধির উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করছে এবং ইসলাম এর কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে? দুনিয়াতে যত ধর্ম আছে, প্রত্যেকটাতেই সর্ব প্রথম এ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, "ধর্মে আকল্ (বুদ্ধি)-কে স্থান দিও না।" এই কড়া নির্দেশের ফলে ধর্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং তাতে গবেষণা ও ইজতেহাদের প্রয়াস দেখা যায় না। অন্যদিকে গবেষণা ও ইজতেহাদ না থাকায় ধর্মে স্বেচ্ছাচারিতাও হ্রাস পাচ্ছে না। কোন কোন লোক যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং অংক শাস্ত্রে শত শত অদ্ভুত আবিষ্কার সাধন করছে; অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ভ্রম প্রতিপন্ন করছে; কিন্তু তাদের সামনে যদি ত্রিত্ববাদের বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং বলা হয় যে, একের মধ্যে তিন, আবার তিনের মধ্যে এক রয়েছে—এটা কি করে হয়, তখন তাদের সমালোচনা ও পর্যালোচনা-শক্তি খর্ব হয়ে পড়ে। সক্রেটিস এত বড় দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও জীবন দানের সময় এ মর্মে উপদেশ দিয়ে গেলেন যে, ওমুক মূর্তির নামে আমি যে মানত করেছি, তা যেন পুরো করা হয়। শত শত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করছেন, কিন্তু ধর্মে বুদ্ধির কোন স্থান না থাকায় ধর্মের নিরর্থক বিশ্বাসগুলো সম্পর্কে তাঁদের মনে মোটেই সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে না। বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার ফলে ধর্মে কেবল ভুল ধারণাই শিকড় গজায় না, বরং তাতে দিন দিন নানা কুসংস্কারও বাসা বাঁধে, এমনকি কিছুকাল পর এর ভাল আকীদাগুলোও কুসংস্কারের অন্তরালে চাপা পড়ে যায় এবং ধর্মটি হয়ে দাঁড়ায় কতগুলো ধাঁধা ও অবাস্তব বস্তুর সমষ্টি মাত্র। এই কারণেই ইউরোপের স্বাধীনচেতা লোকদেরকে ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করে তুলেছে। ধর্ম বুদ্ধিকে পঙ্গু করে দেয় বলেই অধ্যাপক লরাউস ধর্মের লয়প্রাপ্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ; ধর্ম অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। এই

অধ্যাপকই অন্যত্র বলেন, "আমরা যদি স্বার্থ ও সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে এটা বুঝতে চেষ্টা করি যে, পৃথিবীতে ধর্মীয়, মানসিক ও নৈতিক যে উন্নতি সাধিত হচ্ছে, তার মূল কারণ কোথায়, তবে আমরা বুঝতে পারবো যে, বুদ্ধিকে বন্ধনমুক্ত রাখার ফলেই এসব অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে।"

ইসলামের শিক্ষা

এখন দেখুন, ইসলাম কি শিক্ষা দিচ্ছে?

কুরআন মজীদের শত শত স্থানে বিভিন্নভাবে ইহুদী, খ্রীস্টান, মূর্তি-পূজক ও নাস্তিকদেরকে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুধাবন করার অন্য আহবান করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও এ মর্মে আহবান করা হয়নি যে, অন্ধ অনুকরণ করে এসব ধর্মীয় বিশ্বাসকে বরণ করে নাও। বরং প্রত্যেক স্থানেই ইজতেহাদ ও চিন্তা অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং অন্ধ অনুকরণের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে। ইসলাম বিরোধীদের প্রতি সবচাইতে বড় যে অভিযোগটি ছিল, তা হলো এই:

"আকাশ-জমিনে রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন এবং সেগুলো তাদের সামনেই রয়েছে। অথচ তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না।" (ইউসুফ)

"তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা কাজে লাগায় না।" (আ'রাফ)

"আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি বিশেষ (নির্দিষ্ট) পথ অবলম্বন করতে দেখেছি। আমরা তাঁদের পথই অনুসরণ করবো।"

"কোন কোন লোক অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্কে অবতীর্ণ হচ্ছে। তারা কুরআনের বাণী সম্পর্কে চিন্তাই করছে না।"

"তারা আকাশ-জমিনের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছে না?"

মোটকথা, কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতসমূহে এ মর্মে নির্দেশ রয়েছে যে, বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। অনুরূপভাবে ধর্মের মূলনীতি ও শাখানীতি সম্পর্কে ইসলামের যে শিক্ষা রয়েছে, তাও যুক্তি ও বুদ্ধিভিত্তিক।

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন মজীদ বলে:

"সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মের দিকে তাকাও। এটা আল্লাহ্‌র স্বভাব (ধর্ম)। এ স্বভাব-মাফিক করেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র স্বভাবে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না।"

ইসলাম প্রচারের রীতি-নীতি বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তুমি আল্লাহ্‌র পথে লোকদের কৌশল ও সদুপদেশ সহকারে আহ্বান কর। হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা কর।"

যেখানেই ইসলামের বিশেষ বিশেষ আকীদার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেখানেই বুদ্ধিজাত যুক্তি দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণে এত বেশী যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, এ গ্রন্থে সে সবের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণ করতে গিয়ে কুরআন বলে ঃ

"যদি আকাশ-জমিনে একাধিক আল্লাহ্ হতো, তবে উভয়স্থলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো।"

আল্লাহ্ যে প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞাত, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জ্ঞাত নন?"

রসূলুল্লাহ্‌র নুবুওয়াত সম্পর্কে ইসলাম-বিরোধীদের যে বিস্ময় ছিল, তা নিরসন করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আপনি (রসূল করীম) বলুন—আমি কোন নতুন পয়গাম্বর নই।"

পুনরুত্থান অসম্ভব কিছু নয়—এ বিষয়ে লোকের আস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা কি মনে করছ যে, আমি তোমাদের বৃথাই সৃষ্টি করেছি! তোমরা কি আমার কাছে ফিরে আসবে না?"

মোটকথা, প্রত্যেক ধর্মেই ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইসলামের প্রতি—ইসলামের বিশেষ বিশেষ আকায়েদের প্রতি লোকের বিশ্বাস ও আস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কুরআন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা যুক্তিসহকারেই করা হয়েছে। কোন স্থানেই এরূপ বলা হয়নি যে, ওমুক আকীদাকে যুক্তি ছাড়াই বরণ করে নাও।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো—বর্তমান যুগের ফ্যাশান অনুসারে সকল ধর্মাবলম্বীরাই এ দাবি করছে যে, তাদের ধর্ম

বুদ্ধিসম্মত। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, এটা কি তাদেরই দাবি, নাকি তাদের ধর্মও অনুরূপ দাবি করেছে?

ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন ধর্মই এ দাবি করেনি যে, এ ধর্ম বুদ্ধিসম্মত এবং বিবেক-বুদ্ধির তাগিদেই এ ধর্মকে মানতে হবে। এটা এমন একটি পার্থক্য, যা ইসলামকে সুস্পষ্টভাবে অন্যান্য ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

পূর্বসূরিগণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণে বলতেন: পৃথিবী পরিবর্তনীয় এবং যা পরিবর্তনীয় অর্থাৎ অচিরন্তন, তা অবশ্যই হেতু নির্ভর। এই হেতুই হলেন আল্লাহ্। এই প্রমাণের দ্বিতীয় ভূমিকা স্পষ্ট। প্রথম ভূমিকা প্রমাণে বলা হতো যে, পৃথিবীতে অহরহ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং যে বস্তু পরিবর্তনশীল, তা নশ্বর, অচিরন্তন। এ প্রমাণ বাহ্যত খুবই স্পষ্ট ছিল। এজন্যেই তা ভালরূপে খতিয়ে দেখা হয় নি। মূলত এ প্রমাণটি ছিল ভ্রমাত্মক। কারণ পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই দু'টি বস্তুর যৌগিক: জড় উপাদান ও বিশেষ একটি আকার। কেবল আকারই পরিবর্তিত হয়। কিন্তু জড় বস্তু ও মৌল উপাদান সব সময় একই অবস্থায় থাকে। কোন বস্তু ধ্বংস হচ্ছে—এর মানে কেবল তার আকারই ধ্বংস হচ্ছে। মৌল উপাদান কোন না কোন আকারে সব সময়ে বিদ্যমান থাকে। একখণ্ড কাগজ পুড়িয়ে ফেলুন। দেখবেন—তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কাগজটি তো ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তার ছাই বিদ্যমান রয়েছে। এটা মৌল উপাদানেরই অন্য একটি আকার। ছাইকে ধ্বংস করে দিন। কিন্তু তা যে কোন আকারে বিদ্যমান থাকবেই। মোট কথা, কেবল আকারই পরিবর্তিত হয়। মূল জড়বস্তু পরিবর্তিত হয়—এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ বা পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত কোন অভিজ্ঞতা নেই। কোন প্রমাণও এ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অ্যারিস্টটলের প্রমাণ

তাই আকারের দিকটি বিবেচনা করে পৃথিবীকে অচিরন্তন বলা যায়। কিন্তু মৌল উপাদানের দিক থেকে বলা যায় না। পৃথিবীর নশ্বরতা যখন প্রমাণিত হয়নি, তখন তার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্‌র

অস্তিত্ব প্রমাণ করাও সংগত হবে না। এ প্রশ্নটি বিবেচনা করেই অ্যারিস্টটল অন্য এক প্রকার প্রমাণ অবলম্বন করেন। তা হলো—পৃথিবীর সকল অংগই গতিশীল। কারণ তা বাড়ে ও কমে। এ হ্রাস-বৃদ্ধি হলো এক ধরনের গতি। যে সব বস্তুকে একই অবস্থায় থাকে বলে আমরা মনে করি, তাদের অংগগুলো পরিবর্তনশীল। পুরনো অংগ ধ্বংস হয়ে যায় এবং নতুন অংগ সে সব জায়গা দখল করে নেয়। অংগের পরিবর্তনও এক প্রকার গতি। তাই বলতে হয় যে, গোটা বিশ্ব গতিশীল। আবার যে বস্তু গতিশীল, তার গতির একজন নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক নিশ্চয়ই রয়েছে। এখন সামনে আছে দু'টি বিকল্প : হয়তো বলতে হবে যে, এই গতি-শৃঙ্খল কোথাও গিয়ে থেমে যাবে, অর্থাৎ এমন একটি বস্তু প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, যা নিজেই হবে সকল বস্তুর গতি-নিয়ামক ; কিন্তু তা স্বয়ং গতিশীল হবে না। এই নিয়ন্ত্রকই হলেন আল্লাহ্। তা না হয় বলতে হবে যে, এই গতি-শৃঙ্খল অনন্ত রেখার দিকে এগুতে থাকবে, যার কোন শেষ সীমা নেই। অথচ এটা হতে পারে না। কারণ অন্তহীনতা অবান্তর।

অ্যারিস্টটলের আসল মত হলো—বিশ্ব চিরন্তন। তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার গতি অচিরন্তন। আল্লাহ্ই এ গতির স্রষ্টা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই অ্যারিস্টটল গতির আলোকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ইবনে রুশ্দ্ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন।

বু-আলী সিনার প্রমাণ-পদ্ধতি

বু-আলী সিনাও বিশ্বের চিরন্তনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইসলামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই তিনি একথা বলতে পারেন নি যে, বিশ্ব আল্লাহ্-সৃষ্ট নয়। তাই তিনি এ মত অবলম্বন করলেন যে, বিশ্ব চিরন্তনও বটে, আবার আল্লাহ্-সৃষ্টও বটে। এর উপর প্রশ্ন দাঁড়ালো যে, বিশ্ব ও আল্লাহ্ উভয়ই যদি স্থায়ী ও চিরন্তন হয়, তবে একটি 'কারণ' আর অপরটি 'কার্য' কি করে হতে পারে? 'কারণ' ও 'কার্যের' মধ্যে কালের ব্যবধান অত্যাবশ্যক। বু-আলী সিনা এর উত্তরে বলেন, কারণের সত্তার দিক থেকে পূর্ববর্তিতা থাকলেই যথেষ্ট, কালের দিক থেকে এর প্রয়োজন নেই। যেমন তালা খুলে

যাওয়ার কারণ হলো চাবির গতি। অথচ চাবির গতি ও তালা খুলে যাওয়া—এ দু'টির মধ্যে মুহূর্তেরও ব্যবধান নেই।

মুতাকাল্লিমগণ মনে করেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর চিরন্তনতা মেনে নেয়া হলে আল্লাহ্র অদ্বিতীয়তা ও অতুলনীয়তার পক্ষে তা নেতিবাচক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তারা দাবী করলেন যে, বিশ্ব অচিরন্তন। এই অচিরন্তনতার উপর ভিত্তি করেই তাঁরা আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাঁরা বিশ্বের অচিরন্তনতা কিভাবে প্রমাণ করলেন, তা বুঝতে হলে নিম্নলিখিত সূত্রগুলো মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

মুতাকাল্লিমদের প্রমাণ

১. বিশ্বে দু'প্রকার বস্তু দেখতে পাওয়া যায় ঃ (ক) গুণ অর্থাৎ যা স্বমূর্ত নয়, যা অস্তিত্ব লাভ করে অপর বস্তুর সহায়তায়। যেমন ঃ গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ, দুঃখ, আনন্দ, প্রেরণা। (খ) দ্রব্য অর্থাৎ যা স্বমূর্ত। যেমন ঃ পাথর, মাটি, পানি।

২. কোন দ্রব্য গুণশূন্য নয়। কেননা প্রত্যেক দ্রব্যই কোন না কোন আকারে বা অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এই আকার বা অবস্থাই হলো গুণ। প্রত্যেক দ্রব্যে কোন না কোন প্রকার গতি রয়েছে। এই গতি হলো গুণবাচক বস্তু। মোটকথা, প্রত্যেক দ্রব্যেই গুণ রয়েছে। কোন দ্রব্য গুণশূন্য নয়।

৩. গুণ অচিরন্তন। তা সৃষ্টিও হয়, আবার ধ্বংসও হয়ে যায়।

৪. যে বস্তু গুণমুক্ত নয়, তা অবশ্যই নশ্বর। কেননা, তা যদি অবিনশ্বর হয়, তবে গুণকেও অবিনশ্বর হতে হবে। এ দু'টি বস্তু পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। তাই তাদের মধ্যে একটি যদি চিরন্তন হয়, তবে অপরটিকেও চিরন্তন হতে হবে।

এখন বিশ্বের নশ্বরতা এভাবে প্রমাণ করা যায় যে, বিশ্বে যা আছে, তা হয়তো দ্রব্য হবে, নয়তো গুণ। দ্রব্য ও গুণ—উভয়ই অচিরন্তন। গুণ কেন অচিরন্তন, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কোন দ্রব্য গুণমুক্ত হতে পারে না বলে প্রত্যেকটি দ্রব্যকে অচিরন্তন বলতে হবে। পূর্বেও বলা হয়েছে, যে বস্তু গুণশূন্য হতে পারে না, তা অচিরন্তন।

এটা যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্ব অচিরন্তন, তখন অবশ্যই বলতে হবে যে, এর পেছনে কোন একটি কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। এই কারণ-শৃঙ্খল যেখানে গিয়ে থেমে যাবে, তাই হবে আল্লাহ্। আর যদি থেমে না যায়, তবে অন্তহীনতার প্রশ্ন দাঁড়াবে; আর অন্তহীনতা অবান্তর।

মুতাকাল্লিমদের এ প্রমাণ ফরফুরিউস থেকে গৃহীত। 'ইলমে কালাম'-এর ইতিহাসেও এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ প্রমাণ কেবল সে সময় যথার্থ হতে পারে, যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, অনন্ত-অসীম কালের অস্তিত্ব নেই। আর যদি এটা মেনে না নেয়া হয়, তবে মুতাকাল্লিমদের পেশকৃত আল্লাহ্র অস্তিত্বের এ প্রমাণ ভ্রমাত্মক বলে বিবেচিত হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্লেটো আর অ্যারিস্টটলও এ বিষয়টি সুরাহা করতে পারেন নি। মুতাকাল্লিমগণ তাঁদেরই অনুসরণ করেন। তাই এঁরাও এ বিষয়ে অকৃতকার্য হন।

এখন দেখুন, কুরআন মজীদ কিভাবে এ সমস্যাটির সমাধান করেছে।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনের প্রমাণ-পদ্ধতি

আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা নেওয়া—এটা মানুষের একটি প্রকৃতিগত বিষয়। অন্য কথায়, আল্লাহ্র স্বীকৃতি মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে। যাঁরা মানব জাতির ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ, তাঁরা ফলাও করে বলেছেন যে, মানুষ যখন প্রকৃতির যুগে বাস করতো, অর্থাৎ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান আর তহযীব-তমদ্দুনের অস্তিত্বও ছিল না, তখন তারা কি মূর্তিপূজা করতো, নাকি আল্লাহ্র ইবাদত? জড়বাদী ছাড়া অন্য মতবাদের সকল বিশেষজ্ঞ এ মত প্রকাশ করেন যে, মানুষ সর্বপ্রথম আল্লাহ্র ইবাদতই অবলম্বন করেছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্স্মুলর তাঁর গ্রন্থে বলেনঃ "আমাদের পূর্বপুরুষগণ যখন আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করেছিলেন, তখন তাঁরা এটাও জানতেন না যে, তাঁকে কোন্ কোন্ নামে ডাকতে হবে? এরপর সাকার আল্লাহ্র পূজা-অর্চনা শুরু হয় এবং নিরাকার আল্লাহ্র ধ্যান-ধারণা তার অন্তরালে চাপা পড়ে যায়।

যে যুগ থেকে পৃথিবীর ইতিহাস শুরু হয়, সে যুগ থেকেই দেখা যায় যে, মানুষ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে আসছে। আসুরী, মিসরী, কালদানী, ইহুদী—সবাই আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী ছিলেন।

প্লুটার্ক বলেন ঃ আপনারা যদি পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করেন, তবে এমন অনেক স্থান দেখতে পাবেন, যেখানে দুর্গ, রাজনীতি, বিদ্যা, শিল্প, ধন-দৌলত—এসবের কিছুই নেই। কিন্তু এমন একটি স্থান কোথাও খুঁজে পাবে না, যেখানে আল্লাহ্ নেই।

ফুলিটার ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত জ্ঞানী। তিনি ওহী ও দৈব জ্ঞানে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, জোরায়াস্টার, মনুসুলুন, সক্রেটিস, সস্‌রু—এঁরা সবাই এক প্রভুর পূজা করতেন। এবং এটাই ছিল তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ আল্লাহ্‌কে যুগে যুগে স্বীকার করে নিয়েছে—এ বিষয়টি বর্ণনা করে কুরআন বলে ঃ

"আল্লাহ্ যখন বনি আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশ নির্গত করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী করে বললেন ঃ আমি কি তোমাদের আল্লাহ্ নই? তখন সবাই বলে উঠলো ঃ হাঁ, আমরা সাক্ষী রইলাম।"

অনেক সময় বাহ্যিক কারণে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের এই স্বাভাবিক অনুভূতি চাপা পড়ে যায়। তাই আল্লাহ্ বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রাকৃতিক আইন-কানুনের নিয়ন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন ঃ

"এমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে কি তোমাদের সন্দেহ হতে পারে, যিনি আকাশ-জমিনের স্রষ্টা।"

চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মানুষ যে সব বিষয় বুঝতে পারে, তন্মধ্যে একটি হলো যখন সে কোন বস্তুকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল দেখতে পায়, তখন সে এ কথা বিশ্বাস করে নেয় যে, কোন বুদ্ধিমান সত্তাই এটি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। আমরা যদি কোন স্থানে কতগুলো এলোমেলো বস্তু দেখতে পাই, তখন আমাদের ধারণা হয় যে, হয়তো এগুলো এমনিতেই অগোছালো হয়ে গেছে। কিন্তু বস্তুগুলোকে যদি এমন সুচারুরূপে সাজানো গোছানো অবস্থায় দেখতে পাই, যা একজন দক্ষ শিল্পীর পক্ষেও করা মুশকিল, তখন এ ধারণা কখনো মনে জাগে না যে, এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে। বিষয়টি অন্য একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিন। খাজা হাফিয

বা নিযামীর কোন একটি কবিতা তুলে নিন। অতঃপর তার শব্দগুলোকে এলোমেলো করে একজন সাধারণ লোকের হাতে দিন এবং শব্দগুলোকে পুনরায় গুছিয়ে সাজিয়ে দিতে বলুন। দেখতে পাবেন যে, শতবার উলট-পালট করলেও, এমন কি দৈবক্রমেও তা পুনরায় কখনো হাফিয বা নিযামীর কবিতায় পর্যবসিত হবে না। অথচ শব্দ, অক্ষর, বাক্য—সবই পূর্ববত রয়েছে। কেবল সাজানো গোছানোর পার্থক্য। তা হলে এখন বুঝতে পারবেন যে, যে বিশ্ব এত সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, তা কি করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কায়েম হয়ে গেলো? কুরআন মজীদে এ সুনিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ ক'রে তা নিম্নরূপ ভাষায় প্রমাণ করা হয়েছেঃ

"আল্লাহ্‌র কারিগরি দেখ! তিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে খুবই পাকা করে প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ্‌র কারিগরিতে কোন তারতম্য দেখতে পাবে না। আবার দেখ! কিন্তু কোথাও কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সুচারুরূপে তার নিয়ন্ত্রণও সাধন করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন রদবদল সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র বিধানে কখনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।"

উপরিউক্ত আয়াতে বিশ্বকে তিনটি গুণে গুণান্বিত করা হয়েছেঃ (১) পূর্ণাঙ্গ ও নির্দোষ (২) সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত (৩) বিশ্ব এমন বিধি-বিধানভুক্ত, যাতে কখনো পরিবর্তন সূচিত হবে না। এটা হলো যুক্তির প্রথম ভূমিকা। দ্বিতীয় ভূমিকা স্পষ্ট। তা হলো যে বস্তু পূর্ণাঙ্গ ও চিরনিয়ন্ত্রিত, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। বরং কোন শক্তিমান সত্তাই তা সৃষ্টি করেছে। আজ গবেষণা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে; বিশ্বের শত শত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অনেক সত্য ঘোমটা ফেলে আত্মপ্রকাশ করেছে। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বহু চিন্তা-ভাবনার পর আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণে সে সব যুক্তিই পেশ করলেন, যা কুরআন মজীদ তেরশ' বছর পূর্বে সাদাসিধে ও পরিষ্কার ভাষায় পেশ করেছিল।

নিউটন বলেনঃ "বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে স্থান ও কালের হাজার হাজার বিপ্লব অতিক্রম করেছে। তা সত্ত্বেও তাতে যে শৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়, তা একজন নিয়ন্তা ছাড়া সম্ভব নয়। এই নিয়ন্তা হলেন সর্বাদি সত্তা, জ্ঞানবান ও শক্তিমান।"

ইউরোপীয় দার্শনিক কর্তৃক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের স্বীকৃতি

এ কালের সবচাইতে বড় দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার বলেনঃ "এ রহস্যগুলো নিয়ে যতই চিন্তা-ভাবনা করি, ততই তা সূক্ষ্ম বলে মনে হয়। এতে নিশ্চিত বোঝা যায় যে, মানুষের উপর এমন একটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ক্ষমতা রয়েছে, যেখান থেকে হয়েছে সকল বস্তুর উৎপত্তি।"

ক্যামিল প্লামারিয়ন বলেনঃ "কোন শিক্ষাগুরুই এটা বুঝতে পারছে না যে, বিশ্বের অস্তিত্ব কি করে হলো এবং কিভাবে তা অটুট রয়েছে? বাধ্য হয়ে তাঁরা এমন একজন স্রস্টা স্বীকার করে নিলেন, যিনি সদা বিরাজমান ও সক্রিয়।"

অধ্যাপক লিনি বলেনঃ "শক্তিমান ও বুদ্ধিমান আল্লাহ্ নিজ অদ্ভুত কারিগরির মহিমা নিয়ে আমার সামনে এভাবে উদ্ভাসিত হন যে, আমার চোখ দু'টি তাঁর প্রতি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং আমি পুরোপুরি তন্ময় হয়ে পড়ি। প্রত্যেকটি বস্তুতেই, তা যতই ছোট হোক না কেন, তাঁর অদ্ভুত শক্তি, আশ্চর্য কৌশল ও বিচিত্র অনবৈদ্যতা পরিলক্ষিত হয়।"

ফ্রুণ্টল বিশ্বকোষে বলেনঃ "আমাদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করাই পদার্থবিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর মহৎ উদ্দেশ্য হলো— বুদ্ধি-সঞ্জাত দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বস্রস্টার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উদ্‌ঘাটনে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করা।"

নাস্তিকদের অভিযোগ

সবকিছুর আগে বলে রাখা উচিত, আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করা—এটা কোন একটা নতুন ধ্যান-ধারণা নয়। সর্বকালেই নাস্তিকদের একটি দল ছিল, যারা পুরোপুরি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো; অন্তত এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো। বর্তমান বিজ্ঞান ও দর্শন এ বিষয়ে নতুনভাবে কিছু আলোকপাত করেনি। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাসের সমর্থনে নতুন কোন যুক্তি দাঁড় করানো এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী নাস্তিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো—পূর্বসূরীদের যুক্তি খুব সূক্ষ্ম ও জোরালো হতো। কিন্তু বর্তমান নাস্তিকদের যুক্তিকে যুক্তিই বলা চলে না। এদের যাবতীয় আলোচনার সার কথা হলো ঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কোন প্রমাণ মেলে না। জড় বস্তু ছাড়া বিশ্বে আর কিছুই নেই। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার না করেও বিশ্ব-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়।" বলা বাহুল্য, এটা প্রমাণ নয়, বরং অজ্ঞতার পরিচায়ক।

মুসলিম মুতাকাল্লিমগণ পূর্বসূরী নাস্তিকদের যুক্তিগুলো বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করেন। ইবনে হায্‌ম্‌ তাঁর 'মিলাল্‌-ও-নিহাল্‌' নামক গ্রন্থটি নাস্তিকদের অভিযোগের বর্ণনা দিয়েই শুরু করেন। তিনি অভিযোগগুলোর উত্তরও দেন। এই অভিযোগগুলো খুবই দৃঢ় ও জোরালো। কৌতূহল নিবারণের জন্য একটি অভিযোগের বর্ণনা দিচ্ছি ঃ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রাচীন নাস্তিকদের অভিযোগ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করা হলে আমরা (প্রাচীন নাস্তিকেরা) জিজ্ঞেস করবো—যে ঘটনাটি আজ ঘটলো, তার 'কারণ' চিরন্তন হবে, না অচিরন্তন? চিরন্তন হলে বলতে হবে যে, এ ঘটনাটিও

চিরন্তন। কেননা, কারণের সঙ্গে কার্যের বিদ্যমানতাও প্রয়োজন। আর ঘটনাটি অচিরন্তন হলে তার কারণও অচিরন্তন হবে এবং সেহেতু তার জন্য আরো আরো কারণের প্রয়োজন হবে। এখন কথা হলো, এ কারণ-শৃঙ্খল যদি এমন এক স্থানে গিয়ে শেষ হয়, যা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী, তবে পুরো শৃঙ্খলটাকেই চিরন্তন বলতে হবে। কেননা, সর্বোচ্চ কারণ যদি চিরন্তন হয়, তবে তার প্রথম কার্যটিও চিরন্তন হবে। প্রথম কার্যটি যখন চিরন্তন হলো, তখন পরবর্তী কার্যগুলোও চিরন্তন হবে এবং এভাবেই সামনে চলতে থাকবে। আর এই কার্য-শৃঙ্খল যদি কোন চিরস্থায়ী কারণে গিয়ে শেষ না হয় এবং তা সীমাহীনভাবে চলতেই থাকে, তবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব কোথায়?

পূর্বসূরী নাস্তিকদের আরো অনেক জোরালো অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু আমি সেগুলোর উল্লেখ করে ঘুমন্ত ফ্যাসাদগুলোকে পুনঃ জাগাতে চাই না। ইউরোপের নাস্তিকেরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আজ-কাল যে সব অভিযোগ আনছে এবং যার ফলে আমাদের দেশে ধর্মহীনতা প্রসার লাভ করছে, আমরা কেবল সেসব অভিযোগই উদ্ধৃত করবো এবং সেগুলোরই উত্তর দেবো।

জড়বাদী

যারা আল্লাহ্‌য় অবিশ্বাসী, তাদেরকে জড়বাদী বলা হয়। মূলত জড়বাদীরা আল্লাহ্ নেই বলে দাবি করে না। তাদের কথা হলো— "আল্লাহ্ আমাদের আলোচনার গণ্ডির বাইরে।" ব্যাপারটা তাই। কেননা, তাদের জ্ঞানের দৌড় জড় পদার্থ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ জাড্য নন। অধ্যাপক লিট্রার ভাষ্যের উদ্ধৃতি আমরা পূর্বেই দিয়েছি। তাঁর বক্তব্য হলো—জড়বাদ প্রথম জ্ঞান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। কারণ সে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই। জড়বাদীরা বলতে চায়ঃ আমরা এই কৌশল অস্বীকার করি না, আবার তা স্বীকারও করি না। এ 'হাঁ' বা 'না' নিয়ে আমাদের কাজ নেই।

জড়বাদীরা আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী নয় কেন?

এ সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে বলেঃ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করা ও অস্বীকার করা—এ দু'টি বিকল্পের মধ্যে অস্বীকার করার দিকটাই বেশী জোরালো। তারা বলেঃ

আমাদেরকে সবকিছুর আগে স্থির করতে হবে যে, কোন বস্তুকে স্বীকার করা বা অস্বীকার করা, অথবা কোন বস্তুকে হাঁ-সূচক বা না-সূচক বলে পরিগণিত করার জন্য প্রাথমিক নীতি কি আছে ? বর্তমানে প্রচলিত দর্শনের প্রাথমিক নীতি হলো—কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি নিশ্চিত প্রমাণ না থাকে, তবে আমাদের উচিত হবে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। ক্যান্ট ও বেকন তাঁদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন এ নীতির উপর। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ নীতিরই অনুসরণ করে থাকি। মনে করুন—একটি বস্তুর অস্তিত্বেরও প্রমাণ নেই, আবার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় আমরা সে সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে থাকি ? আমরা এটা বলি না যে, এ বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানি না। বরং আমরা বলে থাকি যে, যতটুকু জানি, এ বস্তুটি বিদ্যমান নয়। যেমন আমরা বলে থাকি—পৃথিবীর কোন অংশে এমন লোকও থাকতে পারে, যার দু'টি মাথা রয়েছে; এমন জন্তুও থাকতে পারে, যার আকৃতি মানুষের ন্যায়; এমন নদীও থাকতে পারে, যাতে মাছ নেই, বরং মানুষ বাস করে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে এ সকল বস্তু নেই বলেই আমরা বিশ্বাস করে থাকি। কেন করে থাকি ? উত্তরে বলা হয় যে, এসবের অস্তিত্বের কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। আল্লাহ্‌র বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা—এ দু'টি বিকল্পের মধ্যে কোনটাই যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হয়, তবে উপরিউক্ত নীতি মোতাবেক আল্লাহ্ নেই বলেই নিশ্চিতভাবে মনে করতে হবে।

নাস্তিকেরা আরো বলে :

সুতরাং আল্লাহ্‌র অবিদ্যমানতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেবল দেখতে হবে যে, তার অস্তিত্বের পক্ষে যেসব প্রমাণ পেশ করা হয়, তা কতটুকু যথার্থ ? অস্তিত্বের যত প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে একটি সাধারণ বস্তু দেখা যায়। তা হলো—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব না মানলে অনন্ত ও অসীম কারণ-শৃঙ্খল মেনে নিতে হয়। কিন্তু অন্তহীনতা অবান্তর বলে আস্তিকেরা কোন যুক্তি পেশ করতে পারছে না।

এর উত্তরে হয়তো এটা বলা হবে যে, অন্তহীনতার ধারণা মানুষের অনুভূতি-শক্তির ঊর্ধ্বে। এজন্যই তা অবান্তর। কিন্তু এতেও

প্রশ্ন দাঁড়ায়। তা হলো—আল্লাহ্‌কে যেভাবে চিরস্থায়ী ও চিরন্তন বলে বিবেচনা করা হয়, সেটাওতো এক ধরনের অন্তহীনতা। আল্লাহ্‌র চিরন্তনতা ও অন্তহীনতা কি কোন বস্তুর অন্তহীন কারণ শৃঙ্খল থেকে কম আশ্চর্যের কথা?

নাস্তিকেরা আরো বলে ঃ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণে এ ভূমিকাটি জোরেশোরে পেশ করা হয় ঃ আমরা প্রকাশ্যে দেখতে পাই যে, কারণ ছাড়া কোন বস্তু সৃষ্টি হয় না। কোন বস্তুর সৃষ্টির জন্য কারণের প্রয়োজন রয়েছে—এ কথাটি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। এটা ঠিক যে, যে সব বস্তুকে আমরা সৃষ্টি হতে দেখেছি, সেগুলো কারণ ছাড়া সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কত সংখ্যক বস্তুকে সৃষ্টি হতে দেখেছি। আমরা কি মৌল উপাদানকে সৃষ্টি হতে দেখেছি? আমরা যা দেখেছি, তা হলো মৌল উপাদানের বিভিন্ন আকারের সৃষ্টি। মৌল উপাদানের সৃষ্টি আমরা দেখিনি। তাই এতটুকু বলা যেতে পারে যে, আকার সৃষ্টির জন্য কারণের প্রয়োজন রয়েছে। এর চাইতে বেশী কিছু বলতে গেলে তার ভিত্তি অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর হবে না, বরং তা হবে কল্পনার উপর। তাই বিশ্ব-সৃষ্টির জন্য কারণের প্রয়োজন রয়েছে—এ দাবি যথার্থ নয়। কেননা বিশ্ব মৌল পদার্থের নামান্তর। মৌল পদার্থ নশ্বর ও সৃষ্ট বলে কোন প্রমাণ নেই। তাই তার কারণও প্রমাণিত হতে পারে না।

হয়তো বলা হবে য, মৌল উপাদান চিরন্তন হলেও তা কোন সময় আকারশূন্য হয় না। তাই এসব আকার সৃষ্টির জন্য কোন একটি কারণের প্রয়োজন এবং সেই কারণই হলো আল্লাহ্‌। এ প্রমাণও যথার্থ নয়। কেননা মৌল উপাদান চিরন্তন। তার আকারগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টিও হয়, আবার লয়প্রাপ্তও হয়ে যায়। তাই এসব সৃষ্টির ‘কারণ’ চিরন্তন হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ ধ্বংসনীয় কারণের।

তারা আরো বলে ঃ

আসল কথা হলো— আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় বিশ্ব-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই আমাদের এটাই দেখতে হবে যে, বিশ্বের অস্তিত্ব ও তার শৃঙ্খলা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া কল্পনা করা যায়

কি-না? যদি করা যায়, তবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শূন্য থেকে কোন বস্তু সৃষ্টি হয় না। এ নিরিখেই বলা হয়, বিশ্বের মৌল উপাদান চিরন্তন। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্ব যখন তার যৌগিক আকৃতি ধারণ করেনি, তখন অসীম শূন্য-জগতে অণু-পরমাণু ছড়ানো ছিল। এই অণু-পরমাণু পরস্পর মিলিত হয়েই সেগুলো ক্রমান্বয়ে বিশ্বের আকার ধারণ করেছে। এই অণুগুলোকে পরিভাষায় ডেমোক্রাইটাসের নামানুসারে 'ডেমোক্রাইটাসী' অণু বলা হয়।

এ মতবাদে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়। তা হলো—এই অণু ও অংগ-গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কি করে একত্র হলো? এ বিভিন্ন যৌগিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে কি করে সৃষ্টি হলো? প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, মৌল উপাদান যেমন চিরন্তন, গতি আর শক্তিও তদ্রূপ চিরন্তন। গতি হলো অমিশ্র অণুনিচয়ের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। যে সব পদার্থ আমাদের কাছে নিশ্চল বলে মনে হয়, তাদের অঙ্গগুলোও মূলত সব সময় গতিশীল। কেবল পরস্পর আকর্ষণীয় দু'টি বস্তুর সংঘর্ষের ফলেই সেগুলো নিশ্চল হতে পারে। মোট কথা, মৌল উপাদান যেমন চিরন্তন, তার গতিও তেমনি চিরন্তন। মৌল উপাদান কোন সময় গতিশূন্য হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হবে যে, শূন্য জগতে ছড়ানো ডেমোক্রাইটাসী অণুসমূহের পরস্পর মিলন মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

এখন শুধু এ প্রশ্ন থাকে যে, এ অদ্ভুত সৃষ্টিরাজি, যার আগা-গোড়া কলা-কৌশল আর শিল্প চাতুর্যে ভরা, তা কি করে দৈবক্রমে সৃষ্টি হতে পারে? ধর্ম সুচারুরূপে এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে এবং বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এ প্রশ্নটিই আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে। রসিন বলেন ঃ

"হে আকাশ! তুমি আমায় বল! হে দরিয়া! আমায় বল! হে জমিন, আমায় উত্তর দাও! হে অসংখ্য তারা, আমায় বল—কোন্ অদৃশ্য হাত তোমাদেরকে আকাশ-দিগন্তে ধরে রেখেছে? হে চতুর্দশী রাত! কে তোমার অন্ধকারকে আলো বিতরণ করেছে? তুমি কত জাঁকালো ও মহিমান্বিত! তোমার ভাব-ভংগী বলে দিচ্ছে—তোমার

পেছনে একজন শিল্পী রয়েছেন, যিনি তোমাকে অক্লেশে সৃষ্টি করেছেন; তোমার ছাদকে আলোর গম্বুজ দিয়ে সাজিয়েছেন; জমিনের উপর মাটির ফরশ বিছিয়েছেন এবং ধূলোবালির জাল সৃষ্টি করেছেন। হে সুসংবাদবাহী প্রভাত! হে চিরউজ্জ্বল তারা! হে জ্যোতিষ্মান সূর্য—সত্যিকারভাবে বল—তুমি কার আনুগত্যের জন্য পরিব্যাপ্ত অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসছ এবং বদান্যতা সহকারে পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছ?"

"হে ভয়াল সমুদ্র! তুমিতো ক্ষিপ্ত হয়ে জমিনকে গ্রাস করতে চাইছো। কে তোমাকে এমনি আবদ্ধ করে রেখেছে, যেমন সিংহকে কুঠরীতে আবদ্ধ করে রাখা হয়? তুমি অনর্থক এ কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছো। তোমার শক্তি কখনো নির্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।"

আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যক্ষ স্রষ্টা, না-কি পরোক্ষ স্রষ্টা?

এ প্রশ্নের জওয়াব দিতে হলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে, ধর্মাবলম্বিগণ বিশ্বের সৃষ্টি ও তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে ঐশ নীতি বর্ণনায় কি বলেছেন? এ বিষয়ে ধর্মালম্বীদের দু'টি দল আছে: একদলের মতে, বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি হয়, তার প্রত্যেকটিকে আল্লাহ্ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে 'কারণ' বা মধ্যবর্তী কোন বস্তুর মোটেই দখল (ভূমিকা) নেই। বৃষ্টি বর্ষিত হয়—তার কারণ এই নয় যে, সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠে, তা শূন্যে উঠে শীতল বায়ুর স্পর্শে পানি-বিন্দুতে পরিণত হয় এবং তা মেঘের আকার ধারণ করে বর্ষিত হয় বরং আল্লাহ্ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে বারিপাত ঘটান।

দ্বিতীয় দল বলেন, আল্লাহ্ বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন বিশ্বে সৃষ্টি-ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ পানিতে এ বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, উত্তাপ পড়লে তা বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পের বৈশিষ্ট্য হলো—ঠাণ্ডা লাগলে তা জলকণায় পরিণত হয়। এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির পর প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌কে হস্তক্ষেপ করতে হয় না। বরং এসব বৈশিষ্ট্যের ফলে নির্দিষ্ট সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাষ্পের সৃষ্টি হয়, তা উপরে

উত্থিত হয়, জলকণায় পরিণত হয় এবং শেষ পর্যায়ে বর্ষিত হয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির জন্য কতগুলো নিয়ম নির্ধারিত করে রেখেছেন। তদনুসারেই পৃথিবীতে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে এবং নব নব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করছে। ধর্ম-বিশ্বাসী পণ্ডিতগণ মোটামুটি এ মতই পোষণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে আশায়েরা ছাড়া বাকি সকল সম্প্রদায় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

এটা যখন সমর্থন লাভ করেছে যে, বিশ্বের সৃষ্টি-ধারা কতগুলো প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই প্রবাহিত হয়, তখন একটিমাত্র আলোচ্য বিষয় বাকি থাকছে। তা হলো প্রাকৃতিক নিয়মাবলী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে, নাকি আল্লাহ্ সেগুলো সৃষ্টি করেন? যদি প্রথমোক্ত কথাটি মেনে নেয়া হয়, তবে আল্লাহ্র মোটেই প্রয়োজন থাকে না।

প্রাকৃতিক নিয়ম স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠে

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৌল উপাদান চিরন্তন। আধুনিক বিজ্ঞান আরো প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কেবল মৌল উপাদানই নয়, তার গতিও চিরন্তন। মৌল উপাদানের অমিশ্র অংগগুলো ছিল নিত্য ঘূর্ণায়মান। সেই অংগগুলোর সংমিশ্রণে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টির পরেও তাদের ঘূর্ণায়মানতা লোপ পায়নি। বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে তাদের অংগগুলো পূর্ববত ঘূর্ণায়মান রয়েছে, যদিও তা আমাদের নজরে ধরা দেয় না।

এ বিষয়টি মেনে নেয়ার পর প্রাকৃতিক নিয়মের জন্য কোন স্রষ্টারই প্রয়োজন থাকে না। মৌল উপাদানের অঙ্গসমূহের সংমিশ্রণে বিভিন্ন আকারের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকটি আকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজনেরই ফল, বাহির থেকে কারো দেওয়া নয়। বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া হোক। প্রাচীন দর্শনে এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, বস্তুর বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয় না, বরং তা আপনা-আপনি জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আল্লাহ্ বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। এ সবের প্রত্যেকটির ডাল, পাতা, ফুল, ফল, স্বাদ ও বর্ণ,—সবই স্বতন্ত্র ধরনের। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে এসব স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেন নি। তিনি কেবল বৃক্ষ শ্রেণী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তার জন্য এসব

বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন রয়েছে বলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সেগুলোর সৃষ্টি হয়েছে।

শাহ ওলীউল্লাহ্ 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ' গ্রন্থে বলেন :

"আল্লাহ্ প্রত্যেক শ্রেণীর বৃক্ষের জন্য স্বতন্ত্র ধরনের পাতা, ভিন্ন রকমের ফুল, বিশেষ প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। এসব বৈশিষ্ট্যের দরুন বোঝা যায় যে, এটা এই শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ, আর ওটা ঐ শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ। এসব স্বাতন্ত্র্য শ্রেণীগত রূপের অধীন।"

তিনি আরো বলেন :

"আমাদের এটা জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই যে, খুরমা ফল এ ধরনের হয় কেন ? এরূপ প্রশ্ন করা বৃথা। কেননা, সত্তাগতভাবে পদার্থের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই বৈশিষ্ট্য সঙ্গে নিয়েই প্রত্যেকটি পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং এখানে এ প্রশ্ন করা ঠিক হবে না যে, পদার্থটি এরূপ হলো কেন ?"

শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য চিরন্তন, নাকি নৈমিত্তিক

বেশীরভাগ প্রাকৃতিক দৃশ্য পদার্থের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে এগুলো সৃষ্টি করেন নি। এগুলো হলো শ্রেণীগতরূপে অবশ্যম্ভাবী ফল। এগুলো পদার্থের সাথেই সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়টি মেনে নেয়ার পর শুধু একটি প্রশ্ন বাকি থাকে। তা হলো—শ্রেণীগত রূপের স্রষ্টা কে ? এতটুকু পূর্ববর্তী দার্শনিকগণও মেনে নিয়েছেন যে, শ্রেণীগত রূপ চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

'নাশ্রুত্ তওয়ার্লে' নামক গ্রন্থে আছে :

"অ্যারিস্টটল, আবু নসর ফারাবী ও আবু আলী সিনার মতে, স্বর্গমণ্ডলের মৌল উপাদান, তার পরিমাণ ও আকার চিরন্তন। কেবল তাদের গতি চিরন্তন নয়। পদার্থের মৌল উপাদান ও তার শ্রেণীগত তথা জাতিগত রূপ—এ সবই চিরন্তন।"

শ্রেণীগত রূপ চিরন্তন—এ অভিমতটি ধর্ম-বিশ্বাসীরাও সমর্থন করে। এখন কথা হলো—শ্রেণীগত রূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, নাকি আল্লাহ্ সেগুলো সৃষ্টি করেছেন ? শ্রেণীগত রূপ আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন,—এ মর্মে ধর্মে-বিশ্বাসীরা কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেনি। তাই অনুমিত হয় যে, এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

কেননা এগুলো চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। দৃঢ় যুক্তি পেশ করা ছাড়া এগুলোকে কোন 'কারণের' ফলশ্রুতি বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সার কথা হলো—মৌল উপাদানের অংগগুলো চিরন্তন এবং তাদের গতিও চিরন্তন। গতির ফলে সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয় এবং তা বিভিন্ন শ্রেণীগত রূপ ধারণ করে। প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তি বিভিন্ন শ্রেণীগত রূপেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। এটাই হলো ধর্মাবলম্বীদের অভিমত।

রবার্ট এঙ্গারসল আমেরিকার একজন বিখ্যাত নাস্তিক। তিনি তাঁর 'আল্লাহ্ অস্বীকার' গ্রন্থে বলেন ঃ

"মনে করুন, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আর কোন শক্তি নেই ; মৌল উপাদান ও শক্তি—এ দু'টি সৃষ্টির আদি থেকেই বিদ্যমান আছে। এখন ভেবে দেখুন, দু'টি অণু যদি পরস্পর মিলিত হয়, তবে কি কোন ফল দাঁড়াবে ? হাঁ দাঁড়াবে বই কি ? যদি সে দু'টি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে সমপরিমাণ শক্তি নিয়ে মুখোমুখি অগ্রসর হয়, তবে উভয়ই একই স্থানে এসে থেমে যাবে এবং এটাই হবে তাদের পরস্পর মিলনের ফল। যদি ব্যাপারটি তাই হয়, তবে বলতে হবে যে, জড় উপাদান শক্তি ও তাদের ফলাফলের পেছনে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আর কোন শক্তি নেই। এ ধরনের কার্যকারণকেই বলা হয়—প্রকৃতির নিয়ম ও মৌল উপাদানের সংযোজন। এখন অনুসিদ্ধান্তে বলা যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম ও উপাদানীয় সংযোজনের পেছনে এমন কোন শক্তি নেই, যা প্রকৃতির চাইতে বেশী শক্তিশালী।"

কেউ হয় তো বলতে পারে,—এটাও ধরে নেয়া যেতে পারে যে, মৌল উপাদান ও তার অঙ্গগুলো চিরন্তন বটে, আবার আল্লাহ্ সৃষ্টও বটে এবং তাদের সংযোজন ও সংমিশ্রণের ফলেই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এটা বলতে যদি কোন সমস্যা না থাকে, তবে এ বিষয়টি মেনে নেয়াই শ্রেয়ঃ এবং এ অভিমতই পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোক মেনে নিয়েছে।

কিন্তু এ ধারণাও ঠিক নয়। কারণ বাস্তব দিক থেকে বিচার করতে গেলে উপরের কথা দু'টি এক নয়। কোন বস্তু সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান লাভ করতে হলে সে বিষয়টিকে অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হবে। বিষয়টি যতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে, ততই তা হবে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। যতই তা অতিন্দ্রিয় হবে, ততই তার নিশ্চয়তা হ্রাস

পাবে। বিষয়টির বিশ্লেষণের পরেও যদি তার সীমারেখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের গণ্ডিতে প্রবেশ না করে, তবে সেই জ্ঞান হবে গোলক ধাঁ ধাঁ। এটা সর্বজনবিদিত যে, মানুষ কেবল সে সব বস্তুকেই বুঝতে পারে, যা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নয়তো তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে উদ্ভূত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম কথাটি অর্থাৎ শুধু মৌল উপাদান ও তার গতিই বিশ্বের চালক—এ অভিমতটি বেশী বিশ্বাস্য। বিশ্বে উপলব্ধি করার মত বস্তু হলো—মৌল উপাদান, গতি ও শক্তি। সারা পৃথিবী মিলেও কোন পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারে না। আবার শূন্যতা থেকেও কোন বস্তুর উদ্ভব হয় না—এ বিষয়টিও মানুষ ইন্দ্রিয় উদ্ভূত জ্ঞান থেকে উপলব্ধি করে। এতেও প্রতীয়মান হয় যে, জড় উপাদান চিরন্তন এবং তার চিরন্তনতা অনেকটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রকৃতির কতগুলো নিয়ম রয়েছে, যেমন পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণ, বিবর্তনবাদ, ব্যক্তিগত রুচি—এসব নীতির অধীনেই বিশ্ব আজ এগিয়ে চলেছে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ধারণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান থেকেও উদ্ভূত নয়। প্রত্যেকটি নশ্বর পদার্থের অস্তিত্ব কারণের উপর নির্ভরশীল। এতটুকু অবশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে কি করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলা যায়? আমরা জানি, উপাদান নশ্বর নয়। গতি ও শক্তি হলো জড়ের অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য। তাই গতি আর শক্তিও নশ্বর নয়। যেহেতু জড়, শক্তি ও গতি চিরন্তন এবং বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ এসব থেকেই উদ্ভূত, সেহেতু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে কি করে জড়জ্ঞান-উদ্ভূত বলা যায়? অধ্যাপক লিট্রা বলেন, 'যেসব কারণে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো স্পষ্টতই বিশ্বে বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। এসব কারণকেই আমরা প্রকৃতির নিয়ম বলে আখ্যায়িত করে থাকি।" আরো একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক বলেন, "প্রকৃতির নিয়ম ও আল্লাহ্—এ দুটোর মধ্যে আমাদের প্রয়োজন কেবল একটির।"

এ চিন্তাধারা হলো সে সব নাস্তিকদের, যারা বলে থাকে: "আমরা আল্লাহর অস্তিত্বের কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না। যদি

অনুমানের উপর নির্ভর করি, তবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের চাইতে অনস্তিত্বের দিকটাকেই অধিকতর প্রবল দেখতে পাই।" কিন্তু নাস্তিকদের মধ্যে অন্য একটি সম্প্রদায়ও রয়েছে, যারা প্রকাশ্যভাবে বলছে যে, সাধারণত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের যে বর্ণনা দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ অবান্তর।

এরা আরো বলে ঃ আল্লাহ্ বলতে যদি আদি কারণকে বুঝায়, তবে আমাদের বলার কিছুই নেই। আর যদি দাবি করা হয় যে, সে সর্বশক্তিমান, জ্ঞানী, সর্বাধিনায়ক, ন্যায়বান ও দয়ালু, তবে এরূপ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে না। বরং এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি পাওয়া যায়। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ

আল্লাহ্-অবিশ্বাসীদের যুক্তি

১. ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যাবতীয় সৃষ্টি নিতান্ত নীচ স্তর হতে উন্নতি লাভ করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যে মানব জাতি সৃষ্টির সেরা, তা ছিল নীচ ধরনের প্রাণী বিশেষ। তা উন্নতি লাভ করে বানরের সীমারেখায় উপনীত হয়। অতঃপর তা ডাঁশের আকার অতিক্রম করে মানুষে পরিণত হয়। তাই কি করে অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর স্রষ্টা সর্ব শক্তিমান ও জ্ঞানবান? রবার্ট এঙ্গবারসল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অস্বীকার করে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ

"মনে করুন, কোন একটি দ্বীপে দশ লক্ষ বছরের একজন লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার কাছে রয়েছে খুব সুন্দর একটি গাড়ী। সে দাবি করেছে যে, এ গাড়ী তার লক্ষ লক্ষ বছরের পরিশ্রমের ফল। এর এক একটি অংশ আবিষ্কার করতে তার পঞ্চাশ হাজার বছর লেগেছে। এতে কি আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, সে ব্যক্তি প্রথম থেকেই কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ ছিল?"

"সৃষ্টিরাজির উন্নতি সাধনে কি একথা বুঝায় না যে, তাদের সংগে সংগে স্রষ্টারও উন্নতি হয়েছে? একজন সৎ, বুদ্ধিমান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যদি মানুষ সৃষ্টি করতো তবে সে কি প্রথম পর্যায়ে তাকে একটি নিতান্ত নিকৃষ্ট প্রাণীরূপে সৃষ্টি করতো, অতঃপর দীর্ঘ ও অনির্দিষ্ট কালের পর আস্তে আস্তে উন্নীত করে মানুষে

পরিণত করতো? সে কি এমন সব আকৃতি-প্রকৃতির সৃষ্টিতে অসংখ্য বছর কাটিয়ে দিতো, যেগুলোকে শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হলো।"

২. দুনিয়াতে ভীষণ জোর-জুলুম, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড ও দুঃখ-কষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় কি করে অনুমান করা যায় যে, বিশ্ব-স্রষ্টা দয়াবান বা ন্যায়পরায়ণ? এঙ্গারসল বলেনঃ "দুনিয়াটকে এমন সব ভয়াল ও হিংস্র জন্তু দিয়ে বোঝাই করার মধ্যে কি কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে? প্রত্যেকটি প্রাণী অপর প্রাণীকে সাবাড় করতে চায়; প্রত্যেকটি মুখ যেন একটি কসাইখানা; প্রত্যেকটি পেট যেন একটি গোরস্তান। এমতাবস্থায় কেউ কি করে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দয়ার কদর করতে পারে? সর্বসাধারণের এ নিত্যকার হানাহানির মধ্যে আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানবত্তার কদর ও তার প্রতি ভালবাসার উদয় কি করে সম্ভব হতে পারে?"

"দীর্ঘস্থায়ী অজ্ঞতার মাঝে মানুষ কি যে কষ্ট ভোগ করছে, তা অকল্পনীয়। এসব কষ্ট বেশী ভোগ করছে দুর্বল, সৎ ও নিরপরাধ লোকেরাই। মহিলাদের সাথে এমন সব ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন হিংস্র প্রাণীর সংগে করা হয়। নিরপরাধ শিশুদেরকে পোকা-মাকড়ের ন্যায় পায়ের তলায় পিষে মারা হয়েছে। দাসত্বের বৈধতার ফতোয়া দিয়ে বহু জাতিকে শত শত বছর ধরে চেপে রাখা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এমন এক জুলুমের রাজত্ব ছিল, যা ভাষা ও কলমে প্রকাশ করা যায় না।"

"কেউ যদি বলে, পরকালে এসব বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে তাদের কষ্টের প্রতিদান দেয়া হবে, তবুও এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। কারণ আমরা কি করে এটা আশা করতে পারি যে, একজন প্রকৃষ্ট, বুদ্ধিমান, সৎ ও শক্তিমান বিচারক আমাদের সংগে বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে অধিকতর ভাল ব্যবহার করবে? তখন কি আল্লাহর শক্তি বেড়ে যাবে? সে কি আরো দয়ালু হয়ে উঠবে? অসহায় সৃষ্টির প্রতি তার মেহেরবানী কি তখন বেড়ে যাবে?"

৩. এটা সর্বজনবিদিত যে, শত শত লোক স্বভাবতই নিতান্ত নিষ্ঠুর, পাষাণ, অসৎ ও কামাসক্ত। সত্যিকার বলতে গেলে, মানব জাতির বেশীর ভাগই খারাপ। এমতাবস্থায় আমরা কি করে ভাবতে পারি যে, একজন বিচারক এ ধরনের মানব জাতির সৃষ্টি

বৈধ মনে করতে পারে? কেয়ামতের দিবসের প্রতিদান বা শাস্তি এ সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কারণ আসল প্রশ্ন হলো—এসব লোক সৃষ্টি করারই-বা কি প্রয়োজন ছিল? সৃষ্টি ক'রে পুনরায় তাদেরকে কেয়ামতের সন্ধিক্ষণে শাস্তি দেয়ার মধ্যে কি মঙ্গল রয়েছে? আল্লাহ্ যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে তাঁর উচিত ছিল পৃথিবীতে কেবল ন্যায় বিচার, সততা ও সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠা করা। প্রতারণা, মিথ্যা, পাপাচার, কলহ, হিংসা, শত্রুতা, প্রতিশোধ ও নিষ্ঠুরতার কি প্রয়োজন ছিল? এসব কাজের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয় যে, কোন স্বাধীন ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বিদ্যমান নেই, বরং রয়েছে শুধু প্রকৃতির নিয়ম এবং তদনুসারেই বিশ্বের শৃঙ্খলা বজায় থাকছে। কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়াই বিশ্বে যা হওয়ার আছে, হয়ে যাচ্ছে।

একজন বিখ্যাত নাস্তিক বলেন: "আমার জ্ঞানানুসারে আমি যতটুকু বুঝতে পারি, প্রকৃতির ভালবাসা বা তার সদিচ্ছা বলতে কিছুই নেই। তা' সব সময় বিভিন্ন বস্তু গড়ে থাকে, আবার তা ভেঙ্গেও দেয়। তার কাছে চিন্তা, হাসি, খুশী, বিষ, খাদ্য, সুখ, দুঃখ, জীবন, মৃত্যু—সবই সমান। সে দয়ালু নয়; সে খোশামোদেও খুশী হয় না; অশ্রু বিসর্জনেও প্রভাবান্বিত হয় না।"

নাস্তিকদের অভিযোগের উত্তর

আমরা এটা অস্বীকার করি না যে, বিশ্ব 'ডেমোক্রাইটাসী অণু' দ্বারা গঠিত। আমরা এটাও সমর্থন করি যে, বিশ্ব চিরন্তন। 'মু'তাযিলা' নামক মুসলমানদের একটি বড় সম্প্রদায় ও মুসলিম হুকামার মধ্যে ফারাবী, ইবনে সিনা আর ইবনে রুশ্দও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। ইবনে রুশ্দ তাঁর 'তালখীসুল মাকাল্' গ্রন্থে বলেন, কুরআন মজীদের আয়াত—"আকাশ-জমিন ছিল বদ্ধ এবং তাঁর (আল্লাহ্র) আরশ ছিল পানির উপর ভাসমান। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করলেন আকাশ পানে, যা ছিল ধূম্রময়"— এতেও এম তবাদের সমর্থন মেলে। আমরা এটাও সমর্থন করি যে, মৌল অণুগুলো গতিশীল। গতি জড় পদার্থের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে এবং তদনুসারেই মৌল অণুগুলো পরস্পর মিলিত হয়, সংযোজিত হয় এবং তাতে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি

হয়। কিন্তু এসব যুক্তি দিয়ে বিশ্বের সমস্যার সমাধান হবে না। কথাটি বিস্তারিতভাবে বলছি ঃ

প্রকৃতির শক্তিরাজি পরস্পর সহায়ক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ

এতে সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের শৃঙ্খলা প্রকৃতির নিয়মসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই নিয়মগুলো স্বতন্ত্র ও পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিহীন নয়। এগুলোর একটির সাথে অপরটির সামঞ্জস্য রয়েছে; একটি অপরটির সহায়তা করে। প্রকৃতির এই নিয়মগুলোর মধ্যে এত সুন্দর পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে যে, একটি ক্ষুদ্রতম বস্তু সৃষ্টির সময়েও এগুলো একযোগে কাজ করে। মাটি, বাতাস, পানি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে সৌর জগতের বড় বড় পদার্থ—যেমন সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির সহযোগিতার ফলেই একটি দুর্বল তৃণের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। মানুষের শরীরে শত শত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্নায়ু রয়েছে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্র এবং সেগুলোর ক্রিয়াও স্বতন্ত্র। কিন্তু এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পরের সহযোগিতা না করলে, অন্তত বিঘ্ন সৃষ্টি থেকে বিরত না থাকলে তাদের পক্ষে কোন কাজই সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তিগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং মানুষের মধ্যে অন্য এমন একটি সাধারণ শক্তি রয়েছে, যা যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে নিহিত শক্তিনিচয়ের উর্ধ্বে এবং যার অধীনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলেমিশে কাজ করে থাকে। এই সাধারণ শক্তিকেই বলা হয় আত্মা বা মেজাজ।

প্রাকৃতিক নিয়মেরও একই অবস্থা। বিশ্বে প্রকৃতির শত শত, বরং হাজার হাজার নিয়ম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটিও যদি পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অপরটি থেকে দূরে সরে থাকে, তবে গোটা বিশ্ব-শৃঙ্খলাই ওলট-পালট হয়ে যাবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতির এসব শক্তিরাজির উপর এমন একটি নিয়ামক শক্তি রয়েছে, যা সকল শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য, সম্বন্ধ ও ঐক্য বিধান করছে। জড়বাদীরা বলেন, জড় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সৃষ্টি হয়; জড় উপাদানের জন্মের সাথেই গতির সৃষ্টি হয়; আবার গতিই সংমিশ্রণ ও সংযোজনের সৃষ্টি করে এবং এমনি করে ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির অজস্র নিয়ম জন্ম লাভ করে। কিন্তু তাঁরা এটা বলতে পারেন না যে,

প্রকৃতির শত শত, হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ নিয়মের মধ্যে এত সুন্দর সামঞ্জস্য আর এই ঐক্য কোথা থেকে এলো? এ সামঞ্জস্য ও ঐক্য প্রাকৃতিক নিয়মের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য নয়। কেউ যদি এমন কথা বলে, তবে তা হবে অনুমান মাত্র। অতীতেও এরূপ কথা কেউ বলেনি। এই সর্বাধিক শক্তি, যা প্রকৃতির সকল শক্তিকে বশীভূত করে রেখেছে এবং যা এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য বিধান করেছে- সেই সত্তাই হলেন আল্লাহ্। কুরআনের আয়াতে এ মর্মকথাই উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আকাশ-জমিনে যা কিছু আছে, খুশীতে হোক, আর না খুশীতেই হোক, সবই তাঁর (আল্লাহ্র) আনুগত্য স্বীকার করে।" এ দিকটি বিবেচনা করেই ইওরোপের বড় বড় জ্ঞানী ও দার্শনিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

মিলন এড্ওয়ার্ড বলেন ঃ স্রষ্টার ভূরি ভূরি জীবন্ত নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক বলছে যে, এ সমস্ত ভবলীলা দৈবক্রমেই ঘটছে। তাদের এ ধারণা কি মানুষের কাছে বিস্ময়কর নয়? অন্য শব্দে বলতে গেলে, তারা বলছে, এসব সৃষ্টিরাজি মৌলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যেরই ফলশ্রুতি। এসব মনগড়া অনুমানকে কোন কোন লোক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান বলেও আখ্যায়িত করছে। সত্যিকার জ্ঞান এসব আনুমানিক ও কাল্পনিক চিন্তা-ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা কখনো এসব কথা বিশ্বাস করতে পারে না!

হার্বার্ট স্পেনসার বলেন ঃ প্রকৃতির এ রহস্যমালা দিনদিনই জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করছে। আমরা যদি সেগুলো নিয়ে ভালরূপে চিন্তা-ভাবনা করি, তবে বুঝতে পারবো যে, মানুষের উপর একটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী শক্তি রয়েছে, যা থেকে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হয়ে থাকে।

অধ্যাপক লিনা বলেন ঃ সেই মহিমান্বিত আল্লাহ্, যিনি চিরন্তন, যিনি সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত, যিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী, তিনি নিজ কারিগরির অদ্ভুত মহিমা নিয়ে আমার সামনে এমনিভাবে উদ্ভাসিত হন যে, আমি বিহ্বল ও হতবাক হয়ে পড়ি।

এখন আমি সেসব অভিযোগ তুলে ধরছি, যা আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তা, দয়া ও ন্যায়নিষ্ঠার বিরুদ্ধে দাঁড় করা হয়ে থাকে। প্রশ্ন করা হয় যে, "আল্লাহ্ যদি সর্বশক্তিমান হতো, তবে পৃথিবীকে ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে কেন সৃষ্টি করলো?"—এটা এমন একটি বাজে প্রশ্ন, যার প্রতি ধ্যান দেয়ার প্রয়োজন নেই।

এক ফোটা পানির মাতৃগর্ভে পতিত হওয়া, তার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করা, তাতে রক্ত-মাংসের আবরণ গড়ে উঠা, বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি হওয়া, প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া, রক্ত থেকে খাদ্য গ্রহণ করা, অতঃপর নূরের প্রতীকে পরিণত হয়ে মানব-অস্তিত্ব লাভ করা—এ পর্যায়ক্রম অধিকতর আশ্চর্যের বিষয়, নাকি এক ধাপে এক চোটে গোটা মানুষের সৃষ্টি হওয়া?

দুনিয়াতে মঙ্গলের সংগে অমঙ্গল কেন সৃষ্টি করা হলো—এ প্রশ্নটি অবশ্য লক্ষ্য করার মত।

বু-আলী সিনা তাঁর 'শিফা' গ্রন্থে এ অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, পৃথিবীর হিতাহিত ক্ষেত্রেতিনটি অবস্থার কল্পনা করা যেতে পারে:

(১) কেবল মঙ্গলই সৃষ্টি করা যেতো (২) কেবল অমঙ্গলই সৃষ্টি করা যেতো (৩) অধিকাংশ মঙ্গল এবং কিছুটা অমঙ্গল সৃষ্টি করা যেতো।

মনে করুন, প্রকৃতির সামনে এই তিনটি বিকল্প পেশ করা হয়েছে। এখন তার কি করা উচিত?

প্রথম বিকল্প যে গ্রহণযোগ্য, তাতে কারো মতানৈক্য থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় বিকল্পটিতেও মতবিরোধের কিছু নেই। কারণ এটা কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতিও তাই করেছে। কেবল তৃতীয় বিকল্পটি সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিত। চিন্তা করা উচিত, প্রকৃতির পক্ষে এমন একটি পৃথিবী সৃষ্টি করা সমীচীন হবে কি-না, যাতে মঙ্গল থাকবে বেশী, আর অমঙ্গল থাকবে কম। এ ধরনের দুনিয়াই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। যদি এ ধরনের দুনিয়া সৃষ্টি করা না হতো, তবে লাভ অবশ্য এতটুকু হতো যে, গুটিকতক অমঙ্গল পৃথিবীতে স্থান লাভ করতো না। কিন্তু এর ফলে এই পৃথিবী হাজার হাজার মঙ্গল থেকে বঞ্চিত থাকতো।

ইবনে রুশ্‌দ্‌ এ অভিযোগের অন্য একটি উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে যে সব অমঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়, তা মূলত অমঙ্গল নয়। বরং সেগুলো মঙ্গলের তাবেদার এবং মঙ্গলের পথে পরিচালক। ক্রোধ একটি খারাপ বস্তু। কিন্তু তা সংবেদনেরই ফল, যার রেসে মানুষ আত্মরক্ষা করে। এ অনুভূতি না হলে মানুষ হত্যাকারীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজের প্রাণ বাঁচাবারও চেষ্টা করতো না। পাপাচার খারাপ বস্তু। কিন্তু এর সম্পর্ক রয়েছে সেই শক্তির সংগে, যার উপর নির্ভর করে মানব জাতির স্থায়িত্ব। আগুন ঘর-দোর পুড়িয়ে ফেলে; শহর ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু আগুন যদি না হতো, তবে মানুষের জীবন যাপন করাই মুশকিল হতো।

এখন শুধু এ সন্দেহ থাকছে যে, কেবল এমন সব বস্তু সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল কি-না, যাতে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গলের কিছুই নেই। ইবনে রুশ্‌দ্‌ বলেন, এরূপ জগত সৃষ্টি করাই সম্ভব ছিল না। এমন কোন আগুন সৃষ্টি করা যায় না, যাতে ইচ্ছা করলে কেবল খাদ্যই পাকানো যাবে; কিন্তু মসজিদ পুড়তে চাইলে তা করা যাবে না।

এখন একটি মাত্র অভিযোগ বাকি রয়েছে। তা হলো—দুনিয়াতে ভাল মানুষেরাই বেশী কষ্ট পায় এবং মন্দ লোকেরা সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করে। এর উত্তরে বলা যায়ঃ মানুষের জীবন এই ধ্বংসনীয় জীবনের ক্রান্তি বিন্দুতেই শেষ নয়। এর পরেও আরো জীবন রয়েছে। তাই কি করে বলা যাবে যে, যাদেরকে আমরা সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করতে দেখছি, সেটাই তাদের পুনর্জীবনের প্রতিচ্ছবি। আমরা মানব জীবনের ক্ষুদ্রতর অংশটাই দেখছি। এ অংশটুকু দেখে আমরা কি করে পুরো জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারি? সামনে আমরা প্রমাণ করে দেখাবো যে, প্রতিদান ও শাস্তি মনুষ্যকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। কর্মের সংগে প্রতিদান ও শাস্তির এমনই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, যেমন মৃত্যুর রয়েছে বিষ ভক্ষণের সাথে এবং তৃষ্ণা নিবারণের রয়েছে পানি পানের সাথে। তাই এটা বলা ঠিক হবে না যে, অনেক লোক ভাল বা মন্দ কাজ করছে। কিন্তু তারা তাদের কর্মফল ভোগ করছে না।

পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যে সকল অমঙ্গল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি, কে বলতে পারে যে, এগুলো সত্যিই ত্রুটি-বিচ্যুতি।

পৃথিবীর পুরো ইতিহাস ও পুরো ছবি আমাদের সামনে নেই বলেই হয়তো এগুলো আমাদের কাছে অমঙ্গল বলে মনে হয়। এমতাবস্থায় কেবল এতটুকু দৃশ্য বস্তুর উপর ভর ক'রে আল্লাহ্‌র মহিমা ও তাঁর শক্তিমত্তাকে কি করে অস্বীকার করা যায়? কুরআন মজীদে আছে—"তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা খুবই কম।"

তওহীদ

প্রত্যেকটি ধর্মই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মোটামুটি স্বীকার করেছে। এ জন্যই ইসলাম এ বিষয়ের উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করেনি। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো—তওহীদ। কেননা অন্যান্য ধর্মে হয়তো তওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদই ছিল না, নয়তো তা পূর্ণাঙ্গ ছিল না। এজন্যই কুরআন মজীদ বারবার ঘোষণা করেছে যে, নাস্তিকেরা তো আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের কথা শুনলেই আঁতকে উঠে। কুরআন মজীদ বলে :

"যদি একক আল্লাহ্‌কে ডাকা হয়, তবে তোমরা তাঁকে অস্বীকার কর। আর যদি অংশীদার জুড়ে দেয়া হয়, তবে তোমরা মেনে নিচ্ছ। যদি একক আল্লাহ্‌র কথা আলোচিত হয়, তবে কেয়ামতের অবিশ্বাসীরা আঁতকে উঠে।"

আসল কথা হলো, যে সব কারণে আমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছি, সে সব কারণে আল্লাহ্‌র একত্ববাদকেও মেনে নিয়েছি। পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, যদিও বাহ্যত সেগুলো সংখ্যায় অনেক এবং সেগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, কিন্তু সবগুলো মিলে একটি সত্তায় পরিণত হয়েছে। অন্য কথায়, বিশ্বের প্রত্যেকটি নিয়ম অন্যটির সংগে এমনিভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, কেবলমাত্র সেই একক সত্তাই (আল্লাহ্) সেগুলো পরিচালনা করতে পারেন, যিনি সেগুলোর স্রষ্টা ও সামঞ্জস্য বিধানকারী। কুরআন মজীদ কথাটা এভাবে বর্ণনা করেছে :

"আসমান-জমিনে যদি একাধিক আল্লাহ্ হতো, তবে বিশ্বের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতো।"

যুক্তিবিদ্যার প্রমাণ-পদ্ধতি অনুসারে যদি এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হয়, তবে নিম্নের সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে :

১. বাহ্যত যদিও পৃথিবীতে হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ পদার্থ দেখা যায়, কিন্তু মূলত পৃথিবী একক বস্তু। এসব পদার্থ হলো তার অংগ। একটি মানুষের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝানো যায়। মানুষের হাত, পা, কান, চোখ, নাক—অনেক অংগই রয়েছে। এ সত্ত্বেও তা একটি পদার্থ মাত্র।

২. একটি বস্তুর অস্তিত্বের জন্য দু'টি পূর্ণাঙ্গ হেতু থাকতে পারে না। কেননা পূর্ণাঙ্গ হেতুর মানে হলো—তা পাওয়া গেলেই কার্যটির অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না। এজন্যই একটি কার্যের জন্য যদি দু'টো পূর্ণাঙ্গ হেতু থাকে, তবে তন্মধ্যে একটি হবে সম্পূর্ণ বৃথা।

৩. আল্লাহ্ হলেন বিশ্বের হেতু বা কারণ।

একত্ববাদের সমর্থনে যুক্তি

একত্ববাদ প্রমাণের সূত্রগুলো হলো এই ঃ বিশ্ব একক বস্তু; একক বস্তুর দু'টি পূর্ণাঙ্গ কারণ হতে পারে না। এজন্য বিশ্বের অস্তিত্বেরও দু'টি পূর্ণাঙ্গ কারণ হতে পারে না। আল্লাহ্ বিশ্বের পূর্ণাঙ্গ কারণ। পূর্ণাঙ্গ কারণ একাধিক হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ও একাধিক হতে পারে না। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মূলত সকল ধর্মই মোটামুটিভাবে তওহীদের শিক্ষা দেয়। যে সব কওমকে 'মুশ্‌রিক' বা অংশীবাদী বলা হয়, তারাও মোটামুটি একক সর্বশক্তিমান সত্তায় বিশ্বাসী। তবে তারা আল্লাহ্‌র অভিব্যক্তি ও গুণাবলীকে একাধিক বলে মনে করে। এটা বাহ্যত শির্‌ক বা অংশীবাদ বলেই মনে হয়। খ্রীস্টানেরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু সংগে সংগে তারা একথাও বলে যে, এই তিনের মধ্যেই এক আল্লাহ্‌র ধারণা রয়েছে। তাদের এই ব্যাখ্যা যতই ভ্রমাত্মক হোক না কেন, এতে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, তারাও অল্লাহ্‌র একাধিকত্ব পছন্দ করে না। এ দিক থেকে বলতে হয় যে, ন্যূনাধিক তওহীদ কোন একটা নতুন বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো—তা তওহীদকে পূর্ণাঙ্গ করেছে এবং অংশীদারিত্বের লেশ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। এটা হলো ইসলামের অনন্য সাধারণ পূর্ণতা সাধন, যার ফলে ইসলামের পর আর কোন ধর্মের প্রয়োজন রয়নি। কেননা পূর্ণতা সাধনের পর উন্নতি বিধানের আর কোন স্তর বাকি

থাকে না। পূর্ণাঙ্গ তওহীদের মানে হলো : যেভাবে আল্লাহ্‌র সত্তার কোন অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর গুণাবলীরও কোন অংশীদার নেই। সৃষ্টি করা, জীবিত রাখা, অদৃশ্যকে জানা, দূর ও নিকটের সাথে সমান সম্পর্ক বজায় রাখা —এসব গুণাবলী আল্লাহ্‌র সত্তাভুক্ত। ইসলামপন্থী ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা অবতার বা পয়গম্বরদেরকেও এসব গুণে গুণান্বিত করেছে, আর এখনো করছে। এটাই হলো তাদের তওহীদের ত্রুটি।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও তাঁর ইবাদতে তওহীদের ধারণা

দুঃখের বিষয়, আজকাল অনেক মুসলমানও বিশেষ পরিভাষার অন্তরালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যদেরকেও এসব গুণে গুণান্বিত করতে আরম্ভ করেছে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র সত্তাগত তওহীদের ন্যায় তাঁর গুণগত ও ইবাদতগত তওহীদকেও আবশ্যক বলে মনে করে। অন্যান্য ধর্মে আল্লাহ্ ছাড়া কোন কোন মানুষকে সম্মানসূচক সেজদা করাও বৈধ ছিল। কিন্তু ইসলাম পূর্ণাঙ্গ তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাও হারাম ঘোষণা করেছে।

সত্যিকার বলতে গেলে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকারের ফলে মানুষের অন্তরে যে নৈতিক প্রভাব পড়ে, তা পূর্ণাঙ্গ তওহীদের বিশ্বাস ছাড়া হয় না। মানুষ যদি মনে করে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ও আশা-ভরসার স্থল, তবেই তার মধ্যে আনুগত্য, বাধ্যতা, নম্রতা, নির্ভরশীলতা, দৃঢ়তা ও অকপটতার মনোভাব জন্মাতে পারে। মানুষের মধ্যে যদি পূর্ণাঙ্গ তওহীদ না থাকে, তবে তার মধ্যে দৃঢ়তা, স্বাধীনতা, নির্ভীকতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার গুণ সৃষ্টি হতে পারে না।

নুবুওয়াত

নুবুওয়াতের স্বরূপ কি? এর শর্ত কি? নবী ও অনবীর মধ্যে পার্থক্য কি—এ সব প্রশ্নের জওয়াব আজকাল মুসলিম সম্প্রদায়গুলোর পক্ষ থেকে সাধারণত এ বলেই দেয়া হয় যে, নুবুওয়াত আল্লাহ্-প্রদত্ত একটি পদ। আল্লাহ্ যাঁকে চান, তাঁকেই তা দান করে থাকেন। নুবুওয়াতের জন্য মুজিযা শর্ত এবং এটাই নুবুওয়াতের

চিহ্ন। যাহিরপন্থী আশ্‌য়ারিগণই সর্বপ্রথম এ ধরনের উত্তর দেন। পরবর্তী সময় এ বিশ্বাস ধীরে ধীরে সকল মুসলিম সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

রসূল করীম ও সাহাবাদের সময় বিশেষ পরিভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার প্রশ্ন উঠেনি। আব্বাসীদের সময় দর্শন যখন ধর্মের গণ্ডিতে প্রবেশ করলো, তখন থেকেই এ বিষয়টি নিয়ে জোরালো আলোচনা আরম্ভ হয়।

জাহিযই সর্বপ্রথম নুবুওয়াতের ব্যাখ্যা দেন

যতটুকু জানি, জাহিযই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধারণ করেন এবং একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং হাদীস-কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী। এ বিষয়ে তিনি কতটুকু লিখেছেন, তা তাঁর গভীর জ্ঞান-পরিসর থেকেই আঁচ করা করা যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ এ বিষয়ে যা লিখে গিয়েছিলেন, সে সব আজ নিশ্চিহ্ন। 'ইসারুল হক' নামক গ্রন্থটি নবম শতকের একজন ইয়ামেনী মুজতাহিদের লেখা। এটি সম্প্রতি মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে এক স্থানে জাহিযের গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। 'শর্‌হে মওয়াকিফ' নামক গ্রন্থে নুবুওয়াত প্রমাণের জন্য যে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন যে, এটা হলো জাহিযেরই অভিমত। ইমাম গাযালীও তাঁর এ মতবাদের প্রশংসা করেন।

আশ্‌আরীদের যে ধ্যান-ধারণা ছিল, তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এ মতবাদের প্রতি বর্তমানে যে সব অভিযোগ আনীত হচ্ছে, আশ্‌আরীদের যুগে এর চাইতেও বেশী অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছিল। এজন্যই ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী, ইবনে রুশ্‌দ, রাগিব ইস্‌ফাহানী ও শাহ ওলী উল্লার ন্যায় ইলমে কালামবিদ্‌গণ আশআরীদের পদচিহ্ন ত্যাগ করে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু আশায়েরা মতবাদ ছিল জনসাধারণের মন-মেজাজমাফিক। তাই সে ধ্যান-ধারণা জনগণের মনে এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ইমাম গাযালী প্রমুখ আশ্‌য়ারীদের সমর্থনে যে কিছুটা কথা বলেছিলেন, তাই আজ ছোট বড় প্রত্যেকটি লোকের অন্তরে অংকিত, সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত। কিন্তু তাঁরা যে সব বিশেষ

ধরনের মতবাদ ব্যক্ত করেন, তা হুজুগের মধ্যে কারো কানে প্রবেশ করেনি। বাধ্য হয়ে তাঁরা জনসাধারণের ভীড় থেকে দূরে সরে একটি বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের যা বলার ছিল, বিশেষ গণ্ডিতে তা ব্যক্ত করেন।

আল্লাহ্‌র শুকর! তাঁদের গোপনীয় মতামতগুলো যদিও প্রসার লাভ করেনি, কিন্তু সেগুলো সম্পূর্ণ মুছেও যায়নি। আমি এ বিষয়টি ফলাও করে লিখবো। এর উদ্দেশ্য হলো নিম্নের কথাগুলো প্রমাণ করা ঃ

১. নুবুওয়াতের হকিকত সম্পর্কে মুজতাহিদ ও বিশেষজ্ঞদের ব্যক্তিগত যে ধ্যান-ধারণা ছিল, তা প্রকাশ করা।

২. নুবওয়াতের হকিকত সম্পর্কে যে সব অভিযোগ আনীত হয়, তা নতুন নয়, বরং পূর্বে আরো বেশী অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছিল।

৩. এসব অভিযোগ কেবল 'প্রকাশ্যবাদী'* সম্প্রদায়কেই স্পর্শ করে। গবেষক ও পণ্ডিতদের মতবাদ এসব হামলার নাগালের বাইরে।

৪. ইলমে কালামের প্রচলিত ও পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থগুলো জনসাধারণের রুচিমাফিক করে রচনা করা হয়। গবেষক ও ইলমে কালামের বিশেষজ্ঞদের মতামত এসব গ্রন্থে হয়তো মোটেই স্থান লাভ করেনি, নয়তো সেগুলো এত দুর্বল পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, সেদিকে কারো নজর আকৃষ্ট হয় না।

এখন আমি আসল বিষয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছি।

নুবুওয়াতের প্রতি অতি স্বাভাবিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত অভিযোগ

আশায়েরার মতে নুবুওয়াতের স্বরূপ

'মওয়াকিফ' নামক গ্রন্থের ভাষ্যানুসারে, আশায়েরা সম্প্রদায় নুবুওয়াতের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং এটাকেই 'মওয়াকিফ'-এর গ্রন্থকার সত্যপন্থীদের অভিমত বলে বর্ণনা করেন ঃ

---

* যাঁরা কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য ভাব ও শব্দার্থ গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'আহলুয্‌যাহির' বা 'প্রকাশ্যবাদী' বলে। (অনুবাদক)

"পয়গাম্বর হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেছেন' "আমি আপনাকে পাঠিয়েছি।" অথবা বলেছেন, "আপনি আমার পক্ষ থেকে লোকদের বাণী পৌছে দিন।" অথবা এ ধরনের অন্য কিছু বলেছেন। পয়গাম্বর হওয়ার জন্য কোন যোগ্যতার শর্ত নেই। আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তাকেই এ বিশেষ রহমত দান করেন।"

এ সংজ্ঞানুসারে, কোন নবীর পরিচয় লাভ করা নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, সাধারণ লোক কি করে বুঝতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তির সংগে আল্লাহ্ কথাবার্তা বলেছেন এবং তাঁকে অমুক-তমুক বাণী প্রদান করেছেন। এজন্যই আশআরীপন্থিগণ মুজিযাকে নবুওয়াতের নিদর্শন বলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি থেকে মুজিযার অভিব্যক্তি ঘটবে, তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করতে হবে যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেছেন। এর জন্য নিম্নকথাগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন ঃ

মুজিযার সংজ্ঞা কি এবং তার শর্তই বা কি?

মুজিযা দিয়ে কি নুবুওয়াত প্রমাণ করা যায়?

মুজিযার সংজ্ঞায় আশায়েরা বলেন, মুজিযা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হলো– নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা। এর জন্য তাঁরা সাতটি শর্ত নির্ধারণ করেন ঃ

(১) মুজিযা হবে মূলত আল্লাহ্রই কর্ম (২) মুজিযা হবে অতি-স্বাভাবিক (৩) কেউ মুজিযার প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হবে না (৪) এমন ব্যক্তি থেকেই মুজিযা আত্মপ্রকাশ করবে, যিনি হবেন নবুওয়াতের দাবিদার। (৫) নবী যেভাবে দাবি করবেন, মুজিযাও হবে ঠিক তেমনি। (৬) কেউ নবীকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করবে না। (৭) নবুওয়াত দাবি করার পুর্বে মুজিযার অভিব্যক্তি ঘটবে না।

নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য অতি স্বাভাবিক ঘটনা প্রদর্শনের যে শর্তটি করা হয়েছে, তার অর্থ কি? যদি তা প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী হয়, তবে প্রশ্ন দাঁড়াবে যে, এমন মুজিযা সংঘটিত হতে পারে কি-না?

মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে, তা দু'প্রকার ঃ স্বতঃসিদ্ধ ও চিন্তা-মূলক। স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আয়ত্তে আসে;

যুক্তি-প্রমাণ ব্যতিরেকেই মানুষ তা' বিশ্বাস করে। যেমনঃ সূর্য দীপ্যমান; আগুন পুড়িয়ে ফেলে; অংশের চেয়ে গোটা বস্তু বড়; দু'টো পরস্পরবিরোধী বস্তু এক স্থানে সন্নিবিষ্ট হতে পারে না—এসব স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

চিন্তামূলক বিষয় হলো—যা চিন্তা-ভাবনা করে হাসিল করা যায়; যেমনঃ বিশ্ব নশ্বর; আল্লাহ্ বিদ্যমান; আত্মা চিরন্তন। চিন্তা-মূলক বিষয় স্বয়ং যদিও স্বতঃসিদ্ধ নয়, কিন্তু তার সীমারেখা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের সীমারেখার সাথে মিলিত।

স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নানা প্রকার। প্রকৃতির নিয়মানুসারে যে সব ঘটনা নিত্য একইভাবে ঘটে থাকে, সেগুলো খতিয়ে দেখার পর যে সার্বিক জ্ঞান অর্জিত হয়, তাও এক ধরনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এসব স্বতঃবিষয়ের মধ্যে বিশ্বের ঘটনাবলীর 'কার্য-কারণ'ও রয়েছে। অন্য কথায়, বিশ্বে যা কিছু ঘটে, তার পেছনে কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। কোন পদার্থের পেছনে অস্তিত্ব লাভ করার কারণ থাকলেই তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তাই মুজিযার সংজ্ঞায় যদি বলা হয় যে, তা 'কার্যকারণ' ছাড়াই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে তার অবান্তরতা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়। কেননা 'কার্য-কারণ' ছাড়া কোন বিষয়ই স্পষ্টত বোঝা যায় না। মুজিযার পেছনে যদি 'কার্য-কারণ' না থাকে, তবে তা হবে স্বতঃসিদ্ধতার পরিপন্থী।

ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে এ প্রশ্নটি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, "জ্ঞান দু'প্রকারঃ স্বতঃস্ফূর্ত ও চিন্তামূলক। চিন্তামূলক জ্ঞান শেষ পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। তাই কোন চিন্তামূলক জ্ঞান যদি স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী হয়, তবে তার মানে হবে—শাখা মূলের পরিপন্থী। আর এটা অবান্তর। এতে বোঝা গেল যে, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের পথে বাধা সৃষ্টি করার অধিকার চিন্তালব্ধ জ্ঞানের নেই।"

"এখন চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারবো যে, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে যে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করে এবং যাতে তার কোন সন্দেহ থাকে না, সেটাকেই বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ বা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান।"

"এসব ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বলতে চাই যে, আমরা যখন কোন মানুষকে দেখতে পাই, তখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে,

এ ব্যক্তি প্রথমে ছিল মাতৃগর্ভে ; অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে শিশুরূপে ভূমিষ্ট হয় ; অতঃপর যুবকে পরিণত হয়। কিন্তু কেউ যদি বলে, ব্যাপারটা তা নয়, বরং সে জন্মগ্রহণ করেই আকস্মিকভাবে যুবকে পরিণত হয়েছে, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে ধারণা করবো যে, এ লোকটি ভুল বলছে। তার কথা ভ্রমাত্মক ও মিথ্যে।"

"এতে প্রতীয়মান হয় যে, অতি-প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর দাবি করা একটি ফালতো বিষয়। এ সঠিক নীতিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে বলছি ঃ

১. কেউ যদি বলে, সাগর ও কূপের পানি সোনালী হওয়া সম্ভব, পাহাড়ের খাঁটি সোনায় পরিণত হওয়া সম্ভব—তবে প্রত্যেকেই তাকে পাগল বলবে।

২. কেউ যদি বলে, আমার ঘরে যে পাথরটি পড়ে রয়েছে, তার দার্শনিক হওয়া এবং সূক্ষ্ম দর্শনে নৈপুণ্য অর্জন করা সম্ভব, ঘরে যত কীট-পতঙ্গ আছে, সবার বিজ্ঞ মানুষে পরিণত হওয়া সম্ভব, আমি ঘরে ফিরে গিয়ে দেখবো যে, আমার গাধাটি টলেমিতে পরিণত হয়েছে এবং সে 'মেজিস্তী' নামক গ্রন্থটি পাঠ করছে, ঘরে যত কীট-পতঙ্গ ছিল, সেগুলো মানুষ হয়ে জ্যামিতি, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যা আলোচনা করছে—তবে কে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে? কারণ এসবই তো সম্ভব? কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ তাকে পুরোমাত্রার পাগলই বলবে।

৩. কেউ যদি হাতের তালু দেখে বলে, এখানে রাজমিস্ত্রী ও সরঞ্জাম ছাড়াই জাঁকালো সৌধ ও মহল নির্মিত হবে, স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে, তবে প্রত্যেকেই তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করবে।

এতে প্রমাণিত হলো যে, মানুষের বিবেক খুব সহজেই এটা বুঝতে পারে যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, সবই প্রকৃতি-নির্ধারিত নিয়মানুসারেই ঘটছে। এর বিরুদ্ধে সন্দেহ করার মানে হলো—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে ছিদ্রের অন্বেষণ করা।"

মোটকথা, অতি স্বাভাবিক ঘটনাবলীকে মু'জিযা বলার মানে হলো—মুজিযার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই কতক শীর্ষস্থানীয় আশায়েরাপন্থী অলৌকিকত্বের শর্তটি মুজিযার

সংজ্ঞা থেকে খারিজ করে দিয়েছেন। 'শরহে মওয়াকিফ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আমাদের মতে, মুজিযার সংজ্ঞা হলো—এর ফলে নবীর দাবির সত্যতা প্রমাণিত হবে, যদিও তা অতিস্বাভাবিক কিছু না হয়।"

আমরা অবশ্য ধরে নিতে পারি যে, অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব এবং মুজিযা এরই অপর নাম। আমরা আরো বলতে পারি যে, কারণ ছাড়াও একটি কার্য অস্তিত্ব লাভ করতে পারে, আবার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন কার্য অস্তিত্ব লাভ করে না। যেমন, যদি বলা হয়, কোন এক বিশেষ পয়গাম্বরকে আগুন দগ্ধ করেনি, তবে এ অবস্থায় তার মানে এই হবে যে, দগ্ধ করার কারণ অর্থাৎ আগুন তো বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তা দগ্ধ করতে পারেনি। যদি বলা হয়, কোন এক বিশেষ পয়গাম্বর পাথরের উপর লাঠি মেরেছিলেন এবং তাতে একটি ঝর্ণারও সৃষ্টি হয়েছিল, তবে তার মানে হবে—ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার কোন কারণই বিদ্যমান ছিল না। তথাপি তা সংঘটিত হয়।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলোতে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়। তা হলো—এটা কি করে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, বস্তুত এসব ঘটনার পেছনে কোন কারণই বিদ্যমান ছিল না। আশায়েরা সম্প্রদায়ের মতবাদ গ্রহণ করলে তো এ সন্দেহ আরো বেড়ে যাবে। আশআরীপন্থিগণ বলেন, জিন ও শয়তান মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করতে পারে। ফলে মানুষ থেকে সে সব অদ্ভুত কার্য সংঘটিত হতে পারে, যা জিন ও শয়তান থেকে সাধারণত উদ্ভূত হয়ে থাকে। এখন মনে করুন, নবুওয়াতের একজন দাবিদার অতি স্বাভাবিক কাজ সম্পন্ন করছে। এমতাবস্থায় এটা কি করে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, এর পেছনে জিনের কোন আমল-দখল অর্থাৎ ভূমিকা নেই।

আশায়েরা আরো স্বীকার করছেন যে, যাদুর বলে যে কোন অতি-প্রাকৃতিক কাজ সংঘটিত হতে পারে, এমনকি মানুষ গাধায় এবং গাধা মানুষে পরিণত হতে পারে। এমতাবস্থায় কিভাবে নিশ্চয় করে বলা যাবে যে, অতিপ্রাকৃতিক কাজ কেবল মুজিযারই চিহ্ন বহন করে; এক্ষেত্রে কি করে বলা যাবে যে, এটা যাদু নয়। 'শরহে মওয়াকিফ' গ্রন্থে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ "যাদু-বলে বড় বড়

অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে না। কোন যাদুকর থেকে যদি অতিস্বাভাবিক কোন মহৎ ঘটনা সংঘটিত হয়, তবে সে নুবুওয়াতের দাবি উত্থাপন করতে সক্ষম হবে না। যদি এরূপ কিছু দাবি করে, তবে আল্লাহ্ তার অতিস্বাভাবিক কার্যাবলী বন্ধ করে দেবেন।”

কিন্তু এ জওয়াব যথেষ্ট নয়। কেননা আশায়েরার মতে, যাদু-বলে মানুষ বাতাসে উড়তে পারে; মানুষ গাধায় এবং গাধা মানুষে পরিণত হতে পারে, জমিন থেকে ঝরনা প্রবাহিত হতে পারে, জড় পদার্থেও গতি সঞ্চারিত হতে পারে। এ সব কি বড় বড় অতি-স্বাভাবিক কার্য নয়? এ ছাড়া আরো বলতে হয় যে, নবীদের সব মুজিযাও বড় অর্থাৎ মহান হয় না। এখন বাকি রইলো—“কোন যাদুকরই বড় রকমের অলৌকিকত্ব নিয়ে নুবুওয়াতের দাবি করতে পারে না।”—এ কথাটি অসার দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। যাদুকর থেকে যদি সাধারণত অতি-স্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে, তবে কোন্ ব্যক্তি এটা স্বীকার করবে যে, নুবুওয়াতের দাবি করার পর তার অনুরূপ কার্য-ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যাবে?

আবদুল্লাহ ইবনুল মুকান্না' ও জোরোয়াস্টার বড় বড় অতি-স্বাভাবিক ঘটনা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁরা নুবুওয়াতেরও দাবি করেছিলেন। তাই এটা কিভাবে নিশ্চয় করে বলা যাবে যে, যে বস্তুটিকে মুজিযা বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তাতে যাদুর লেশমাত্র নেই?

মোটকথা, মুজিযা সম্পর্কে সব ক্ষেত্রে এ সন্দেহ থেকে যায় যে, হয়তো কোন অপ্রকাশ্য কারণের ফলে এই অতিপ্রাকৃতিক কার্যের উৎপত্তি হয়েছে। তাই মুজিযাকে মুজিযা বলা খুবই মুশকিল।

এ প্রশ্ন বাদ দিলেও 'কেউ মুজিযার প্রত্যুত্তর দিতে পারবে না'—এ দাবিটি কি করে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে? 'কেউ এর প্রত্যুত্তর দিতে পারবে না'—এর অর্থ যদি এই হয় যে, মুজিযা প্রদর্শনের সময় অতীতে কেউ এর উত্তর দিতে পারেনি, তবে আবদুল্লাহ ইবনুল মুকান্না' ও জোরোয়াস্টার প্রমুখকে নবী বলে মানতে হবে। কেননা তাঁরা যখন অতিস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা করেছিলেন, তখন

কেউ তাঁদের প্রত্যুত্তর দিতে এবং তাঁদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি। আর যদি এ অর্থ হয় যে, কেয়ামত পর্যন্ত কেউ এর প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হবে না, তবে এ প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কেয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বকালের জন্য এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা কার পক্ষে সম্ভব? হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় তাঁর মুজিযাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি। কিন্তু এ কথা কি করে বলা সম্ভব হবে যে, কেয়ামত পর্যন্ত কেউ এর প্রত্যুত্তরে সক্ষম হবে না?

এ সব মেনে নেয়ার পরেও এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, মুজিযা কি কেবল সে সব লোকের জন্যই নুবুওয়াতের নিদর্শন ছিল, যারা নুবুওয়াতের দাবির সময় বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী বংশধরেরা তো কেবল পরম্পরাগত কথন বা কাহিনী থেকেই তা জানতে পারে। কিন্তু কথা হলো, এসব কথন বা কাহিনীকে নিশ্চিত বলে কিভাবে প্রমাণ করা যাবে? পরম্পরাগত বিবরণের মধ্যে সবচাইতে দৃঢ় ও বিশ্বাস্য হলো 'তওয়াতুর'ভিত্তিক বিবরণ, অর্থাৎ এত অধিক লোক তা বিবৃত করেছে যে, ব্যাপারটি সত্য বলেই মনে হয়। যে খবরটি 'তওয়াতুর' পর্যায়ের, সেটাকে 'নিশ্চিত খবর' বলা যায়। কিন্তু 'তওয়াতুর' পর্যায়ের সব বিবরণ কি নিশ্চিত? 'তওরাতে কোন বিকৃতি সাধিত হয়নি'—ইহুদীদের এ বর্ণনাটিও ছিল 'তওয়াতুর' পর্যায়ের। ইহুদী ও খ্রীস্টানেরা মিলিতভাবে তওয়াতুরভিত্তিক বর্ণনায় বলেন, হযরত ঈসা শূলবিদ্ধ হয়েছিলেন। পার্শীরাও তওয়াতুর পর্যায়ের বর্ণনা দিয়ে জোরোয়াস্টারের মুজিযা প্রমাণ করার প্রয়াস পান।

মোটকথা, প্রত্যেকটি সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে তওয়াতুর সূচকভাবে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন। আমরা কি এ সব ব্যাপারকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করতে পারি? এর উত্তরে হয়তো বলা হবে যে, পরম্পরাগত বিবরণের যথার্থতা বিচারের জন্য ইসলামের শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ কেবল মুসলমানদের তওয়াতুর-ভিত্তিক বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু একরোখা সিদ্ধান্তকে বিরোধীরা মেনে নেবে কেন?

এ সব আলোচনা ছিল মুজিযার অবতারণা ও তার সম্ভাবনা-সম্পর্কিত। এখন মনে করুন, মুজিযা সম্ভব, তা বাস্তবও বটে,

তওয়াতুর ভিত্তিক বর্ণনা দিয়ে তা প্রমাণ করাও সম্ভব। তথাপি এ সমস্যা থেকেই যাচ্ছে যে, এতে কি করে নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণিত হবে?

ধরুন, এক ব্যক্তি বলছেঃ "আমি জ্যামিতিবিদ" এবং যুক্তি-স্বরূপ সে দাবি করছে—"আমি উপর্যুপরি বিশ দিন ভুখা থাকতে পারি।" এক্ষেত্রে বিশ দিন ভুখা থাকলেও এবং ঘটনাটি অতি-স্বাভাবিক হলেও এটা কি করে প্রমাণিত হবে যে, সে ব্যক্তি জ্যামিতি-বিদ। এমনিভাবে এক ব্যক্তি বলছে—"আমি পয়গাম্বর।" এর মানে হলো—এ ব্যক্তি দু'জাহানেরই সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শক। সে নিজ দাবির যথার্থতা প্রমাণে বলছে—"আমি লাঠিকে সাপে পরিণত করতে পারি।" এক্ষেত্রে তার পক্ষে এটা করা সম্ভব হলেও এবং ব্যাপারটি বিস্ময়কর হলেও এতে তার পয়গাম্বরী কি করে সত্য বলে প্রমাণিত হবে? এখানে যুক্তির সাথে দাবির কি সম্পর্ক রয়েছে?

ইমাম রাযীও অভিযোগটির অনুরূপ বর্ণনা দেন। কিন্তু ইবনে রুশ্‌দ্ বিষয়টি আরো ফলাও করে বর্ণনা করেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মুজিযা দিয়ে নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করতে হলে যুক্তির নিম্নলিখিত ভূমিকাগুলো প্রয়োগ করতে হবেঃ

নবী থেকে মুজিযার উৎপত্তি হয়। যে ব্যক্তি থেকে মুজিযার উৎপত্তি হবে, তিনি নবী। এই ভূমিকার প্রমাণীকরণ নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপরঃ

১. মুজিযার উৎপত্তি সম্ভব এবং তা বাস্তব।

২. নুবুওয়াতের দাবিদার থেকেই মুজিযার উদ্ভব হয়েছে।

৩. নুবুওয়াত ও পয়গাম্বরী সত্য ব্যাপার।

৪. যে ব্যক্তি থেকে মুজিযা সংঘটিত হয়, তিনি নবী।

সর্বপ্রথম স্থির করতে হবে যে, মুজিযার স্বরূপ ও তার চিহ্ন কি? এটা স্পষ্ট কথা যে, মুজিযা পয়গাম্বরীর মৌলিক উদ্দেশ্য নয়। যাঁরা মুজিযার সমর্থক, তাঁরাও মুজিযাকে পয়গাম্বরীর চিহ্ন বলেই বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য, চিহ্ন কোন বস্তুর আসল হকিকত হতে পারে না। পয়গাম্বরের হকিকত বর্ণনা করতে গিয়ে আশায়েরা সম্প্রদায় বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্-প্রেরিত, তিনিই পয়গাম্বর।

এখন প্রমাণ করতে হবে যে, 'রিসালত' সত্য বিষয়। আল্লাহ্ তাঁর বিধি-বিধান পেঁাছানোর জন্য বিশেষ মানুষ পাঠিয়ে থাকেন। এই প্রমাণীকরণের কারণ হলো—একটি বড় সম্প্রদায় রিসালতকে সমূলেই মানে না।

এর পর প্রমাণ করতে হবে যে, যে ব্যক্তি থেকে মুজিযা সংঘটিত হয়, তিনি পয়গাম্বর। আশায়েরা এ বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, যদি কোন বাদশাহ কারো কাছে তাঁর দূত পাঠান এবং তার কাছে বাদশাহ কর্তৃক কিছুটা চিহ্নও প্রদত্ত থাকে, তবে নিশ্চিত-ভাবে বলা যাবে যে, এ ব্যক্তি বাদশাহেরই দূত। এমনিভাবে মুজিযা হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি নিশান। যাঁর কাছে এ চিহ্ন থাকে, তিনিই আল্লাহ্‌র দূত ও পয়গাম্বর।

কিন্তু সর্বপ্রথম আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে, কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ বস্তুটি নিশানস্বরূপ দেয়া হয়েছে, তা কি করে জানা যাবে? এর কয়েকটি বিকল্প পথ আছে : (১) হয়তো নিশান প্রদানকারী নিজেই কোন সময় ঘোষণা করবে : আমি কোন দূত পাঠালে তার কাছে অমুক নিশানটি থাকবে। (২) নয়তো দূতের কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। (৩) নয়তো অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিতে হবে যে, এ ব্যক্তি বরাবর অমুক চিহ্ন নিয়েই আগমন করে থাকে। প্রথম বিকল্পটি স্পষ্টতই অবান্তর। কারণ আল্লাহ্ কোন সময় সব লোককে ডেকে বলেন নি : অমুক ব্যক্তি আমার তরফ থেকে প্রেরিত। দ্বিতীয় বিকল্পটিও সম্ভব নয়। কারণ পয়গাম্বরী নিয়েই তো এখানে প্রশ্ন। পয়গাম্বরী প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে পয়গাম্বরীর দাবিদারের কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? এখন হাতে আছে তৃতীয় বিকল্পটি। সেটা ফলপ্রসূ হলেও তা হবে পরবর্তী নবীদের বেলায়। কিন্তু যিনি সর্বপ্রথম নবীরূপে আবির্ভূত হলেন, তাঁর মুজিযা লোকের কাছে কি করে বিশ্বাস্য হবে?

মুজিযাকে পয়গম্বরীর চিহ্নরূপে অভিহিত করার ফলেই এসব অভিযোগের অবতারণা হয়। এ দিকটা এখন বাদ দিচ্ছি। অন্যদিক থেকে নুবুওয়াতের প্রতি যে সব অভিযোগ আনীত হচ্ছে, তা পরক্ষণে বর্ণনা করছি।

নুবুওয়াতের প্রতি স্বাভাবিক ও সাধারণ অভিযোগ ঃ

১. নুবুওয়াতের উদ্দেশ্য হলো—ধর্মীয় বিশ্বাস, ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত বিষয়াদির সংস্কারের শিক্ষা দেওয়া। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, এসব কার্যের জন্য বিবেক-বুদ্ধিই যথেষ্ট ; আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এর জন্য কোন নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজন নেই। এমন অনেক লোক বিগত হয়েছেন, যাঁদের কাছে ওহীও আসতো না, দৈব জ্ঞানও তাঁদের অন্তরে আলোকপাত করতো না। এ সত্ত্বেও তাঁরা উপরোক্ত বিষয়গুলো এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন যে, নবীরাও তাঁদের চাইতে বেশী কিছু করতে পারেন নি। সুতরাং রসূল ও পয়গাম্বরের কি প্রয়োজন রয়েছে ?

২. নবীদের শরীঅত একের পর একটি প্রত্যাহার করা হয়। অর্থাৎ এক পয়গাম্বর অন্য পয়গাম্বরের শরীঅতকে প্রত্যাহৃত বলে ঘোষণা করেন। এখন প্রশ্ন হলো—যে বিধি-বিধান প্রত্যাহৃত বলে ঘোষিত হলো, তা কি শরীঅতের মৌলিক বিষয় ছিল, নাকি আনুষঙ্গিক ও অতিরিক্ত বিষয় ? প্রথম বিকল্পটি হতেই পারে না। কারণ সব ধর্মেই শরীঅতের মৌলিক বিষয় একই হয়ে থাকে। সেগুলোকে বাদ দেয়ার মানে হলো—ধর্মকেই বাদ দেয়া। এখন রইল দ্বিতীয় বিকল্পটি। এটিও হতে পারে না। কারণ যখনই কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হয়, তখন সে নিজ ধর্মের প্রতি লোকের আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে (মৌলিক হোক বা আনুষঙ্গিক) খুব বেশী চাপাচাপি করে। যারা তা সমর্থন করে না, তাদেরকে সে পথভ্রষ্ট, ধর্মহীন ও দোযখীরূপে অভিহিত করতেও ইতস্ততঃ করে না যার ফলে লড়াই পর্যন্ত বেধে যায় এবং ভীষণ রক্তপাতও সংঘটিত হয়। তাই কি করে ভাবা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ প্রেরিত, সে আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্যেও এ ধরনের বিবাদ ও নিষ্ঠুরতাকে বৈধ বলে মনে করতে পারে ?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নামাযের আসল উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করা ও নতি স্বীকার করা। খ্রীস্টান, ইহুদী, পার্সী—যে কোন ধর্মের নামাযেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। সুতরাং বিশেষ কোন ধর্মের নামাযকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করা এবং বাকি সব ধরনের নামাযকে অশুদ্ধ বলে ঘোষণা করা, তদুপরি এ ব্যবধান সৃষ্টির ফলে উদ্ভূত হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতকে বৈধ বলে

পরিগণিত করার কি মানে থাকতে পারে? ধর্মের অন্যান্য কার্যেরও একই দশা। সেগুলো যদি ধর্মের মৌলিক বিষয় হয়, তবে তা সব ধর্মেই সমভাবে থাকবে। আর যা সব ধর্মে সমভাবে নেই, তা কোন ধর্মেরই মৌলিক উদ্দেশ্য হতে পারে না।

৩. ধর্মের আসল উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা, সৎ কাজ সম্পন্ন করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি ধর্মের এ সব বিধানকে কাজে পরিণত করবে, সে-ই নিস্তার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু নবীরা তাদের নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমানের অংগ বলে ঘোষণা করে এবং সেটাকে মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে বলেঃ যে ব্যক্তি পয়গাম্বরকে সমর্থন করে না, সে তওহীদে বিশ্বাস করলেও এবং সৎকাজ সম্পন্ন করা হলেও নিস্তার লাভ করবে না। নবীদের এ নীতি সম্পূর্ণ বিবেক-বিরোধী।

৪. দুনিয়াতে যত ধর্ম আছে, সবটাতেই আপত্তিকর বিষয় দেখা যায়। ইহুদীরা আল্লাহ্‌কে সশরীরীরূপে অভিহিত করে এবং সেসব গুণে তাঁকে গুণান্বিত করে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। খ্রীস্টানেরা আল্লাহ্‌র পিতৃত্ব ও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। তারা একের মধ্যে তিন, আবার তিনের মধ্যে এক আল্লাহ্ প্রমাণ করে। পার্সীদের ধর্মে দুই আল্লাহ্‌র ধারণা রয়েছে। কুরআন মজীদে 'জব্‌র্' ও 'কদ্‌র্' সম্পর্কে অনেক পরস্পর বিরোধী আয়াত রয়েছে।

ইমাম রাযী তাঁর 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে নুবুওয়াতের প্রতি উপস্থাপিত অভিযোগসমূহকে নিম্নলিখিত শব্দে বর্ণনা করেনঃ

"কুরআন 'জব্‌র্' ও 'কদ্‌র্' সংক্রান্ত আয়াতে ভরা। এ সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা হবে ধূলি ও পাথর-কণার চাইতেও বেশী। এগুলো নিঃসন্দেহে পরস্পর-বিরোধী। এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার মানে—ভীষণ পথভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এতে প্রতীয়মান হয় যে এ ধর্মের প্রবক্তা (রসূল করীম) জব্‌র ও কদ্‌রের মধ্যে কোন একটি দিককে নিশ্চিতভাবে অবলম্বন করতে পারছে না।"

অভিযোগকারীদের শেষ বাক্যটি খুবই আপত্তিজনক। এজন্য এর অনুবাদ করার সাহস আমার হয়নি। এ কথাগুলো উদ্ধৃত করার পেছনে আমার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এখানে আমি এটা রাষ্ট্র করে দিতে চাই যে, আমাদের পূর্বসূরিগণ একান্ত নিরপেক্ষ-

ভাবে প্রত্যেক প্রকার ইসলাম-বিরোধী অভিযোগ শুনতেন এবং সেগুলো আপন রচনায়ও উদ্ধৃত করতেন। অতঃপর সেগুলোর উত্তর দিতেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আলেম সমাজ এ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, দুশমনকে আসতে দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলুন।

নুবুওয়াত ও অতিস্বাভাবিক ঘটনাবলীর স্বরূপ

উপরিউক্ত অভিযোগগুলোর উত্তর ইমাম রাযী তাঁর 'মাতলিবে আলিয়া' গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন কাযী আযুদ তাঁর 'মওয়াকিফ' নামক গ্রন্থে। কিন্তু এ উত্তরগুলো এমনি প্রকৃতির, যা অভিযোগসমূহকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। আমি এ গ্রন্থের যে অংশে ইলমে কালামের ইতিহাস বর্ণনা করেছি, সেখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

এখন নুবুওয়াত সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে পেশ করছি। এতে অভিযোগকারীদের অভিযোগেরও নিরসন হবে এবং বিষয়গুলোর স্বরূপও উদ্ভাসিত হবে।

নুবুওয়াত সংক্রান্ত বিষয়গুলো বস্তুত নিম্নলিখিত সূত্রগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

১. অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া কি সম্ভব এবং তা কি বাস্তবে পরিণত হতে পারে?

২. অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া কি নুবুওয়াতের মূলীভূত বিষয়?

৩. এতে কি নুবুওয়াত প্রমাণিত হবে?

৪. নুবুওয়াতের আসল স্বরূপ কি?

অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া কি সম্ভব?

আসল কথা হলো—মানুষ যতই বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে অনবহিত থাকবে, ততই 'কার্য-কারণ' এর উপর তার নজর কম পড়বে এবং সে সরাসরি আল্লাহ্‌কেই প্রত্যেক বস্তুর কারণরূপে অভিহিত করবে।

অতিস্বাভাবিকত্বের ধারণা মানুষের মনে কিভাবে উদিত হয়?

একজন কৃষকের ছেলে বর্ষাকালে যখন মেঘ দেখে, তখন সে বলে, "আল্লাহ্তাআলা আবির্ভূত হয়েছেন।" অর্থাৎ মেঘের আগমন মানে—আল্লাহ্রই আগমন। এ অবস্থা উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে বলে, "আল্লাহ্র আদেশে বৃষ্টি হয়েছে।" এতে দেখা যায় যে, সে আল্লাহ্ ও বৃষ্টির মাঝখানে মেঘকে মাধ্যমরূপে টেনে এনেছে। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, মেঘ সরাসরি আল্লাহ্র আদেশেই সৃষ্টি হয়, নাকি অন্য কোন কারণের মাধ্যমে তিনি তা সৃষ্টি করেছেন? একজন গোঁড়া ধর্মাবলম্বী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, মেঘ ও আল্লাহ্র মাঝখানে কোন কার্য-কারণ নেই। আল্লাহ্র আদেশেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেঘ সৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির আকারে তা বর্ষিত হয়। আবার অপর একজন গোঁড়া ধর্মাবলম্বী হয়তো বলবেন, "আকাশে খুব বড় একটি দরিয়া আছে। সেখান থেকেই পানি পড়ে এবং তা মেঘের আকার ধারণ করে।" পূর্ববর্তী তফসীরকারগণ অনুরূপ মতই পোষণ করতেন।

ইমাম রাযী "তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন" (আল-কুরআন)—এ আয়াতের তফসীরে পূর্ববর্তী তফসীরকারদের সমস্ত মতামত উদ্ধৃত করেন। কিন্তু পরবর্তী চিন্তাবিদগণ আরো এগিয়ে গেছেন। তাঁরা বলেন, মাটি ও সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠে এবং তা শূন্যে পৌঁছে ঠাণ্ডার স্পর্শে জলকণায় পরিণত হয়। মোটকথা, যতই সত্য-অনুসন্ধানের কাজ অগ্রসর হচ্ছে, ততই কারণ-শৃঙ্খল প্রশস্ত হচ্ছে। এই কারণ-শৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতাকেই বলা হয় প্রকৃতি (ফিত্রাত্), আল্লাহ্র রীতিনীতি (সুন্নাতুল্লাহ) বা আল্লাহ্র স্বভাব (খাল্কুল্লা)।

কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে উপরিউক্ত কথাটাই বিধৃত হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্র স্বভাবে কোন পরিবর্তন নেই।"

"আল্লাহ্র রীতিনীতিতে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।"

কেবলমাত্র আশায়েরা সম্প্রদায়ই 'কার্য-কারণে' বিশ্বাসী নন

ইসলামী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র আশায়েরা সম্প্রদায়ই 'কার্য-কারণে' অবিশ্বাসী। তাঁদের মতে, কোন বস্তুই অপর কোন বস্তুর জন্য কারণ হতে পারে না। কোন বস্তুরই বিশেষত্ব বা প্রভাব নেই। ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'আর-রদ্দু আলাল মানতিক' নামক গ্রন্থে আশায়েরা সম্প্রদায়ের দলগত ও ভিন্ন মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে এ বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

আশায়েরা ছাড়া বাকি সব সম্প্রদায়, বরং সারা দুনিয়ার মানুষ কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের সমর্থক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আশায়েরা ছাড়া অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের উচিত ছিল—অতিস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে একবাক্যে অস্বীকার করা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদই দেখছি। ইমাম রাযী 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থে সূরা-এ- আ'রাফ' এর ব্যাখ্যায় হযরত মূসা (আঃ)-এর যষ্ঠি সংক্রান্ত মুজিযার বর্ণনায় বলেন, "আমাদের জেনে রাখা উচিত, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীতে পরিবর্তন সূচিত হয়, এ কথা সমর্থন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত।"

এরপর ইমাম সাহেব এ বিষয়ে তিনটি স্বতন্ত্র অভিমত উদ্ধৃত করেন ঃ

১. আশায়েরার মতে, যে কোন রকমের অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এমনকি অবিভাজ্য পরমাণুর হঠাৎ বিদ্বান ও বুদ্ধিমানে পরিণত হওয়াও সম্ভব। স্পেনে উপবিষ্ট অন্ধের পক্ষেও চীনের কোন গ্রাম দেখতে পাওয়া সম্ভব।

২. পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৩. মু'তাযিলার মতে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা সম্ভব; কিন্তু সর্বত্র সম্ভব নয়।

প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের মধ্যে যে মতানৈক্য রয়েছে, তা শব্দগত, মৌলিক নয়।

প্রকৃত কথা হলো—এ বিষয়ে যত মতভেদ আছে, তা শব্দগত, মৌলিক নয়। 'কারণ' ছাড়া কোন ঘটনা ঘটতে পারে—একথা আশায়েরা ছাড়া আর কেউ সমর্থন করেন না। আর যাঁরা এটা

সমর্থন করেন না, তাঁরা অতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়াকেও সমর্থন করতে পারেন না। এ মতভেদ সৃষ্টির কারণ হলো—যখন কোন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটে, তখন সাধারণ লোকেরা সেটাকে অস্বাভাবিক বলেই অভিহিত করে এবং বলে থাকে ঃ অস্বাভাবিক ঘটনাও ঘটতে পারে। তা না হয় অমুক অমুক ঘটনা কি করে ঘটলো? মূলত সে সব ঘটনা কোন কোন কারণ বশতই ঘটেছে, যদিও সেই কারণগুলো সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়।

ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার সম্ভাবনা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, নভোমণ্ডলের অসাধারণ গতির ফলে অতি-প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তিনি এটা অনুধাবন করতে পারলেন না যে, এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা এসবের পেছনে কারণস্বরূপ নভোস্থলের গতিই বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর এ যুক্তি প্রদর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যে কোন অতিস্বাভাবিক কাজকেই অতিপ্রাকৃতিক বলে গণ্য করেন, যদিও তার পেছনে কোন অসাধারণ কারণ বিদ্যমান থাকে।

প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনাবলী সম্পর্কে আশায়েরার মধ্যে মতদ্বৈধতা

আশায়েরা সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ বিষয়টি নিয়ে মতদ্বৈধতা রয়েছে। সাধারণ আশায়েরা যে কোন প্রকৃতি বিরুদ্ধ ঘটনার সমর্থক ছিলেন। তাঁদের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির হাতেই এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। তাঁরা আরো বলেন, যে ধরনের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনা নবীদের হাতে সংঘটিত হয়, তা কেবল ওলীই নয়, কাফের, ধর্মহীন এবং যাদুকরের হাতেও সংঘটিত হতে পারে। পার্থক্য হলো নামকরণের মধ্যে। কাফের, ধর্মহীন ইত্যাদি থেকে যে অলৌকিকত্ব উদ্ভূত হয়, সেটাকে যাদু ও 'ইস্‌তিদ্‌রাজ' (ক্রমোন্নতি) বলা হয়। আর নবীদের হাতে যা সংঘটিত হয়, তাকে বলা হয় 'ইজায' (অক্ষমকরণ)। কিন্তু ক্রমাগত গবেষণার ফলে আশায়েরাদের এই উদার মতবাদে ভাটা পড়ে। আল্লামা আবু ইসহাক ইস্‌ফারাইনী একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন আশায়েরাপন্থী। তিনি বলেন ঃ কারামত অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর সীমারেখায় পৌঁছতে পারে না।

আবুল কাসেম কুশায়রী আশায়েরাপন্থী একজন বড় সূফী ছিলেন। তিনি বলেনঃ এমন অনেক বস্তু আছে, যাদের রূপায়ণ অবশ্য আল্লাহ্‌র শক্তির কাছে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে, কোন ওলী থেকেও সেগুলো সংঘটিত হয় না।

বু-আলী সিনার অভিমত

বু-আলী সিনা 'ইশারাত্' নামক গ্রন্থের শেষলগ্নে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত করেন এবং তাতে প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "আপনাদের কাছে কেউ যদি বলে, কোন এক দরবেশ অনেক দিন পর্যন্ত আহার করেন নি; অথবা এমন কাজ করেছেন, যা তাঁর সাধারণ শক্তি-বহির্ভূত; অথবা কোন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন; অথবা তাঁর শাপে কোন লোক মাটিতে গেড়ে গেছে; অথবা ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে; অথবা হিংস্র প্রাণী বশীভূত হয়েছে—তবে আপনারা তা অস্বীকার করবেন না। কেননা, হয়তো এগুলোর পেছনে এমন প্রকৃতিগত কারণ রয়েছে, যার ফলে এসব অস্তিত্ব লাভ করেছে। বু-আলী সিনা এ সব প্রকৃতিজাত কারণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আহার না করা সম্পর্কে তিনি বলেন, পাকস্থলি যখন অপাচ্য বস্তুর হজমে ব্যস্ত থাকে, তখন তা ভাল খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। ফলে কয়েকদিনেও মানুষের ক্ষুধা লাগে না। কারণ তখন তার শারীরিক ক্ষয় পূরণের প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র আশেক বান্দাগণ যখন আল্লাহ্‌র স্মরণে বিভোর থাকেন এবং তাঁদের মন-মেজাজ খাদ্য হজমের দিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না, তখন এক খাদ্য দিয়েই তাঁদের অনেক দিন চলে। কেননা ক্ষয় পূরণের জন্য তাঁদের অন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, ভয়ের সময় মোটেও ক্ষুধা লাগে না।

বু-আলী সিনা যদিও এ সব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনার কারণ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি এসব কার্যাবলীকে অলৌকিক বলেই অভিহিত করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, যে বস্তু প্রকৃতির সাধারণ নিয়মবিরোধী, সেটাকেই অস্বাভাবিক বলে আখ্যায়িত করা হয়, যদিও তা প্রকৃতপক্ষে সার্বিকভাবে প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ নয়। শাহ

ওলীউল্লাহ মরহুম এ ব্যাপারে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি 'তাফ্হীমাত-এ-ইলাহিয়া' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"মুজিযা ও কারামত—এসবই কারণউদ্ভূত। কিন্তু এ কার্যগুলো পূর্ণতাপ্রাপ্ত বলেই অন্যান্য কার্য-কারণ উদ্ভূত কাজ থেকে স্বতন্ত্র।"

মোটকথা, আশায়েরা ব্যতীত অন্যসব ইসলামী সম্প্রদায় এ মর্মে একমত যে, প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ কোন বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই আশায়েরা ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায় যদি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোন ঘটনাকে সমর্থন করে, তবে তার মানে হবে—ব্যাপারটি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মবিরোধী; বস্তুত তা সর্বোতভাবে স্বভাববিরুদ্ধ নয়।

কোন্ বস্তু প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, আর কোন্টি নয়—এ নিয়েই মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। কোন বস্তুকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হলে তা কোন্ কোন্ নীতির উপর ভর করে করতে হবে—এ বিষয়ে ভীষণ মতানৈক্য দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিম্নলিখিত নীতিমালার উপর ভর করেই কোন বস্তুকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা যায় ঃ

১. ঘটনাবলী প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের যত কাছাকাছি হবে, ততই তা বিশ্বাসযোগ্য। আর যতই তা সাধারণ নিয়মবিরোধী হবে, ততই তাতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তত্ত্বতল্লাসের প্রয়োজন হবে। মনে করুন, এক ব্যক্তি খুবই সত্যবাদী। তিনি যদি বলেন, অমুক শহরে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তবে তা সত্য বলে গৃহীত হবে। কিন্তু তিনি যদি বারিপাতের স্থলে রক্তপাতের কথা বলেন, তবে তা সত্য বলে বিবেচিত হবে না। তা প্রমাণ করার জন্য জোরালো সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে। মোটকথা, ঘটনার প্রকৃতিভেদে বর্ণনাকারীর বর্ণনার মূল্যও হ্রাস-বৃদ্ধি পায়।

২. কোন ঘটনা সম্ভাব্য হলেই তা বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট নয়।

৩. যে সব ঘটনা সাধারণত ঘটে থাকে, না ঘটার সম্ভাবনা থাকলেও সেগুলোকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

৪. যে সব ঘটনার সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, সেসব বিষয়েও আমরা কিছু না কিছু অভিমত পোষণ করে থাকি। সেগুলোর সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার মধ্যে যে দিকটি বেশী বিশ্বাস্য, সে দিকেই আমরা ঝুঁকে পড়ি।

সাধারণ লোকেরা এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। এটাই মতভেদের কারণ। যেমন, এক ব্যক্তি বললেন, "ইবনুল খাল্লিকান লিখেছেন ঃ অমুক সূফী আগুনে প্রবেশ করেছে; কিন্তু আগুন তাঁকে স্পর্শ করে নি।" এ কথাটা শোনামাত্রই সাধারণ লোক তা বিশ্বাস করে নেবে। কিন্তু একজন বিবেচক ও সূক্ষ্ম বিচারক চিন্তা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, ঘটনাটি সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যেও হতে পারে। কেননা হয়তো ইবনুল খাল্লিকান ভুল করেছেন, নয়তো এ ঘটনার প্রথম বর্ণনাকারী ভ্রমের শিকারে পরিণত হয়েছে, নয়তো মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়াতে পারে নি, নয়তো কেউ ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা বলেছে। ঘটনাটি এমনিতেই অনিশ্চিত। তবুও তা সংঘটিত হওয়ার পক্ষে যদি জোরালো প্রমাণ থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে যে, এ ঘটনায় হয়তো এমন কোন কারণের উদ্ভব হয়েছিল, যার ফলে সূফীর শরীরে আগুন কোন ক্রিয়া করতে পারে নি।

আশায়েরা সম্প্রদায়ের অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়াটি খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়। বিষয়টি হলো—তাঁরা যখন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোন ঘটনা প্রমাণ করতে চান, তখন শুধু এতটুকু প্রমাণ করেন যে, ঘটনাটি সম্ভাব্য। আর এ সম্ভাবনার পরিসরকে তারা যেভাবে অনাহূত সম্প্রসারিত করেন, তাতে এমন সব বস্তুর অস্তিত্বও এ সম্ভাবনার আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে, যা পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত কোন দিন বাস্তবক্ষেত্রে ঘটেনি। অন্যদিকে তাঁরা এটাও ভাবেন না যে, ঘটনাটির অস্তিত্বের জন্য যে ধরনের সম্ভাবনা প্রমাণ করতে চাইছেন, তার চাইতে বর্ণনাকারীর দিক থেকে ভুল করার সম্ভাবনাটাই বেশী। তাই যে দিকটির সম্ভাবনা বেশী, সাধারণ লোক সে দিকটা গ্রহণ করবে না কেন ?

মোটকথা, সাধারণভাবে কেউ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনা অস্বীকার করে না। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে তা কখন ও কতটুকু ঘটতে পারে, সেটাই প্রশ্ন। প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনা যে পরিমাণে প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী, সে তুলনায় তার সংঘটিত হওয়ার পক্ষে যদি অধিকতর জোরালো সাক্ষ্য থাকে, তবে তাকে অস্বীকার করার কি কারণ থাকতে পারে ?

পৃথিবীতে সব যুগে এ ধারণা ছিল, আর বলতে গেলে এখনো সব লোক এ মনোভাব পোষণ করে যে, নবী ও ওলিগণ নিশ্চয়ই কোন না

কোন অতিপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। এ ধারণাটিকে বাড়িয়ে চড়িয়ে এতটুকু বলা হয় যে, নবীদের মধ্যেও ঐশ মহিমা রয়েছে। হিন্দুরা রাম ও কৃষ্ণকে এবং খ্রীস্টানেরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র বাস্তবরূপ বলে বর্ণনা করে। কালপ্রবাহে ও বুদ্ধির প্রসারের ফলে তাদের এ মনোভাব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে এবং অতি-স্বাভাবিক ঘটনার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এজন্যেই রসূল করীম (সঃ) যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত হলেন এবং নুবুওয়াত প্রচার আরম্ভ করলেন, তখন যে সব লোক এ যাবৎ নুবুওয়াতের জন্য অতিস্বাভাবিক কার্যাবলীকে পূর্বশর্ত বলে মনে করতো, তারা বিস্মিত হয়ে বলে উঠলো ঃ

"তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন মুজিযা অবতীর্ণ হলো না কেন ?" (ইউনুস)

"নাস্তিকেরা বলে থাকে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তাঁর কাছে কোন মুজিযা অবতীর্ণ হলো না কেন ?" (রাআদ্)

"তিনি তাঁর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আমাদের কাছে কোন মুজিযা আনছেন না কেন ?" (আল্-আম্বিয়া)

কেউ কেউ বলতো, মুজিযা না হোক, অন্য কিছু স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই থাকতে হবে।

"তারা বলতো, তুমি যদি আমাদের জন্য জমিন থেকে ঝরনা প্রবাহিত করতে না পার, অথবা তোমার কাছে খেজুর ও আঙ্গুরের এমন বাগান না থাকে, যাতে নহর প্রবাহিত করেছ, তবে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না।" (বনি-ইসরাঈল)

ইসলামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় নীতি সংক্রান্ত এমন ত্রুটিবিচ্যুতি নিরসন করা, যা ভুলবশত এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এর আরো উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মকে উন্নতি ও সংস্কারের এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করা, যেন কেয়ামত পর্যন্ত এর উন্নতি ও সংস্কারের আর প্রয়োজন না হয়। ইসলামের আরো লক্ষ্য ছিল তওহীদের পূর্ণতা সাধনের সংগেসংগে নুবুওয়াতের স্বরূপকেও লোকের কাছে তুলে ধরা। এজন্য ইসলাম সর্বপ্রথম সুন্দরভাবে স্বাধীন সুরে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণ করেছে যে, যে সব বস্তু অতি-মানবিক, তা পয়গাম্বরের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"হে পয়গাম্বর! তাদেরকে বলুন: আমি দাবি করছি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌প্রদত্ত সম্পদ রয়েছে বা আমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানি বা আমি ফেরেশতা। আমার কাছে যে ওহী আসে, আমি কেবল তাই অনুসরণ করি।" (আন্‌আম্)

"হে পয়গাম্বর! আপনি লোকদের বলে দিন: আমার ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানও আমার হাতে নেই। আল্লাহ্‌ যা চান, তাই বাস্তবে পরিণত হয়। আমি যদি অদৃশ্য বিষয় জানতাম, তবে আমি আমার ব্যক্তিগত অনেক উপকার সাধন করতে পারতাম। আর আমার ক্ষতিও কেউ সাধন করতে পারতো না। আমার কর্তব্য হলো, মুমিনদের সুসংবাদ দেয়া এবং ভয় প্রদর্শন করা।" (আ'রাফ)

নুবুওয়াত ও মুজিযার বিষয়টি অবশ্য খুবই সূক্ষ্ম এবং জনসাধারণের বিশ্বাসবিরুদ্ধ। কিন্তু শরীয়ত-নিয়ন্তা (রসূল করীম) বিষয়টি এত সুন্দরভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ইসলামের আদি যুগে এ সম্পর্কে কারো মনে ভুল ধারণার উদ্রেক হয় নি। তিনি নুবুওয়াত সম্পর্কে বিশ্বজোড়াও পুরনো যে ভুল ধারণাটির অবসান ঘটান, তা হলো—নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণের জন্য মুজিযা অপরিহার্য।

অবিশ্বাসিগণ নবীজীকে মুজিযা প্রদর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করতো। কারণ তারা মনে করতো যে, নুবুওয়াত মুজিযার উপর নির্ভরশীল। শরীঅত-নিয়ন্তা তাদের এ চিন্তাধারা খণ্ডন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, নুবুওয়াত মুজিযার উপর নির্ভরশীল নয়:

"নাস্তিকেরা বলে যে, তাঁর (রসূল করীমের) কাছে আল্লাহ্‌-প্রদত্ত কোন নিদর্শন (মুজিযা) অবতীর্ণ হয় না কেন? হে মুহম্মদ! আপনি কেবল একজন ভয়-প্রদর্শক। প্রত্যেক কওমের জন্যই একজন পথ-প্রদর্শক হয়ে থাকেন।" (রাআদ্)

"নাস্তিকেরা বলে, তাঁর কাছে আল্লাহ্‌প্রদত্ত মুজিযা এলো না কেন? হে মুহম্মদ! আপনি বলন, মুজিযা তো আল্লাহ্‌র কাছেই থাকে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শক।" (আন্‌কাবূত্)

'সূরা-এ-বানী ইসরাঈল' এর মধ্যে আল্লাহ্‌ বর্ণনা করেন যে, অবিশ্বাসিগণ বলে:

"হে মুহম্মদ! আপনি যদি জমিন থেকে কোন ঝরনা প্রবাহিত করতে পারেন, অথবা খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান প্রস্তুত করতে

পারেন, অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন, অথবা স্বর্ণের ঘর তৈয়ার করতে পারেন, অথবা আকাশে উত্তীর্ণ হতে পারেন, তবেই আপনার প্রতি আমরা বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করতে পারি।”

এসব প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ বলেন :

“হে মুহম্মদ! আপনি বলুন : আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে বলছি যে, আমি তো একজন মানুষ ও পয়গাম্বর বই কিছুই নই।”

এখানে এটা লক্ষণীয় যে, কাফেরগণ নবীজীর কাছে যে সব বস্তু চেয়েছিল, সেগুলো অসম্ভব ও অবান্তর ছিল না। তথাপি আল্লাহ্ সেগুলোর বাস্তবায়ন থেকে বিরত ছিলেন। তাতে এ বিষয়টি দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল যে, যদিও বিষয়গুলো আল্লাহ্র এখ্তিয়ার-ভুক্ত, তথাপি নুবুওয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য সেগুলো রূপায়িত করে দেখানোর মানে হলো—লোকদেরকে সেই পুরনো ভুল ধারণায় প্রলুব্ধ করা। ‘আল্লাহ্তাআলা সেগুলো রূপায়িত করে দেখান নি’—তার মানে এই নয় যে, তিনি সেসব করতে অক্ষম ছিলেন। এক আয়াতে তিনি বলেন :

“কাফেরগণ বলে, মুহম্মদের কাছে আল্লাহ্প্রদত্ত কোন মুজিযা আসেনি কেন? আপনি বলুন, আল্লাহ্ মুজিযা অবতীর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু এ লোকগুলো অজ্ঞ।” (আন্আম্)

ইমাম রাযী ‘সূরা-এ-আন্কাবুত্’ এর আয়াত—“তারা বলে, তাঁর কাছে আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন মুজিযা এলো না কেন?”—এর ব্যাখ্যায় বলেন,

পয়গাম্বরীর জন্য মুজিযা পূর্বশর্ত নয়।

তিনি একটু অগ্রসর হয়ে বলেন,

হযরত শীশ, ইদ্রীস ও শুআইব প্রমুখ নবীদের কাছে কোন মুজিযা অবতীর্ণ হয়েছে বলে জানা যায় নি।

শাহ ওলী উল্লাহ সাহেব ‘হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ্’ নামক গ্রন্থে বলেন :

নুবুওয়াতের স্বরূপের সংগে মুজিযা, দোআ কবুল হওয়া এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু অধিকাংশ সময় এগুলো নুবুওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা যায়।

ইমাম গাযালী 'মুন্‌কিয্ মিনাদ্ দালাল' গ্রন্থে নুবুওয়াত সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত করেন। এতে তিনি নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন, নবী করীমের পথ প্রদর্শন ও উপদেশ প্রদানের ফলেই নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হয়।

এরপর তিনি বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের মনোভাব লক্ষ্য করে বলেন :

আপনি এভাবেই নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন; লাঠি সর্পে পরিণত হয়েছে বা চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে—এসবের উপর ভিত্তি করে নয়।

'নুবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি হলো নবীর মুজিযা প্রদর্শন'—এটা শুধু প্রকাশ্যবাদী আশায়েরাপন্থীদেরই অভিমত। কিন্তু তাঁরা এ দাবি করছেন না যে, নুবুওয়াত প্রমাণের জন্য বুদ্ধিজাত যুক্তি হলো মুজিযা। বরং তাঁদের বক্তব্য হলো—মুজিযা সংঘটিত হওয়ার সময় লোকেরা সাধারণত নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেয়; এটা মানুষের স্বভাব, বুদ্ধিপ্রসূত ব্যাপার নয়।

'শর্‌হে মওয়াকিফ্' রচয়িতা বলেন,

এই উপলব্ধি কেবল বুদ্ধিজাত নয়, বরং স্বভাবজাত। 'মওয়াকিফ্' রচয়িতা তাঁর নিজ ভাষায় বলেন, "আমাদের (আশায়েরাপন্থীদের) কাছে এই উপলব্ধির ভিত্তি হলো—মুজিযা সংঘটিত হওয়া মাত্রই আল্লাহ্ লোকের মনে মুজিযা-অধিকারীর সত্যতা অংকিত করে দেন —এটাই আল্লাহ্‌র চিরাচরিত নিয়ম।"

এ দাবিও সার্বিকভাবে স্বীকার করা যায় না। কেননা এতে নবীর হেদায়ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এটা প্রকাশ্যে দেখা গেছে যে, মুজিযা সংঘটিত হওয়ার সময়ও হাজার হাজার লোক ঈমান গ্রহণ করেনি। বরং মুমিনের সংখ্যার চাইতে অমুমিনের সংখ্যাই ছিল সব সময় বেশী। এজন্যই এ বিষয়ের ইমাম ও বিশেষজ্ঞগণ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মুজিযা যথেষ্ট নয়।

ইমাম গাযালী 'মুন্‌কিয্‌ মিনাদ্‌ দালাল্‌' গ্রন্থে নুবুওয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ

আপনি এভাবেই নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু লাঠি সর্পে পরিণত হয়েছে বা চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে— এ সবের উপর নির্ভর করে নয়।

রাগিব ইস্‌ফাহানী বলেন ঃ

দুই ধরনের লোক মুজিযা অনুসন্ধান করে ঃ (১) যারা আল্লাহ্‌র বাণী ও মানুষের বাণীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। (২) আর যারা তদুপরি গোঁড়ামিও করে।

নুবুওয়াতের স্বরূপ

আশায়েরার মতানুসারে নুবুওয়াতের স্বরূপ, এর নীতি ও শর্ত কি – এ সব পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম গাযালী এবং রাযীও তাঁদের সাধারণ রচনাবলীতে আশায়েরা সম্প্রদায়ের মতানুসারেই এ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ রচনায় তাঁরা নিজেদের গবেষণালব্ধ প্রকৃত মতামতও ব্যক্ত করেন। তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, আশায়েরা-পদ্ধতি অপর্যাপ্ত ও জটিল। ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে বলেন ঃ

নুবুওয়াত সমর্থকদের মধ্যে দু'টি শ্রেণী দেখা যায়। এক শ্রেণী বলেন, মু'জিযার আবির্ভাব নুবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ। এটা ধর্ম সম্বন্ধীয় পুরনো ধ্যান-ধারণা। দুনিয়ার সাধারণ ধর্মাবলম্বীরা এ মতই পোষণ করে থাকে।

নুবুওয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বলেন, প্রথমে এটা স্থির করতে হবে যে, যথার্থ ধর্মীয় বিশ্বাস ও সৎ কাজ বলতে কি বোঝায়? এ বিষয়টি স্থিরীকৃত হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি লোকদের সত্য ধর্মের দিকে আহবান করছেন এবং তাঁর বাণীতেও বিরাট প্রভাব রয়েছে, তখন আমরা বুঝে নেবো যে, তিনি সত্যি পয়গাম্বর এবং তাঁর অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। এ মতবাদই বুদ্ধিবাদের বেশী নিকটবর্তী। এ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক খুব কমই হতে পারে।

ইমাম রাযী দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদকেই বেশী পছন্দ করতেন

এরপর ইমাম রাযী দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদকে খুব বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ও

সংযোজিত করেন। তাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, কুরআন মজীদেও দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ

কুরআন মজীদে বোঝা যায় যে, নুবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদই পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট। তিনি আরো বলেন, মুজিযা দিয়ে নুবুওয়াত প্রমাণ করার চাইতে দ্বিতীয় পন্থায় প্রমাণিত করাই জোরালো যুক্তির পরিচায়ক।

"হে মানবগণ! তোমাদের কাছে আল্লাহ্-প্রদত্ত উপদেশ ও তোমাদের অন্তরের পরিশোধন ব্যবস্থা এসে গেছে।" (ইউনুস)—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী খুব সংক্ষেপে দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিমত বর্ণনা করেন এবং বলেন, নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠার জন্য এ নীতিই পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ।

কেবল ইমাম রাযীই নন, ইমাম গাযালী, ইবনে হায্ম্, ইবনে রুশ্দ্ আর শাহ্ ওলীউল্লাহ্ও নুবুওয়াতের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করেন। আমি তাঁদের ভাষ্য উদ্ধৃত করছি, তা হলে যেন নুবুওয়াতের পুরো রূপরেখা পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং এ বিষয়টিও পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, ইলমে কালামের প্রচলিত গ্রন্থসমূহে যে সব মতামত ও মতবাদ রয়েছে, তা হলো কেবল প্রকাশ্যবাদী আশায়েরা সম্প্রদায় উদ্ভাবিত। ইমাম রাযীর 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থের সেই অংশটি হুবহু এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এখানে শুধু সার কথাটাই লিখছি। তিনি নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনার পূর্বে কয়েকটি ভূমিকা পেশ করেন। সেগুলো হলো এই ঃ

ইমাম রাযীর মতে নুবুওয়াতের স্বরূপ

১. মানুষের মৌলিক পরিপক্কতা হলো—পদার্থের স্বরূপ ও তার মঙ্গলামঙ্গল উপলব্ধি করা। আরো পরিষ্কার ভাষায়, মানুষকে দু'প্রকারের শক্তি প্রদান করা হয়েছে ঃ চিন্তামূলক ও কার্যমূলক। চিন্তামূলক শক্তির কার্য হলো—বস্তুসমূহের হকিকত উপলব্ধি করা। এর পূর্ণতা সাধন হলো—বস্তুর হকিকত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা অর্থাৎ বস্তুর আসল রূপ হৃদয়ঙ্গম করা। কার্যমূলক শক্তির মানে হলো—কোন্ কাজ করণীয়, আর কোন্টা বর্জনীয়, তা নিরূপণ করা। এর পূর্ণতা সাধন হলো—মানুষের মধ্যে এমন শক্তি সৃষ্টি হওয়া, যার ফলে তার নিকট থেকে কেবল ভাল কাজই সম্পন্ন হবে।

২. এ দুই শক্তির নিরিখে মানব শ্রেণীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) যারা এসব গুণাবলীতে অপরিপক্ক।

(খ) যারা স্বয়ং পরিপক্ক। কিন্তু অপরিপক্কদের পূর্ণতা সাধনে অক্ষম।

গ) যারা স্বয়ং পরিপক্ক এবং অপরিপক্কদেরকেও পরিপক্ক করে তুলতে সক্ষম।

৩. পূর্ণতা ও অপূর্ণতার মাঝখানে অনেক স্তর রয়েছে। অপূর্ণতার এমনও স্তর রয়েছে, যেখানে পেঁছিলে মানুষ ও জীব-জন্তুর মধ্যে কেবল আকারের দিক থেকেই পার্থক্য থেকে যায়। এমনিভাবে পূর্ণতারও এমন একটি স্তর রয়েছে, যেখানে উত্তীর্ণ হলে মানুষ ফেরেশতায় পরিণত হয়। এই দুইটি স্তরের মাঝখানে হাজার হাজার স্তর রয়েছে। যদি হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থা নিয়েও তুলনা করা যায়, তবু দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি মানুষ গুণগত-ভাবে অন্য মানুষ থেকে স্বতন্ত্র।

উপরিউক্ত শক্তি দুইটির পূর্ণতা ও অপূর্ণতা—উভয়েরই চরম স্তর রয়েছে। তাই প্রত্যেক যুগেই এমন লোক পাওয়া যায়, যিনি পূর্ণতার চরম শিখরে উত্তীর্ণ। যে ব্যক্তি চিন্তামূলক ও কার্যমূলক উভয় দিক থেকে শীর্ষ পর্যায়ে পেঁছিতে সক্ষম এবং অপরকেও পূর্ণতার স্তরে পেঁছাতে সক্ষম, তিনিই নবী ও পয়গাম্বর।

ইমাম রাযীর মতে, চিন্তামূলক ও কার্যমূলক—উভয় শক্তির দিক থেকে পূর্ণতা অর্জনের নামই নুবুওয়াত। এতে মুজিযা, অলৌকিকত্ব ইত্যাদির আমল-দখল অর্থাৎ শর্ত নেই। এ বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ্ কাফেরদের দাবি উদ্ধৃত করে যা বলেছেন, তাতেও আমাদের উপরিউক্ত দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কাফেরদের বক্তব্য ছিল এই ঃ "হে মুহম্মদ! আপনি যদি মাটি থেকে আমাদের জন্য ঝরনা প্রবাহিত করতে না পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করবো না।"—এর উত্তরে আল্লাহ্ বললেন, 'হে মুহম্মদ! আপনি বলে দিন, আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি তো একজন মানুষ ও পয়গাম্বর

বই কিছু নই।" অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পয়গাম্বর হওয়ার জন্য কেবল শর্ত হলো এই যে, তিনি চিন্তামূলক ও কার্যমূলক—উভয় শক্তিতে পরিপক্ক হবেন এবং অপরিপক্কদেরকেও শক্তিদ্বয়ে পরিপক্ক করে তুলতে সক্ষম হবেন। এই শর্তের আলোকে এটা প্রতীয়মান হয় না যে, কাফেরগণ নবী করীমের কাছে যে বস্তু (মুজিযা) চেয়েছিল, সে কার্যেও তাঁকে সক্ষম হতে হবে।"

শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র মতে নুবুওয়াতের স্বরূপ

শাহ ওলীউল্লাহ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে চরম সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনা করেন। আমি নিজ ভাষায় ও নিজ বর্ণনাভঙ্গিতে তাঁর ভাবধারার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আমি এ বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কিছুই সংযোজিত করিনি:

"মানুষের উপর আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান আরোপিত হওয়া, দীন-ধর্মের প্রয়োজন অনুভূত হওয়া—এসবই স্বাভাবিক বস্তু। এ সব বুঝতে হলে প্রাকৃতিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত।"

"সর্বাগ্রে উদ্ভিদ সম্পর্কে চিন্তা করুন! বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! তাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রেণী রয়েছে। প্রত্যেক প্রকার বৃক্ষের শাখা, পাতা, ফল, ফুল, গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ—সবই ভিন্ন ধরনের। এ বিভিন্নতা তাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যেরই ফল। আরো পরিষ্কার ভাষায়, প্রত্যেক বৃক্ষের যত বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো শ্রেণীগত আকৃতিরই সৃষ্টি। তাই আঙ্গুরকে মিষ্ট, রসালো ও সূক্ষ্ম আবরণ বিশিষ্ট করে কেন সৃষ্টি করা হলো, এরূপ প্রশ্ন করার কোন মানে থাকতে পারে না। কেননা এরূপ প্রশ্ন করার মানে হবে একথা বলা—আঙ্গুরকে আঙ্গুর করা হলো কেন? মিষ্ট, রসালো ও সূক্ষ্ম আবরণ বিশিষ্ট হওয়া—এগুলো আঙ্গুরের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য।"

"এখন জীবজন্তুর প্রতি দেখুন। উদ্ভিদের ন্যায় এদেরও প্রত্যেকের আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু এদের মধ্যে উদ্ভিদের চাইতে কিছুটা বস্তু বেশী আছে। তা হলো স্বাধীন মতি-গতি ও প্রাকৃতিক অভিজ্ঞান। প্রত্যেক প্রাণীকে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে সে প্রাণী জগতের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। এ অভিজ্ঞানই তার প্রয়োজন মেটায় এবং তাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। প্রত্যেক প্রকার জীবের প্রতিপালন এবং জীবন ধারণের জন্য তার

স্বভাব অনুসারে স্বতন্ত্র সাজ-সরঞ্জামের বন্দোবস্ত রয়েছে। উদ্ভিদ অনুভূতিশীল ও স্বাধীন গতির অধিকারী নয় বলেই তার মধ্যে রন্ধ্র ও স্নায়ু সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো পানি, বাতাস ও মাটির কোমল অংশ শোষণ করে এবং তা সমস্ত শাখা-প্রশাখা ও পাতায় সঞ্চারিত করে। জীব-জন্তুকে অনুভূতিশীল ও স্বাধীন মতিগতিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তাকে এমন প্রাকৃতিক অভিজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, যাতে সে স্বয়ং ও স্বেচ্ছায় চলাফেরা করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। প্রত্যেক প্রকার জীব-জন্তুর পানাহারের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। চতুষ্পদ জন্তু ঘাস খায়; হিংস্র প্রাণী মাংস ভক্ষণ করে; পাখী উড়ে; মাছ সাঁতার কাটে—এসব পার্থক্য তাদের শ্রেণীগত বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিরই ফল। এই শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক প্রকার প্রাণীকে তার প্রয়োজন মোতাবেক বিশেষ ধরনের উপলব্ধি ও জ্ঞান প্রদান করে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এই উপলব্ধি ও জ্ঞান প্রকৃতিরই দেওয়া; এর সাথে অর্জন ও আহরণের কোন সম্পর্ক নেই। বরং এগুলো সাথে নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করে। এই বিশেষত্বই মানুষকে জীব-জন্তু থেকে পৃথক করে দেয়। প্রকৃতিগত ধ্যান-ধারণা ছাড়াও মানুষকে অন্য এক প্রকার অনুভূতি শক্তি দেওয়া হয়েছে। সেটা অর্জনীয় ও চিন্তাপ্রসূত। এ শক্তি অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা ও বিভিন্ন সূত্রের সংযোজনের ফলেই জন্মলাভ করে। এই অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই মানুষ ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প—সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে। এই শক্তিই বিভিন্ন রূপ ধারণ ক'রে কাউকে বাদশায়, কাউকে সেনানায়কে, কাউকে দার্শনিকে, আবার কাউকে শিল্পপতিতে পরিণত করে।

এ সব জ্ঞান ও উপলব্ধি-শক্তি মানুষের শারীরিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া মানুষকে অন্য এক প্রকার শক্তিও প্রদান করা হয়েছে। সেটা হলো আত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং এটাকেই বলা হয় ঐশ শক্তি। এ ক্ষমতার বলেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। সে খতিয়ে দেখে যে, এ বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কি করে প্রতিষ্ঠিত হলো? কে আমাকে সৃষ্টি করলো? কে আমাকে খাবার দেয়? এসব প্রশ্নের জওয়াবে সে এক মহাশক্তিকে স্বীকার করে নেয়; তার সামনে মাথা নত করে দেয় এবং সমস্ত প্রকার

সৌজন্য প্রদর্শন করে। অন্যদিকে বৃক্ষ, পাথর, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, জমিন, আকাশ—এ সমস্ত সৃষ্টিও সেই মহাপ্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং তাঁর সামনে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"তোমরা কি দেখছ না যে, আকাশ-জমিনের সবকিছু—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বৃক্ষ, চতুষ্পদ জন্তু—সবই আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করে ?"

"কিন্তু পার্থক্য হলো এই যে, অন্যান্য সৃষ্টি কেবল ভাব-ভঙ্গিতে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাঁর সামনে বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু মনুষ্যজাতি কেবল ভাব-ভঙ্গিতেই নয়, ভাষা দিয়েও আনুগত্যের মনোভাব প্রকাশ করে। সে তার আত্মিক শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। আরো পরিষ্কার কথায়, মানুষ যখন কোন ভাল বা মন্দ কাজ করে, তখন তার মনেও সে প্রভাব প্রতিফলিত হয়। কাজটি যদি ভাল হয়, তবে তার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। আর যদি কাজটি মন্দ হয়, তবে সংকোচের সৃষ্টি হয়। জীব-জন্তুর মধ্যে এ অনুভূতি মোটেও দেখা যায় না।"

"মোটকথা, এই আত্মিক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও কার্যাবলীর ভাল-মন্দ নিরূপণ করা হয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এ ক্ষমতা সকল মানুষের মধ্যে সমান হয় না। মানুষের আধ্যাত্মিক পূর্ণতা সাধনের জন্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণের উদ্দেশ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান রচনা করা প্রয়োজন। এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা বহুদিন পর পর এমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করেন, যিনি ঐশ বাণী গ্রহণের যোগ্যতা রাখেন। এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে থাকেন। তিনি আল্লাহ্‌র খাস রহমতের ছত্রছায়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রতিপালিত হন। তাঁকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে শরীয়ত দান করা হয় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য লোকদের প্রতি ঐশ আদেশ দেওয়া হয়। এ দিক থেকে যা কিছু হয়, সবই সংঘটিত হয় মানুষের প্রকৃতি ও শ্রেণীগত চাহিদা অনুসারে।"

শাহ সাহেব আরো বলেন ঃ

"কেউ যদি বলে, মানুষের জন্য নামায পড়া, পয়গাম্বরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, ব্যভিচার ও চুরি থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি

ফরয করা হলো কেন? তার উত্তরে বলতে হবে যে, এটা এমনি ধরনের ব্যাপার, যেমন তৃণভোজীদের জন্য ঘাস খাওয়া ও গোশ্‌ত্‌ না খাওয়া এবং মধু মক্ষিকার জন্য তাদের দলপতির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা অপরিহার্য। পার্থক্য হলো—জীব-জন্তুর মধ্যে যে অভিজ্ঞান রয়েছে, তা প্রকৃতি প্রদত্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান হলো অর্জিত ও চিন্তাপ্রসূত, ওহী ও অনুকরণ উদ্ভূত। তবে এ সব জ্ঞান থাকা উভয় শ্রেণীর জন্যেই আবশ্যক ও অপরিহার্য।

নুবুওয়্যাত সম্পর্কে ইমাম গাযালীর অভিমত

ইমাম গাযালী তাঁর 'মাআরিজুল কুদ্‌স' গ্রন্থে নুবুওয়াতের স্বরূপ সবচাইতে অধিক ফলাও করে বর্ণনা করেন। এখানে সেগুলো হুবহু উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তাই আমি বিষয়টিকে গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করেছি। এখানে তিনি 'আল্‌-মুনকিয্‌ মিনাদ্‌ দালাল' ও 'এহ্‌ইয়াউল্‌ উলূম' গ্রন্থে যা লিখেছেন, তার সারমর্ম পেশ করছি। ইমাম গাযালী বলেন ঃ

মানুষ স্বভাবত অজ্ঞরূপেই জন্মগ্রহণ করে। জন্ম হওয়ার সময় সে সৃষ্টি সম্পর্কে কিছুই জানে না। সর্বপ্রথম তার মধ্যে সৃষ্টি হয় স্পর্শন-ক্ষমতা, যার ফলে সে স্পৃশ্য বস্তুসমূহের উত্তাপ, শীতলতা, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, কোমলতা, কাঠিন্য এসব অনুভব করে। এই স্পর্শনের সঙ্গে দর্শন ও শ্রবণের কোন সম্পর্ক নেই। যে বস্তু কেবল শ্রবণীয়, সেখানে স্পর্শন ক্ষমতার কোন স্থান নেই। স্পর্শনের পর মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় দর্শন। এ শক্তির দরুন সে বর্ণ ও পরিমাণ উপলব্ধি করে। অতঃপর সৃষ্টি হয় শ্রবণ ও আস্বাদন শক্তি। এভাবে ক্রমাগত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সীমারেখা অতিক্রান্ত হয় এবং শুরু হয় অন্য একটি নতুন পর্যায়। এই স্তরে মানুষের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞানের উদয় হয় এবং সে এমন সব বস্তুও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, যা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে। এ নতুন ধাপের সূচনা হয় সাত বছর বয়সে। এরপর আসে বুদ্ধির পালা। এর বদৌলতে মানুষ বাস্তব, অবাস্তব, বৈধ, অবৈধ ইত্যাদি অনুধাবন করে। এর পরেও একটি স্তর আছে যা বুদ্ধির গণ্ডি থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। বুদ্ধির মঞ্জিলে বাহ্য ইন্দ্রিয় যেমন অকেজো, তেমনি এ মঞ্জিলে বুদ্ধিও কোন কাজে আসে না। এ স্তরের নাম হলো নুবুওয়াত।

কোন কোন বুদ্ধিবাদী এ স্তরকে অস্বীকার করেন। এটা হলো এমনি ধরনের অস্বীকারোক্তি, যেমন কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তার গুণে গুণান্বিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বুদ্ধিজাত বস্তুসমূহকে অস্বীকার করে থাকে।

'আল্-মুন্কিয্ মিনাদ্-দালাল্' গ্রন্থে ইমাম গাযালী বলেন ঃ

"নুবুওয়াত সমর্থন করার মানে হলো—এমন একটি স্তরকে সমর্থন করা, যা বুদ্ধি স্তরের ঊর্ধ্বে, যেখানে পৌঁছলে মানুষের অন্তর চক্ষু বিকশিত হয় এবং সে এমন সব বস্তুও উপলব্ধি করতে পারে, যা বুদ্ধি কখনো পারে না। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি এমনি অপারগ, যেমন বর্ণ উপলব্ধির বেলায় শ্রবণ শক্তি অকেজো।"

সুতরাং নুবুওয়াতকে সত্যিকারভাবে স্বীকার করতে পারেন সেই ব্যক্তি, যিনি স্বয়ং নুবুওয়াতের মর্যাদা অর্জন করেছেন, অথবা যিনি আত্মাকে শোধন করে নিয়েছেন, অথবা যিনি আধ্যাত্মিক সাধনার বলে ঐশ অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হয়েছেন। ইমাম গাযালী 'মুন্কিয্ মিনাদ্-দালাল' গ্রন্থে নিজ অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ

"সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে ব্যক্তি সূফীবাদের স্বাদ গ্রহণ করে নি, সে নুবুওয়াতের স্বরূপ অনুধাবনে অক্ষম। সে কেবল নুবুওয়াতের শব্দটাই জানতে পারে, এছাড়া আর কিছু নয়।"

এরপর তিনি বলেন ঃ

"সূফী পদ্ধতির অনুশীলনের ফলে আমি নুবুওয়াতের হকিকত ও তার বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করেছি।"

নুবুওয়াত প্রমাণের আরো একটি উপায়

ইমাম গাযালী আরো একটি উপায় অবলম্বনে নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মানবিক গুণাবলী সকল মানুষের মধ্যে এক সমান থাকে না—এটা একটি সর্বসম্মত ব্যাপার। মানুষের মধ্যে যে মেধাশক্তি, ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, তা বিভিন্ন পরিমাণে হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি মেধাবী হলে অন্য ব্যক্তিকে অধিকতর মেধাবী হতে দেখা যায়। তৃতীয় ব্যক্তিকে আরো বেশী মেধাবী দেখা যায়। এ মেধা ও বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম ক'রে এমন এক স্তরে এসে উপনীত হয়, যখন মানুষ এমন কাজও সম্পন্ন করতে পারে, যা বাহ্যত মানবিক ক্ষমতার ঊর্ধ্বে বলেই মনে হয়।

যাঁরা কবিত্বে, বক্তৃতায়, শিল্পে বা আবিষ্কার ক্ষেত্রে জগতে অতুলনীয় ছিলেন, তাঁদের ব্যাপারটাও এমনি ধরনের। এমন উৎকর্ষ সাধিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার এবং প্রকৃতিরই দান। এ ক্ষমতা পড়াশোনা করে অর্জন করা যায় না। বরং ছোট বেলায়ই কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে তা বাসা বাঁধে। এজন্য অন্যান্য লোকেরা যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাদের সমকক্ষ হতে পারে না। এসব অসাধারণ ক্ষমতার মধ্যে একটি হলো বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করা। এ ক্ষমতা কারো মধ্যে কম থাকে, কারো মধ্যে বেশী, আবার কারো মধ্যে খুবই বেশী। উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার ফলে এ শক্তি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়, যখন বিদ্যার্জন ও শিক্ষা ছাড়াই এ ধরনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বস্তুসমূহের হকিকত অনুধাবন করতে পারে। তারা কোন বস্তুর বাহ্য জ্ঞানের অধিকারী না হলেও এ শক্তি বলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত জ্ঞান হাসিল করতে পারে। এ শক্তিকেই বলা হয় নুবুওয়াত। এ জ্ঞানকেই বলা হয় 'ইল্‌হাম' ও 'ওহী'।

ইমাম গাযালী 'এহ্‌ইয়াউল্‌ উলুম' গ্রন্থের প্রারম্ভেও এ বিষয়টি পরোক্ষভাবে বর্ণনা করেন। তাঁর এই আলোচনার শিরোনাম ছিল "মানুষের বুদ্ধি-মাত্রার বিভিন্নতা।" এখানকার কয়েকটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"মানুষের স্বাভাবিক গুণাবলী কি করে অস্বীকার করা যায়? গুণাবলীর পার্থক্য না থাকলে জ্ঞানের মাত্রায় বিভিন্নতা দেখা যায় কেন? কোন কোন ব্যক্তি এত বোকা হয় যে, শিক্ষকের পক্ষে তাদের বোঝানোই মুশকিল। আবার এমন সব মেধাবী ব্যক্তিও রয়েছে, যারা সামান্য ইংগিতেই ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারে। আবার এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক ও বিশেষজ্ঞও রয়েছে, শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াই যাদের অন্তরে বস্তুর স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। নবীদের (আঃ) অবস্থাও তাই। বিদ্যার্জন ছাড়াই তাঁদের অন্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এটাকেই বলা হয় 'ইল্‌হাম' বা অন্তরোদিত জ্ঞান। এ কথাটি রসূল করীম এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ জিব্রাঈল আমার অন্তরে একটি বস্তু ফুঁকে দিয়েছেন।

ইমাম গাযালী রসূল করীমের এই বাণী পেশ করে নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে এ প্রশ্ন উঠে যে, এ ব্যক্তি কি নবী, না কি নবী নয়, তবে তার অবস্থাই এ প্রশ্নের সমাধান করে দেবে। ইমাম শাফেই যে একজন ফকীহ্ ছিলেন, তা আমরা কি করে নিশ্চিতভাবে বুঝাতে পারি ?

ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর ভাল ভাল রচনা আছে বলেই তাঁকে ফকীহ্ বলে মনে করি। এমনিভাবে আমরা যখন কুরআন মজীদের প্রতি তাকাই এবং বুঝতে পারি যে, নুবুওয়াতের লক্ষণগুলো কোন এক বিশেষ ব্যক্তির শব্দে শব্দে প্রতিফলিত, তখন নিশ্চিতভাবে ধারণা করি যে, এর ধারক ও বাহক পয়গাম্বর বই আর কিছু নন।"

নুবুওয়াত সম্পর্কে মুহাদ্দিস ইবনে হাযমের অভিমত

মুহাদ্দিস ইবনে হাযম নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন, এ জ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াই অর্জিত হয়। তিনি বলেন :

"এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নুবুওয়াত সম্ভাব্য বিষয়। নুবুওযাতের মানে হলো—আল্লাহ্ এক দল লোক প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব-গুণে ভূষিত করেন। এর জন্য কোন কারণের প্রয়োজন হয় না। বরং আল্লাহ্ স্বেচ্ছায়ই তাঁদেরকে জ্ঞান দান করেন। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা নিতে হয় না; উন্নতির বিভিন্ন স্তরও অতিক্রম করতে হয় না; এর জন্য আল্লাহ্র কাছে তাঁদের চাইতেও হয় না। এটা এমনি ধরনের কথা, যেমন আমরা স্বপ্নে একটা কিছু দেখতে পাই এবং পরে তা বাস্তবে পরিণত হয়।"

মুহাদ্দিস সাহেব নুবুওয়াতের সম্ভাবনা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, দুনিয়াতে যত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর প্রথম আবিষ্কর্তা শিক্ষাদীক্ষা ব্যতীতই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান লাভ করেন। সুতরাং নবীদের পক্ষেও এমনিভাবে জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব কিছু নয়। এই জ্ঞান লাভকেই বলা হয় 'ওহী'। মুহাদ্দিস সাহেব অনেক শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন :

"সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালা এক বা একাধিক লোককে শিক্ষক ছাড়াই কেবল ওহীর সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন। এটাই নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য।"

এ সব ভাষ্যের সার কথা হলো—আল্লাহ্ মানুষকে কতগুলো ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এগুলো কোন কোন লোকের মধ্যে মোটেও

দেখা যায় না। আবার অনেকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ; তবে কারো মধ্যে বেশী, আর কারো মধ্যে কম। এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষকে একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও দান করেছেন, যাকে বলা হয় ঐশিক শক্তি বা নুবুওয়াত। মানব-আত্মার পবিত্রকরণ ও চরিত্র সংস্কারই হলো এর কার্য। যে ব্যক্তির মধ্যে এ শক্তি পাওয়া যায়, চরিত্রের দিক থেকে তিনি হবেন পরিপক্ক এবং অপরাপরকেও পরিপক্ক করে তোলার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকবে। এমন ব্যক্তি কারো কাছে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন না বটে, কিন্তু অর্জিত জ্ঞান ছাড়াই তাঁর কাছে সকল বস্তুর হকিকত বিকশিত হয়।

নবুওয়াতের এই স্বরূপ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমরা স্পষ্টই দেখছি যে, এমন কতক লোকও রয়েছেন, যাঁরা লেখাপড়া শেখেননি, যেমন হোমার, ইম্‌রাউল কায়েস—অথচ এঁরা শক্তিধর কবি, বাগ্মী, শিল্পী বা আবিষ্কারক বলে পরিচিত, যাঁদের নজীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনিভাবে আল্লাহ্ যদি কোন কোন লোককে বিশেষ ঐশিক ক্ষমতা প্রদান করেন এবং শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াই তাঁদের কাছে নৈতিকতার স্বরূপ ও রহস্য উন্মোচিত হয়, তবে তাতে বৈচিত্র্য কোথায় ?

একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, অধিকাংশ নবী, যেমন হযরত ইব্রাহীম, ঈসা, মূসা ও নবী করীম (সঃ)---এঁদের মধ্যে কেউই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন নি। তা সত্ত্বেও তাঁরা হেদায়ত ও শিক্ষার প্রভাবে পৃথিবীর কায়া বদলে দিয়েছেন। তাঁরা নীতি-শাস্ত্রীয় এমন সব বিষয় শিক্ষা দেন, প্লেটো ও অ্যারিস্টলের ধারণাও যা স্পর্শ করতে পারে নি।

নুবুওয়াতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন কিভাবে সম্ভব

নুবুওয়াতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা এবং নবীর বাণীকে সত্য মনে করা---এটা সৎ মানুষেরই প্রকৃতি। যে ব্যক্তি সত্যাগ্রহী, যাঁর রুচি বিশুদ্ধ, যিনি সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন, যাঁর মনে সত্যকথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংকিত হয়, তিনি যখন কোন নবীর শিক্ষা ও হেদায়তসূচক বাণী শুনতে পান, তখন তিনি কুতর্কে লিপ্ত না হয়েই তা বিশ্বাস করে নেন। তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, এটা সত্য এবং এর উৎসও সত্য। মওলানা রুমী একটি তুলনার মাধ্যমে

কথাটি বোঝাতে গিয়ে বলেন, যদি কোন তৃষ্ণার্তকে পানি দেওয়া হয়, তবে সে কি প্রথমে এই প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামাবে যে, এটা পানি কি-না? অথবা কোন স্ত্রীলোক যদি তার সন্তানকে দুধ পান করাতে ডাকে, তবে সে কি সন্দেহ করবে যে, এ ব্যক্তি আমার মা কি-না এবং সত্যিই আমাকে দুধ পানের জন্য ডাকছে কিনা?

ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী বলেন ঃ

নবীদেরকে দু' ধরনের মুজিযা দেওয়া হয়ঃ প্রথম হলো---নবী সৎবংশে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর চেহারায় এমন নূর থাকে, যা লোকের মনকে আকৃষ্ট করে; তাঁর চরিত্র লোকের অন্তরকে মোহিত করে; তাঁর কথাবার্তা শ্রোতাকে সান্ত্বনা দান করে। এরপর তিনি বলেনঃ

"এ সব চিহ্ন পাওয়া গেলে জ্ঞানবান লোকের কাছে নুবুওয়াতের জন্য আর কোন মুজিযার প্রয়োজন থাকে না; সে আর কোন মুজিযার অন্বেষণ করে না।"

ইমাম গাযালী নুবুওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'মুনকিয্ মিনাদ্ দালাল্' গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তি নবীজীর হেদায়ত ও বিধি-নিষেধের উপর বার বার চিন্তা-ভাবনা করে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তির মনে নুবুওয়াত সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা জন্মাবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

আপনি এভাবেই নুবুওয়াত বিশ্বাস করে নিন। লাঠি সর্পে পরিণত হয়েছে বা চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে—সে দিকে আপনি যাবেন না।

'মাআরিফ্-ফী-শর্হিস্ সাহায়েফ্' ইলমে কালামের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতে নবীজীর নুবুওয়াত-কে দু'ভাবে প্রমাণ করা হয়েছেঃ প্রথম হলো সেই পুরনো পদ্ধতি, অর্থাৎ মুজিযার মাধ্যমে। দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয় ঃ

"নবীজীর নবুওয়াত প্রমাণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো—তাঁর কার্যকলাপ, কথাবার্তা ও বিধি-বিধান দিয়ে তা প্রমাণ করা।"

অতঃপর এ পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ

বস্তুত এ পদ্ধতিই নুবওয়াতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে।

নবীদের শিক্ষা ও তাঁদের পথপ্রদর্শন-পদ্ধতি

ধর্ম সম্পর্কে বড় বড় ভুল ধারণা সৃষ্টির কারণ হলো—লোকেরা নবীদের শিক্ষাদান-নীতিকে খতিয়ে দেখছে না। ইলমে কালামের

প্রচলিত গ্রন্থসমূহে এ জরুরী বিষয়টির প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হয় নি। কিন্তু ইমাম রাযী 'মাত্বালিবে আলিয়া' গ্রন্থে, ইব্নে রুশ্দ্ 'কাশ্ফুল আদিল্লাহ্' গ্রন্থে এবং শাহ্ ওলীউল্লাহ 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এ নীতিগুলো বর্ণনা করেন।

প্রথম নীতি

সাধারণ লোক হোক বা অসাধারণ লোকই হোক– সকল শ্রেণীর লোককে হেদায়ত করাই নবীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সাধারণ লোকের তুলনায় অসাধারণ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম বলেই নবীদের শিক্ষা দান-নীতিতে জনসাধারণের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। তবে প্রত্যেক স্থানেই পরোক্ষভাবে আসল বিষয় ও গূঢ় তত্ত্বের প্রতি ইংগিত দেওয়া হয় এবং তা বিশিষ্ট লোকদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়।

কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতসমূহ কেন অবতীর্ণ হলো, তার সব চাইতে বড় কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রাযী বলেন ঃ

সাধারণ লোক হোক, আর অসাধারণ লোকই হোক—কুরআনে সবাইকে সত্যের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। জনসাধারণের অবস্থা হলো এই যে, তাদের মন-মেজাজ সাধারণত পদার্থের হকিকত উপলব্ধি করতে চায় না। সুতরাং এমন সব শব্দে কুরআনের কথাগুলো বিবৃত করা হয়েছে, যাতে জনসাধারণের চিন্তাধারার সঙ্গেও কিছুটা সামঞ্জস্য থাকে, আবার প্রকৃত বিষয়টিও বিবৃত হয়।

আল্লাহ তোমাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এর অনেক আয়াত পরিষ্কার ভাবধারার বাহক। (তফসীর-এ-কবীর, সূরা-এ-আল্-ইম্রান)

ইব্নে রুশ্দ্ 'ফস্লুল্ মাকাল' গ্রন্থে বলেন ঃ

শরীয়তের প্রথম উদ্দেশ্য হলো—জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। কিন্তু এতে বিশিষ্ট লোকদের বাদ দেওয়া হয় নি।

দ্বিতীয় নীতি

নবিগণ লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার তারতম্যভেদেই তাদের সম্বোধন করেন। কিন্তু জ্ঞানার্জন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলে যে সামান্য পরিমাণ বিদ্যা-বুদ্ধি মানুষের আয়ত্তে আসে, সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে, বেশীর ভাগ মানুষই নবীর বাণী অনুধাবনের পাত্র নয়। ইমাম গাযালী বলেন ঃ

"নবীদের অন্যতম নীতি হলো —লোকের সহজাত বুদ্ধির তারতম্য অনুসারেই তাঁরা তাদের সম্বোধন করেন। বাস্তবক্ষেত্রে নবিগণ তাই করেছেন; লোকের সহজাত জ্ঞানের মাত্রা অনুসারেই তাদের হেদায়ত করেছেন; তাঁরা লোকদের এ আদেশ দেন নি যে, আধ্যাত্মিক সাধনা করে বা যুক্তি প্রয়োগ করে বা অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই আল্লাহ্‌কে চিনতে হবে। তাঁরা এ আদেশও দেন নি যে, আল্লাহ্‌কে প্রত্যেক দিক থেকেই অনুরূপ উপায় অবলম্বনে পবিত্র বলে মনে করতে হবে।"

(হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা)

তৃতীয় নীতি

সবচাইতে বেশী লক্ষণীয় বিষয় হলো—নবিগণ চরিত্র সংস্কার ও আত্মার সংশোধন ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন নি। যদি করেও থাকেন, তবে লোকের পরম্পরাগত মতামত ও ধ্যান-ধারণা অনুসারেই করেছেন এবং তাও আবার রূপক ও ভাবার্থেই করেছেন। ইমাম গাযালী বলেন ঃ

"নবীদের অন্যতম নীতি হলো—যে সব বিষয়ের সঙ্গে আত্মার সংশোধন ও জাতীয় রাজনীতির কোন সংযোগ নেই, সেগুলো নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন নন। যেমন শূন্য জগত সংক্রান্ত বৃষ্টি, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, রামধনু ইত্যাদি সৃষ্টি কারণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের রহস্য, চন্দ্র-সূর্যের গতির পরিমাণ, দৈনন্দিন ঘটনাবলীর কারণ, নবী, বাদশা ও বিভিন্ন দেশের কাহিনী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নবিগণ আলোচনা করেন না। তবে যে সব মামুলি বিষয়ের সঙ্গে লোকেরা পূর্ব থেকেই পরিচিত এবং যেগুলো তাদের বিবেক-বুদ্ধির কাছে গ্রহণীয়, কেবল সেগুলো নিয়েই নবিগণ আল্লাহ্‌র মহিমা ও শক্তি অনুধাবিত করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ ও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে থাকেন এবং তাও আবার ভাবার্থ ও রূপকার্থে করে থাকেন। লোকেরা যখন রসূল করীমকে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন এ নীতির উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ্ সে বিষয়ের উত্তর দানে বিরত থাকেন এবং তার কারণ বর্ণনার স্থলে মাস গণনার উপকারিতা তুলে ধরেন। যেমন কুরআনে আছে ঃ "আপনার কাছে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। হে রসূল ! আপনি বলুন, এটা হলো লোকের সময় গণনা ও হজের সময় নির্ধারণের উপায়মাত্র।"

অংক ও অন্যান্য শাস্ত্রের সংগে গভীর পরিচয়ের ফলে অধিকাংশ লোকের ধ্যানধারণা বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং এর ফলেই তারা নবীদের বাণীকে অবাস্তব বলে অভিহিত করছে।

(হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা, পৃঃ ৮৮)

চতুর্থ নীতি

নবিগণ সব সময় একটি সাধারণ নীতিকে বাস্তবরূপে রূপায়িত করেন। তা হলো—তাঁরা যে লোকালয়ে প্রেরিত হন, তাদের পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ীর প্রস্তুত প্রণালী, সুখ ভোগের সামগ্রী, বিবাহ-পদ্ধতি, দাম্পত্যের রীতি-নীতি, ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, পাপের শাস্তি-বিধি, বিচার নীতি সব কিছুর উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন। যদি দেখতে পান যে, এসব বস্তু ঠিকই আছে, তবে তাঁরা সেগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পেছনে পড়েন না। বরং যা আছে, তার উপর অবিচলিত থাকার জন্যই তাগিদ করেন। কিন্তু চলতি বিধি-বিধানে যদি কোনরূপ দোষ-ত্রুটি দেখতে পান, অর্থাৎ তা যদি কারো কষ্টের কারণ হয়, বা তাতে পার্থিব ভোগ-বিলাসে প্রলুব্ধ হওয়ার আশংকা থাকে, বা সে নীতি যদি জন-মঙ্গল বিরোধী হয় বা তা যদি মানুষকে পার্থিব ও পরকালীন কোন সৎকাজ থেকে বিরত রাখে, তবে তাঁরা তা বদলে দেন। কিন্তু হঠাৎ কোন পরিবর্তন সাধন করা তাঁদের নীতি নয়, বরং তাঁরা এমন ধরনের পরিবর্তন সাধন করেন, যা সেই কওমে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, বা সে সব বস্তু এমন সব লোকের মধ্যে এক সময় প্রচলিত ছিল, যাঁদেরকে তারা পথ প্রদর্শক ও নায়ক বলে সমর্থন করে আসছে।

শাহ্ ওলীউল্লাহ এ নীতিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ

"এজন্যেই নবীদের শরীঅতে বিভিন্নতা দেখা যায়। যাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে পরিপক্ক, তাঁরা জানেন, শরীঅত-এ-ইসলামী বিবাহ, তালাক, লেন-দেন, সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিচার-আচার, শাস্তিবিধি, গনীমতের বণ্টন-নীতি—এসব বিষয়ে এমন কোন নতুন বিধি পেশ করেনি, যে সম্পর্কে লোকেরা মোটেও জানতো না বা যা গ্রহণ করতে তারা দ্বিধাবিভক্ত ছিল। শরীঅত যদি কোন পরিবর্তন করে

থাকে, তবে এতটুকু করেছে যে, ধর্মে যে বিধিটি জটিল ছিল, সেটাকে সহজ করে দিয়েছে, আর যা ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তা শোধরে দিয়েছে।''

পঞ্চম নীতি

নবীদের উপর যে শরীঅত অবতীর্ণ হয়, তাতে দু'টি অংশ থাকে ঃ এক অংশে থাকে ধর্মের সার্বিক নীতি অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো। ধর্মের এ অংশটি প্রত্যেক শরীঅতেই এক ও অভিন্ন। এতে থাকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তওহীদ, পুণ্য, শাস্তি, উপাসনা, আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশক প্রতীকসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদি। শরীঅতের দ্বিতীয় অংশ হলো- সেসব স্থানীয় ও সাময়িক বিধি-বিধান বা আচার-অনুষ্ঠান, যা বিশেষ বিশেষ নবীদের সঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকে। এদিক থেকেই বলা হয়—'ঈসবী শরীঅত', 'মূসবী শরীঅত', অর্থাৎ হযরত ঈসা (রাঃ)-এর শরীঅত ও হযরত মূসা (রাঃ)-এর শরীঅত। মূসবী শরীঅত ঈসবী শরীঅত থেকে স্বতন্ত্র। শরীঅতের এ অংশটুকু বিশেষ বিশেষ কওম ও দেশের সুবিধার্থে রচিত হয়। এর ভিত্তি প্রধানত সে সব চিন্তাধারা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, জীবন ব্যবস্থা ও তহযীব-তমদ্দুনের উপর রাখা হয়, যা পূর্ব থেকেই সেই কওমে বিদ্যমান থাকে। শাহ্ ওলীউল্লাহ বলেন ঃ

''যে সব বিদ্যা-বুদ্ধি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি সমাজের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রচলিত থাকে, শরীঅতের বিধি-বিধানে সেগুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। এ কারণেই বনী ইসরাইলের জন্য উটের মাংস ও তার দুধ হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু বনী ইসমাঈলের জন্য তা করা হয়নি। ঠিক অনুরূপ কারণে আরবদের রীতি নীতি অনুসারেই তাদের খাদ্যের হালাল-হারাম নির্ধারণ করা হয়েছিল। অনুরূপ কারণেই ভাগনীকে বিয়ে করা আমাদের ধর্মে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু ইহুদী ধর্মে তা করা হয়নি।''

শাহ্ ওলীউল্লাহ এ নীতির আরো অনেক বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনা এড়াবার জন্য আমি তা বাদ দিলাম।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

''মনে রাখা উচিত, এমন অনেক আচার-অনুষ্ঠান ও জ্ঞান-ভাণ্ডার আছে, যা আরব-অনারব—এক কথায় সুস্থ বিবেকসম্পন্ন যে কোন জাতি ও উচ্চ চরিত্রের অধিকারী লোকের কাছে সমভাবে গ্রহণীয়।

শরীয়তে এসব বস্তুর প্রতি সব চাইতে বেশী লক্ষ্য রাখা হয়। এরপর দৃষ্টিপাত করা হয় সেসব রীতিনীতির প্রতি, যা বিশেষ বিশেষ কওমে প্রচলিত থাকে।"

ষষ্ঠ নীতি

শরীঅতে কোন বিষয়ের প্রতি আদেশ করা বা কোন বিষয় থেকে বিরত রাখার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো—আদিষ্ট বস্তুর মঙ্গল ও নিষিদ্ধ বস্তুর অমঙ্গল তুলে ধরা এবং সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা দেওয়া—স্বয়ং এই আদেশ বা নিষেধ উদ্দিষ্ট বস্তু নয়। আদিষ্ট বস্তুটি ভাল বলেই তার প্রতি আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিষিদ্ধ বস্তুটি মন্দ বলেই সেখান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ চাপানো হয়েছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো—এমনি বর্ণনা দেওয়া ঃ—এই আদেশেই রয়েছে পুণ্য, আর ঐ নিষেধেই রয়েছে পাপ। যেমন কোন কোন দোয়া সম্পর্কে লোকের ধারণা রয়েছে যে, যদি এর শব্দে কোন প্রকার রদ-বদল করা হয়, তবে দোয়ার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে। এরূপ ক্ষেত্রেই আদেশ বা নিষেধ প্রয়োগের সময় দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথম পদ্ধতিটি আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর বিবেক-বুদ্ধিসম্মত বলে মনে হয়। কিন্তু তা সাধারণ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। এ পদ্ধতি অবলম্বনে যদি বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হয়, তবে প্রত্যেকটি অজ্ঞ লোককে আদিষ্ট বস্তুর মাহাত্ম্য ও নিষিদ্ধ বস্তুর অপকারিতা বুঝিয়ে দিতে হবে। অথচ এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এছাড়া যদি বলা হয় যে, অমুক কাজটি ভাল বলেই তা করা উচিত, তবে কথাটি লোকের মনে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে, অমুক কাজের প্রতি আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন, এবং তা সম্পন্ন করা হলে তিনি খুশী হবেন, তবে একথাটি পূর্বকার কথাটির তুলনায় অনেকটা বেশী কার্যকর হবে। মনে করুন, যদি 'ইণ্ডিয়ান প্যানাল কোড' নামক গ্রন্থটির পরিবর্তে অন্যান্য নীতিমূলক পুস্তক প্রচার করা হয়, এবং তাতে লেখা থাকে যে, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খারাপ কাজ, তাই এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত, তবে কি এ গ্রন্থগুলো অপরাধ হ্রাস করার ক্ষেত্রে সেরূপ কার্যকর হবে, যেরূপ 'ইণ্ডিয়ান প্যানাল কোড' প্রচারের ফলে হয়ে থাকে? এজন্য নবিগণ উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রধানত দ্বিতীয় পদ্ধতিই অবলম্বন করে থাকেন এবং আদিষ্ট বস্তুর উপকারিতা ও নিষিদ্ধ

বস্তুর অপকারিতা বর্ণনা না করে স্বয়ং আদেশ পালনকেই পুণ্য ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকেই পাপ বলে অভিহিত করেন। তাঁরা পুণ্যকে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও পাপকে তাঁর অসন্তোষ বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁরা নামায, রোযা ও যাকাতের প্রতি আদেশ দেওয়ার সময় সাধারণ লোকের কাছে একথা বলেন না যে, এসব কাজে ওমুক তমুক মঙ্গল রয়েছে। তাঁরা কেবল একথাই বলেন যে, এসব কাজ করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং না করলে অসন্তুষ্ট হন। মূলত জনসাধারণকে কোন কাজের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য এটাই হলো একমাত্র কার্যকর পন্থা।

উপরিউক্ত নীতিগুলো সব নবীরাই পালন করেন। কিন্তু যে রসূলের রিসালাত্ সার্বজনীন এবং যিনি সারা বিশ্বের সংস্কারের জন্য প্রেরিত হন, তাঁর হেদায়ত ও শিক্ষায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অন্যান্য নবীদের মধ্যে থাকে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নবী যে গোত্র বা সমাজে প্রেরিত হন, শরীঅতে তাদের রীতি-নীতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু যে পয়গাম্বর সারাজাহানের জন্য প্রেরিত হন, তাঁর শরীঅতে এ নীতি চলতে পারে না। কারণ দুনিয়ার সব কওমের রীতি-নীতি এক নয় বলে তিনি সকলের জন্য আলাদা আলাদা শরীঅত রচনা করতে পারেন না। তাই তিনি প্রথমে নিজ কওমকে নিয়েই শিক্ষাদান আরম্ভ করেন এবং তাকেই নৈতিকতার আদর্শস্থলরূপে বেছে নেন। নিজ লোকালয়কে ধর্ম প্রচারের ভিত্তিস্থলরূপে দাঁড় করানোর পর তিনি ক্রমাগত তাঁর প্রচার পরিসরকে প্রশস্ত করার কাজে হাত দেন। তাঁর শরীঅতে বিশ্বজনীন রীতিনীতির প্রতিফলন থাকলেও তাতে নিজস্ব কওমের আচার-অনুষ্ঠান ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। তবে এ সব আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে যে সব নির্দেশ রচিত হয়, সেগুলোর বাস্তব রূপায়ণ মূল উদ্দেশ্য নয় এবং সেজন্য সেগুলোর উপর বিশেষ জোরও দেওয়া হয় না।

শাহ ওলীউল্লাহ্ এ নীতিটি তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা' গ্রন্থে ফলাও করে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ

''যে ইমাম ও যে পথ প্রদর্শক সকল কওমকে একই ধর্মের গণ্ডিতে আনতে চান, তাঁকে উপরিউক্ত নীতি ছাড়া আরো কতগুলো নীতির

অনুসরণ করতে হবে। তন্মধ্যে একটি হলো—তিনি বিশেষ একটি কওমকে সৎপথের দিকে আহবান করবেন; তাদের সংস্কার সাধন করবেন; তাদের বিশুদ্ধ করবেন; তাদের নিজের সহায়করূপে গ্রহণ করবেন। এ কর্মপন্থা অবলম্বনের কারণ হলো—কোন ইমামের পক্ষে এক সাথে দুনিয়ার সব কওমের সংস্কার সাধন করা দুঃসাধ্য। তাই তাঁর কর্তব্য হলো—আরব-অনারব অর্থাৎ সকল মানুষের প্রকৃতিগত ধর্মের উপর নিজ শরীঅতের ভিত্তিমূল স্থাপন করা; তাঁর স্বীয় কওমের আচার-অনুষ্ঠান ও ভাবধারার নীতি গ্রহণ করা, অন্যান্য কওমের তুলনায় নিজ কওমের প্রতি বেশী নজর রাখা; অতঃপর সকল লোকের উপর এ শরীঅত আরোপিত করা। এরূপ করার কারণ হলো—কোন কওমের নায়কই নিজ কওমের জন্য স্বতন্ত্র শরীঅত গড়তে পারেন না। সুতরাং সবচাইতে উত্তম ও সহজ পদ্ধতি হলো ধর্মীয় প্রতীক, অপরাধজনিত আইন-কানুন ও প্রশাসনিক ব্যাপারে ইমামের নিজস্ব কওমে প্রচলিত বিধি-বিধানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং এসব নির্দেশাবলী পালনে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রতি কড়াকড়ি আরোপ না করা।

এ সব নীতির আলোকে এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, চুরি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদির ব্যাপারে ইসলাম যে শাস্তি বিধান করেছে, তাতে আরবদের রীতিনীতির প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এতে আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে, বর্তমানে এসব শাস্তি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে প্রয়োগ করা কতখানি সমীচীন বা কতখানি প্রয়োজনীয়।

অপ্রাকৃত ঘটনাবলী

উপরিউক্ত বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, নুবুওয়াতের যথার্থতা অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল নয়। তাই এ বিষয়টি নিয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেখলাম, অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রত্যেক ধর্মেরই একটি জরুরী অংগ হয়ে রয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে, ইসলামেও এর কিছুটা নমুনা রয়েছে। তাই ভাবলাম, এ সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। কুরআন মজীদে এ ধরনের যত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, আধুনিক ভাবাপন্ন সম্প্রদায় সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এসব ঘটনাবলীতে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলতে কিছুই নেই। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, কেবল কুর'আন কেন, প্রত্যেকটি ঐশ গ্রন্থে এ ধরনের অপ্রাকৃত ঘটনাবলী রয়েছে। এটাও বলতে হয় যে, এ ব্যাপারে আশায়েরার বাড়াবাড়ি ছেলেমির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। অন্য দিকে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অস্বীকার করাও কম ঠেঁটামির কথা নয়। এ যুগের লোকেরা এ সম্পর্কে যে সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আমাদের অজানা নয়। এতে সন্দেহ নেই যে, এসব পরোক্ষ ব্যাখ্যা কেবল সে সব হতভাগ্য শিক্ষিত লোকের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, যাঁরা আরবী ভাষা ও তাঁর রচনাবলীর সাথে অপরিচিত। কিন্তু যাঁরা আরবীতে দক্ষ, তাঁদের কাছে এ ধরনের জোড়া তালি দেয়া ব্যাখ্যা কোন কাজে আসবে না।

সত্য কথা হলো, আধুনিক মতবাদসম্পন্ন লোকেরা রুখে দাঁড়িয়েছেন সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁরাও সীমা লংঘন করে গেছেন। একদিক থেকে বাড়াবাড়ি হলো একথা বলা— যে কোন মানুষ থেকে অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা ঘটতে পারে। ওলীদের কারামত সত্য এবং এর পরিমাণের কোন সীমারেখা নেই। অন্য দিক থেকে এই কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে যে, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কিছুই ঘটতে পারে না। কিন্তু আমাদের উচিত হলো—অতি উদারতা ও কঠোরতা বাদ দিয়ে প্রকৃত ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা।

অপ্রাকৃত ঘটনাবলী অস্বীকারকারীদের যুক্তি ও সে বিষয়ে আলোচনা

অপ্রাকৃত ঘটনাবলী অস্বীকারকারীদের প্রধান যুক্তি হলো—এরূপ কার্যাবলী প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ এবং যে বস্তু প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ, তা অবান্তর। এ যুক্তির দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রথম আশ্রয় বাক্যটি প্রমাণ করার কি পদ্ধতি রয়েছে? প্রকৃতির সকল নিয়ম কি এযাবত স্থিরীকৃত ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে? আমরা কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, যে সব বস্তুকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে অভিহিত করে থাকি, কেবল সেগুলোই বাস্তবিক পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম? আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ এখন প্রকৃতির এমন শত শত নিয়ম উদ্‌ঘাটন করেছে, যা ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আর এখনো নব নব তথ্য ও তত্ত্ব উন্মেষিত হচ্ছে। শত শত বরং হাজার হাজার বছর আগে ফকীর ও সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, তারা কেবল অন্তরের আকর্ষণ দিয়েই মানুষকে মোহিত করে ও প্রভাবান্বিত করতে পারে। বর্তমান বিজ্ঞান এযাবত তা অস্বীকার করতো এবং বলতো, একটি জড় বস্তু অপর একটি জড় বস্তুর সঙ্গে মিলিত না হয়ে কোন নতুন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করবে—এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যাদুবিদ্যার গুণে আত্মিক শক্তি প্রভাবিত হয়—এটা প্রমাণিত হওয়ার পর আগেকার সমস্ত অস্বীকৃত ঘটনাবলীকেও স্বীকার করে নিতে হলো। আজ একজন নিপুণ যাদুকর জনসমক্ষে কেবল দৃষ্টিশক্তির বলে বা আত্মিক শক্তির প্রভাবেই যে কোন লোককে অজ্ঞান করতে পারে; তার মুখ দিয়ে যে কোন কথা বলাতে পারে; যে কোন কাজ তার হাতে করাতে পারে।

প্রাচীন আরবী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে: মিসরে এক প্রকার মাছ আছে, যাকে স্পর্শ করলেই মানুষের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়। কম্পমান ব্যক্তি যদি মাছটি হাত থেকে ছুঁড়ে না ফেলে, তবে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অনেক দিন পর্যন্ত এ ব্যাপারটাকে বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ ব্যাপার বলে মনে করা হতো। বর্তমান বিজ্ঞান এরূপ মাছের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে এবং বলছে যে, এ মাছের গায়ে বিদ্যুৎ রয়েছে।

ইওরোপের বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন যে, যতই গবেষণা-কার্যের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে, ততই তথাকথিত অসম্ভব বস্তু সম্ভব বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

অপ্রাকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে ইওরোপীয় জ্ঞানীদের অভিমত

বিখ্যাত ফরাসী জ্ঞানী কেমিল ফেলামারিয়ঁ পদার্থ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ বলে সুবিদিত। তিনি "স্পিরিচিউয়্যালিযম্" নামক গ্রন্থে বলেন: "মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস হলো যে বস্তু বাহ্যত সন্দেহযুক্ত বা যে বস্তুকে সে জানে না এবং বুঝতে পারে না, সে বস্তুর অস্তিত্বকে সে অস্বীকার করে বসে। হেরোডোটাসের রচনায় আমরা যখন দেখতে পাই যে, একজন স্ত্রীলোকের উরুতে বক্ষ ছিল এবং সেখান থেকেই সে তার সন্তানকে দুধ পান করাতো, তখন আমাদের হাসি পায় এবং আমরা তা নিয়ে বিদ্রূপও করি। কিন্তু ১৮২৭ সনের ২৫শে জুন প্যারিসে যে জ্ঞান-চর্চামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এ বিষয়টির চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

"অনুরূপভাবে আমাদের নিকট যদি বলা হয় যে, একজন লোক মারা গেছে, মৃত্যুর পর শরীর পরীক্ষা করে তার পেটে একটি সন্তান পাওয়া গেছে, এটা ছিল তার যমজ সন্তান, যা তার পেটে প্রতিপালিত হচ্ছিল, তখন আমরা ঘটনাটিকে গাঁজাখোরী বলে মনে করবো। কিন্তু কয়েকদিন হলো, আমি স্বয়ং দেখেছি যে, একটি সন্তান ছাপ্পান্ন বছর পর্যন্ত উদরে প্রতিপালিত হওয়ার পর ভূমিষ্ট হয়েছে। হেরোডোটাসের একজন অনুবাদক লিখেছেন যে, আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী রোকসান একটি সন্তান প্রসব করেছিল, যার মাথা ছিল না—একথাটি লোকেরা বিবেক বিরুদ্ধ বলে মনে করতো। কিন্তু আজ সকল চিকিৎসা-অভিধানে এটা সমর্থন করা হয় যে, অনেক সন্তান মাথা ছাড়াও জন্মগ্রহণ করে।"

"এ সব ঘটনাবলী আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে যে, আমরা যেন সতর্ক হই। কেননা যারা অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগিয়ে এসব ঘটনাকে অস্বীকার করে, তারা অজ্ঞ ও বোকা।"

আমাদের দেশে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইওরোপবাসী সাধারণত অপ্রাকৃত ঘটনাবলী অস্বীকার করে। এ জন্যই আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে প্রত্যেকটি লোক অতীন্দ্রিয় ঘটনাকে অস্বীকার করতে চায়। তাই আমি এ বিষয়ে ইওরোপের নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীদের মতামত ও ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

আধ্যাত্মিকতা

যাঁরা জড়বাদী, যাঁদের গবেষণা পদার্থ ও তার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাঁরা অস্বাভাবিক ঘটনাবলী অস্বীকার করে আসছেন। বহুকাল পর্যন্ত ইওরোপে এ মনোভাব বিদ্যমান ছিল। অতঃপর দার্শনিকদের একটি দল আত্মা ও তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। এঁরা বহু পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের পর ঘোষণা করলেন যে, আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র একটি বস্তু। এর শক্তি ও উপলব্ধি সম্পূর্ণ আলাদা। আত্মা শতশত ক্রোশ দূরে থেকেও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কোন একটি বস্তুকে দেখতেও পারে, কোন একটি কথা শুনতেও পারে। তা আগাম ঘটনাবলী আঁচ করতে পারে। তা ইচ্ছা করলে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত নিজ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মোট কথা, আত্মার বলে এমন কার্যাবলী সংঘটিত হতে পারে, যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এ সম্প্রদায় তাঁদের ভাবধারা এত জোরালোভাবে প্রকাশ করেন যে, বিশিষ্ট লোকেরা এ গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য লণ্ডনে একটি বড় সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতির সদস্য ছিলেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ:

স্যার জন্ লেক্, পার্লামেণ্ট সদস্য, সমিতির সভাপতি।

অধ্যাপক হাক্সলী। তিনি ছিলেন বড় পদার্থবিদ ও উকিল।

লুইস্—বড় পদার্থ বিজ্ঞানী।

আলফ্রেড্ ওয়েল্স্—ডারউইনের সমসাময়িক। তিনি বিবর্তন মতবাদে বরাবর ডারউইনের সহযোগী ছিলেন।

মর্গন—অংকশাস্ত্র সমিতির সভাপতি।

জন্ কক্স।

এ ছাড়া আরো অনেক জ্ঞানী এ সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আঠার মাস পর্যন্ত এ সমিতি একাধারে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমিতির সদস্যগণ যে রিপোর্ট পেশ করেন, তার কয়েকটি বাক্য এই:

"সমিতি স্বচক্ষে দেখা অভিজ্ঞতা ও সন্দেহাতীত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করেই মতামত স্থির করেছেন। সমিতির পাঁচভাগের চারভাগ সদস্য গোড়ার দিকে এসব ঘটনাবলী অস্বীকার করতেন এবং মনে করতেন যে, এসব ঘটনাবলী হয়তো প্রতারণাপ্রসূত, নয়তো মানুষের

স্নায়ুবিক দুর্বলতাজনিত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ সূক্ষ্ম পরীক্ষণের পর তাঁদের স্বীকার করতে হলো যে, এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা সত্য ও বাস্তব।"

এরপর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এ বিষয়ে গবেষণার জন্য অপর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন হেজলপ ও হড্‌সন্। এ সমিতি প্রায় বার বছর গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন এবং ১৮৯৯ সালে তাঁরা গবেষণা কার্য শেষ করেন এবং এসব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। হেজলপ যে সব মতামত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো এই ঃ

আমি আশা করি, বছর খানেক পর নিশ্চিত প্রমাণ দিয়ে সারা দুনিয়াকে বুঝিয়ে বলতে পারবো যে, এই ধ্বংসনীয় জগতের পরপারে আরো একটি জগত রয়েছে। আমি স্বচক্ষে এমন অনেক অতিস্বাভাবিক বস্তু দেখেছি, যাতে যাদু বা প্রতারণার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না।"

হড্‌সনের রিপোর্টের কয়েকটি বাক্য প্রণিধান করুন ঃ

"খুব শিগগির পৃথিবীতে নব নব তথ্য উন্মোচিত হবে। আশা করি, দু'বছরের মধ্যে আমি মানব জীবন সংক্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর নতুন ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবো। অধ্যাপক হেজলপ যদি এ দাবি করে থাকেন যে, তিনি মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথা বলেছেন, তবে তিনি পুরোপুরি সত্য কথাই বলেছেন।"

একজন সাংবাদিক হডসনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ

"আমি এবং অধ্যাপক হেজলপ একসঙ্গে গবেষণা আরম্ভ করেছি। আমরা উভয়ই ছিলাম প্রকৃতিবাদী। আমরা কিছুই বিশ্বাস করতাম না। আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল-আধ্যাত্মিকতার দাবিদারগণ আজব যে খেলা খেলছে, তাদের সেই গোমর ফাঁস করে দেওয়া। কিন্তু আজ আমি বিশ্বাস করি যে, মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যায়। এ বিষয়ে এত প্রকাশ্য যুক্তি রয়েছে যে, এখন সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই নেই।"

অধ্যাপক কক্স ছিলেন ইম্পিরিয়াল সায়েণ্টিফিক্ সোসাইটির সভাপতি। তিনি জনসভায় বলেন ঃ "আমি কেবল এ কথাই বলি না যে, অপ্রাকৃত ঘটনা সম্ভব। বরং আমি বলি, এটা বাস্তব সত্য।"

অধ্যাপক কক্স বিশেষ করে অধ্যাত্মবাদের উপর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি প্রচুর সংখ্যায় পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন ঃ আমি বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছি। এখন এগুলো প্রকাশ করলে হয়তো সমালোচকেরা আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করবে—এরূপ কিছু মনে করা নৈতিক কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জড়বাদীদের মধ্যে জর্জ ইঙ্কাটন ছিলেন একজন বড় বিজ্ঞ লোক। তিনি আত্মার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এর প্রবক্তাকে তিনি ভীষণভাবে আক্রমণ করতেন। তিনি আত্মার বিশ্বাসীদের ধ্যান-ধারণার অসারতা প্রমাণ করার জন্য এ বিষয়টির প্রতি ধ্যান দেন এবং একটানা পনর বছর কাল এই সাধনায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বলে উঠলেন ঃ

আমি আমার ঘরে এ বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা কার্য চালিয়েছি। এ ঘরে আমার বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমি অন্যের সাহায্য না নিয়ে একাই নিশ্চিতভাবে একাজ করেছি। যাঁদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে, তাঁরা বিগত হয়েছেন। তাঁরা ছিলেন আমার আত্মীয় পরিজন।

পার্কস্ ছিলেন একজন প্রখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ। তিনি জ্ঞান-বিষয়ক এক পত্রিকায় লিখেছেন ঃ

"আত্মার বিরোধিতা করে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সে সব আমি পড়েছি এবং রচয়িতাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কও করেছি। আমি আত্মার বহিঃপ্রকাশ স্বচক্ষে দেখেছি এবং দশ বছর যাবত পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছি। এখন আমি বিদ্যা-বুদ্ধির সম্বল নিয়ে এ বিষয়টি আলোচনা করতে পারি।"

অংক শাস্ত্র সমিতির সভাপতি মর্গন বর্ণনা করেন ঃ আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি এবং স্বীয় কানে যা শুনেছি, তা আমাকে এত নিশ্চিত করে তুলেছে যে, এখন আমার কাছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

এ সম্পর্কে বড় সমর্থন রয়েছে রাসেল্ ওয়েল্সের। এই প্রখ্যাত জ্ঞানী ছিলেন ডারউইনের সহযোগী ও সমকক্ষ। ডারউইনের নব মতবাদে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ বিষয়ে 'আত্মার রহস্য' শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি বলেন ঃ

আমি ছিলাম প্রকৃতিবাদী এবং তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। আমি ভাবতেও পারিনি যে, আত্মাকে আমি সমর্থন করতে পারবো বা এটা বিশ্বাস করতে পারবো যে, এ পৃথিবীতে একটি জড় বস্তু অপর কোন জড় বস্তুর সংযোগ ছাড়া প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

'কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাকে এসব বস্তুর সত্যতা ও বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। আমি তখন বিশ্বাস করতাম না যে, এগুলো আত্মারই প্রভাব। কিন্তু স্বচক্ষে দেখা এসব ঘটনা আমার বিবেক-বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। কোন যুক্তি প্রমাণ ইতিপূর্বে আমাকে আত্মায় বিশ্বাসী করে তুলতে পারেনি; কিন্তু আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে আত্মাকে স্বীকার না করে আমার কোন গত্যন্তর ছিল না।"

অধ্যাপক এলিয়ট ছিলেন আমেরিকার সায়েন্টিফিক সোসাইটির সভাপতি। তিনি এক পত্রিকায় লিখেছেন: আমাকে এ ধরনের একটি মাত্র ঘটনারও উদ্ধৃতি দিতে হবে—একথা চিন্তা করাও কিছু দিন আগে আমার পক্ষে কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু এখন আমি বুঝি যে, এ ধরনের বিশ্বাসকে গোপন করার মানে—আমার বুদ্ধিজাত উন্নতিকে হ্রাস করা। এখন এসব সত্য ঘটনা দেখে আমি আর নিশ্চুপ থাকতে পারছি না। যদি নীরব থাকি, তবে কাপুরুষতার শিকারে পরিণত হবো।

জার্মানির প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ জুল্‌নারও এ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন বিজ্ঞ সহযোগী ছিলেন। তাঁদের নাম:

ওয়েবার।

ফিশ্‌নার—প্রকৃতি-বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ডাস্ট—প্রখ্যাত বিজ্ঞলোক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

যথেষ্ট গবেষণা শেষে এসব বিজ্ঞ লোকেরা আত্মার অনেক রহস্য স্বীকার করেন। জুল্‌নার ছিলেন একজন বড় বিদ্বান। তাঁর স্বীকৃতি দেখে লোকেরা মনে করলো যে, তিনি হয়তো ভুল করেছেন। এতে জুল্‌নার 'জ্ঞানের কয়েকটি পাতা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেন এবং তাতে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বরাত্ দেন। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে সত্য, সে সম্পর্কেও তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন।

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে জ্ঞানমূলক যে সম্মিলনটি অনুষ্ঠিত হয়, তার কোন এক বৈঠকে মহৎ অংকবিদ্ অধ্যাপক লজ একটি ভাষণ দেন। সে সময় আত্মা সম্পর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ জড় জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের মাঝখানে যে দেয়াল রয়েছে, তা এখন ভেঙ্গে পড়ার সময় এসেছে। কতগুলো বিঘ্ন তো পূর্বেই অপসারিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হবে যে, কত কিছু যে ঘটতে পারে, তার কোন সীমারেখা নেই। আমরা যে পরিমাণ জানি, তা অজানা বস্তুর তুলনায় কত যে কম, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।"

১৮৯৮ সালের ২২শে জুন যে সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অধ্যাপক ডুটশ বলেন ঃ আমি যেসব অপ্রাকৃত ঘটনা নিয়ে গবেষণা করেছি, সেসব শুনে ওঁরাই চটে যান, যাঁরা আলোচ্য বিষয়ের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি আমার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমার অভিজ্ঞতার ফলে যে অভিজ্ঞান অর্জন করেছি, তাতে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে মায়লন নামক স্থানে একটি বড় কমিটি গঠন করা হয়। এর সদস্যদের মধ্যে জার্মানির একজন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও ফরাসীর মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপকও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞ সদস্যগণ সতরটি অধিবেশনে অপ্রাকৃত বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের গবেষণার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমরা যে সব অপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাতে কোন প্রকার যাদু বা চাতুর্য ছিল না। তাই আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এমনি ধরনের শত শত অভিজ্ঞান রয়েছে। সেগুলোর উদ্ধৃতি দিতে হলে একটি বড় গ্রন্থের প্রয়োজন। তাই 'দায়েরাতুল্ মাআরিফ' নামক বিশ্বকোষের কয়েকটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছি ঃ

"আমেরিকা ও ইওরোপের লোকদের মধ্যে যাঁরা সাধারণ জ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে পারদর্শী, তাঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এ ধরনের একটি শক্তি আছে, যা এতদিন উদ্ঘাটিত হয়নি। এ শক্তি দিয়ে অনেক অবিশ্বাস্য কাজ করা যায়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোন প্রকার প্রতারণা বা হাতের সাফাই নেই। তাঁদের ধারণা হলো ঃ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা

যদি বাস্তবধর্মী নাও হয়, তথাপি কিছুটা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।''

এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে সব অপ্রাকৃত বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো সংখ্যায় হাজারের চাইতেও বেশী। এ গবেষণার উপর ভিত্তি করে যে সব সার্বিক অভিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, ক্যামিল ফেলামারিয়ঁ সেগুলো নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণনা করেন :

(১) আত্মার অস্তিত্ব শরীর থেকে স্বতন্ত্র।

(২) আত্মার যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে তা এ যাবত অজ্ঞাত ছিল।

(৩) ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ছাড়াও আত্মা অন্যভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারে এবং তা অন্য বস্তুর উপরও আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

(৪) আত্মা আগাম ঘটনাবলী সম্পর্কেও অবহিত হতে পারে।

উক্ত ভাষ্যগুলোকে আমরা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই না। আমরা শুধু এটাই প্রমাণ করতে চাই যে, মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। সেটাকে আত্মা বলুন বা আঙ্গিক সংযোজনের বৈশিষ্ট্যই বলুন—তার ফলে যে সব অদ্ভুত কার্যাবলী সংঘটিত হয়, সেগুলোকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবক্তাগণ অপ্রাকৃত বলে আখ্যায়িত করেন এবং স্বীকার করেন যে, এ আত্মিক শক্তি পদার্থ ও জড়শক্তির ঊর্ধ্বে। তাই অপ্রাকৃত ঘটনাবলীকে কোন বুদ্ধিমান লোকই অস্বীকার করতে পারে না। তবে পার্থক্য হলো এই যে, সংস্কারাচ্ছন্ন ও সাদাসিধে লোকেরা বিশ্বাস করে যে, কোন কারণ ব্যতীতই সরাসরি আল্লাহর কুদরতে এসব সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু অনন্যসাধারণ লোকেরা মনে করে যে, এই কার্য-কারণের জগতে প্রত্যেকটি বস্তুই কারণনির্ভর। তাই অপ্রাকৃত বিষয়াদির পেছনে কোন না কোন কারণ নিশ্চয়ই থাকবে।

মুসলিম জাহানে যে সব দার্শনিক ও জ্ঞানী বিগত হয়েছেন, যেমন ইমাম গাযালী, ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌, শাহ ওলীউল্লাহ—এঁরা এ ধরনের অপ্রাকৃত ঘটনাবলীকে কারণ-প্রসূত বলেই বর্ণনা করেন। তাঁরা সেই সব কারণসমূহের ব্যাখ্যা দেন, যেগুলোর ফলে অপ্রাকৃত ঘটনাবলী সংঘটিত হয়ে থাকে। ইমাম গাযালী মুজিযাকে তিনভাগে বিভক্ত করেন : বাস্তব, কল্পিত ও বুদ্ধিজাত। প্রথম প্রকার মুজিযার কথা ইমাম গাযালী কেবল আশায়েরাপন্থীদের খুশী করার জন্যই বলেছেন।

বাকি দু'টো মুজিযা হলো তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা-প্রসূত। এগুলো পুরোপুরি আধুনিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানসম্মত। আমি ইমাম গাযালীর 'জীবন-চরিত' গ্রন্থে এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব শব্দের উদ্ধৃতি দিয়েছি। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

অপ্রাকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে বু-আলী সিনার মতামত

বু-আলী সিনাও অনেকদিন পর্যন্ত অপ্রাকৃত কার্যকলাপকে অস্বীকার করে আসছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক সূফীদের অপ্রাকৃত ঘটনাবলী এত বেশী তাঁর নজরে পড়েছিল যে, সেগুলোর কারণ নিয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনা না করে পারেন নি এবং সেগুলো স্বীকার না করেও পারেন নি। '**ইশারাত**' গ্রন্থের ভাষাই তাঁর এ মনোভাবের পরিচায়ক। বু-আলী সিনা অপ্রাকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে বলেন ঃ

"এগুলো ছিল আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এতে যখন অপ্রাকৃত ঘটনার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো, তখন আমি সেগুলোর কারণ সন্ধানের পেছনে পড়লাম। এ সম্পর্কে আমি স্বয়ং যা দেখেছি এবং যাঁদের আমি বিশ্বস্ত বলে মনে করি, তাঁরা যা দেখেছেন, সে সব যদি লিখতে হয়, তবে দীর্ঘ একটি গ্রন্থে পরিণত হবে।"

বু-আলী সিনা বিভিন্ন অপ্রাকৃত ঘটনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে আত্মিক ক্ষমতার প্রভাবকেই তিনি সব চাইতে বড় কারণ বলে অভিহিত করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"এটা স্পষ্টতই বলা যায় যে, কল্পনা ও চিন্তার প্রভাব দেহের উপর এমনিভাবে পড়ে যেমন আনন্দের প্রভাবে চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়। দুশ্চিন্তার ফলে অনেক সময় মানুষ পীড়িত হয়ে পড়ে। এমনিতেই মানুষের মনে কারো সম্পর্কে অশুভ ধারণা জন্মায়। সেই ধারণার ফলে ক্রোধের উদ্রেক হয়। অতঃপর ক্রোধের দরুন দেহে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, এমন কি সে ব্যক্তি ঘর্মাক্তও হয়ে উঠে। জড়বাদীরা বলে থাকেন, জড় বস্তুর উপর কেবল জড় পদার্থই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উক্ত যুক্তিতে জড়বাদীদের সে দাবি অসারতায় পর্যবসিত হয়। কেননা চিন্তা, কল্পনা, ক্রোধ এ সব জড় পদার্থ নয়, বরং অবস্থার নাম। তা সত্ত্বেও দেহের উপর এ সবের প্রভাব পড়তে দেখা যায়।"

"এ সব অবস্থার দরুন মানুষ যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাবান্বিত হয়, তেমনি এসব শক্তি প্রবল হলে তা অপরাপর মানুষের উপরও

প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ শক্তি কারো মধ্যে বেশী থাকে, আবার কারো মধ্যে কম। কারো মধ্যে তা এত বেশী থাকে যে, তাতে অতীব অদ্ভুত ঘটনাও সংঘটিত হয়।"

"যে ব্যক্তির মধ্যে এ শক্তি স্বভাবিক ভাবে বিদ্যমান থাকে, তিনি যদি স্বভাবতই সচ্চরিত্র হন এবং এ শক্তিকে সদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন, তবে হয়তো তিনি নবী হবেন, নয়তো ওলী। আর যদি এ শক্তির অধিকারী লোকটি স্বভাবতই দুশ্চরিত্র ও অসৎ হয় এবং এ শক্তিকে মন্দ কাজে লাগায়, তবে সে ব্যক্তি হবে যাদুকর বা বাজিকর।"

ইমাম গাযালী 'মাআরিজুল্ কুদ্স্' নামক গ্রন্থে নবীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন ঃ

"কোন কোন লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আমাদের আত্মিক ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশী এবং এরূপ হওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। এরূপ ক্ষমতা বলে মানুষ যেভাবে নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমনি জগতকেও প্রভাবান্বিত করতে পারে।"

বু-আলী সিনা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেন, তা পুরোপুরি আধুনিক জ্ঞানসম্মত। অধ্যাত্মবাদীরা পরিষ্কার ভাষায় সমর্থন করেন যে, আত্মা একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বস্তু। অতিমানবিক ঘটনাবলী এর প্রভাবেই ঘটে থাকে। যাঁরা আত্মায় বিশ্বাসী নন, তাঁদেরকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি নিহিত আছে, যার বদৌলতে অপ্রাকৃত এমন ঘটনাও ঘটতে পারে, যা জড় পদার্থে সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে ইওরোপের আধুনিক জ্ঞানলব্ধ বড় বড় বিদ্বানের মতামত পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা, অতিপ্রাকৃত ঘটনা এমন বস্তু নয়, যার উপর ভিত্তি করে কোন ধর্মকে বাতিল বলা যেতে পারে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, অপ্রাকৃত ঘটনা সংঘটিত হওয়া মামুলি ব্যাপার নয়। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এর উপর নির্ভর করা উচিত হবে না। কুর'আন মজীদ নিশ্চিত সত্য। তাই তাতে যে সব অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। কিন্তু প্রথমে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে যে, কুরআন মজীদের ভাষায় সেগুলো নিশ্চিতভাবে অপ্রাকৃত ঘটনা কি-না?

তফসীরকারদের মধ্যে যাঁরা সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন যেমন কাফ্‌ফাল্‌, আবু মুসলিম ইস্‌ফাহানী, আবুবকর আসুম তাঁদের ভাষ্যানুসারে কুরআনে অতিপ্রাকৃত ঘটনা খুব কমই রয়েছে। তবে যেগুলো অতি-প্রাকৃত বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো অস্বীকার করার জো নেই।

সর্বশেষে এটাও বলে রাখা উচিত, আশায়েরাপন্থী ও বর্তমানের সাধারণ মুসলমানেরা অতিপ্রাকৃতের গণ্ডিকে যেভাবে প্রশস্ত করে তুলেছেন, তাতে প্রত্যেক প্রকার অবান্তর ও অবাস্তব বস্তুই এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ছে। আমরা অবান্তর ও অবাস্তব বস্তুর সম্ভাবনার দাবিকে যথার্থ মনে করতে পারি না। বহুদিন পর্যন্ত জলমগ্ন মানুষটিকে দরিয়ার একটি পাথর কণা নিক্ষেপ করে জীবিত করা কেবল অতিস্বাভাবিক কার্যই নয়, বরং অবাস্তব। অতিস্বাভাবিকতার সম্ভাবনাকে বৈধ ও যথার্থ বলার মানে এ নয় যে, এ ধরনের কল্পিত কাহিনীসমূহকেও শুদ্ধ বলে পরিগণিত করতে হবে।

মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) নুবুওয়াত

"তিনি (আল্লাহ্) অজ্ঞদের মাঝে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত পাঠ করেন এবং তাদের পরিশোধিত করেন।" (আল্-কুরআন)

সাধারণ নুবুওয়াতের হকিকত জ্ঞাত হওয়ার পর নবীজীর নুবুওয়াতের ব্যাপারটা এমনিতেই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠার কথা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নবীর হকিকত কয়েকটি বিষয়ের সংযোগ সাধনেরই নামান্তর ঃ স্বয়ং নবীকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে হবে এবং অন্যান্যদেরকেও পূর্ণতাপ্রাপ্ত করে তোলার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকতে হবে; তাঁর বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জিত হবে না, বরং তা হবে আল্লাহ্ প্রদত্ত। এসব গুণ যেভাবে পূর্ণ মাত্রায় রসূল করীমের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তার নজীর পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত কারো মধ্যে দৃষ্ট হয় নি।

চিন্তা করে দেখুন, যিনি কোন প্রকার প্রকাশ্য ও প্রচলিত শিক্ষা-লাভ করেন নি, চোখ খুলে চারদিকে মূর্তিপূজা ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি, যাঁর কানে নাকাড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই বাজে নি, যিনি আল্লাহ্‌তত্ত্ব, নৈতিকতা, সামাজিকতা এবং তহযীব-তমদ্দুন সম্পর্কে এমন সূক্ষ্ম শিক্ষা দান করেছেন, যা কোন দার্শনিক, বিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ, এমনকি অন্যান্য নবীর পক্ষেও সম্ভব হয় নি, যিনি অজ্ঞতা, বর্বরতা, জোর-জুলুম, পাপাচার ও রক্তপাতে লিপ্ত জাতির মনে পবিত্রতা ও সত্যতার রুহ ফুঁকে আকস্মিক বিপ্লব সাধন করেছেন, তিনিই মুহম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)। তিনি ছাড়া এমন কাজ আর কে করতে পারে ?

চিন্তা করুন, রসূল করীমের আবির্ভাবের সময় সারা দুনিয়ায় কি অবস্থা বিরাজমান ছিল ? হিন্দুরা ও মিসরীয়গণ শত শত খোদা ও অবতারে বিশ্বাস করতো; খ্রীস্টানেরা ত্রিত্ববাদের সমর্থক ছিল; সায়েবীন সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজক ছিল; অগ্নিপূজকেরা 'ইয়ায্দান্' ও

'আহ্রিমাম'—এই দুই খোদার বিশ্বাসী ছিল ; ইহুদী তওহীদের সমর্থক ছিল, কিন্তু তারা যে খোদা মানতো, তা ছিল মানুষের সমকক্ষ বা তার চাইতেও নিকৃষ্ট। আরববাসীরাতো আল্লাহ্র অস্তিত্বই মানতো না, আর মানলেও এমন আল্লাহ্ মানতো, যা হতো অসংখ্য কন্যার (ফেরেশতার) অধিকারী। অনেক সম্প্রদায় রোজ রোজ স্বতন্ত্র আল্লাহ্ মানতো।

মানুষের চতুষ্পার্শে যে সব ধ্যান-ধারণা বিরাজ করে বা যে সব ঘটনা ঘটে থাকে, সেগুলোর প্রতিচ্ছবিই তার মনে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মানুষের স্বভাব হলো, সে তার চতুষ্পার্শস্থ ভাবধারাকে রদবদল ক'রে একটি স্বতন্ত্ররূপে রূপায়িত করে। এখন চিন্তা করুন, সাধারণ মানুষের স্বভাব মাফিক যদি মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্র (সঃ) মনেও আল্লাহ্র প্রচলিত ধারণা উদিত হতো, তবে তা এমনি ধরনের চিত্র হতো, যা সে সময়কার লোকের মনে অংকিত ছিল। কিন্তু তিনি (রসূল করীম) যে আল্লাহ্র চিত্র মানুষের মনে বিধৃত করেন, তা ছিল ভিন্ন ধরনের ; সে আল্লাহ্ ছিল একক, যাঁর সত্তা ও গুণাবলীর সংগে মানুষের গুণাবলীর কোন মিল নেই। তাঁর বর্ণিত আল্লাহ্ জমিনেও থাকেন না, আকাশেও থাকেন না, উপরে, নীচে, ডানে, বামে বা নির্দিষ্ট কোন স্থানে তিনি নেই, বরং রয়েছেন সর্বত্র। তিনি কণা-অনুকণা সবই জানেন, পিঁপড়ার পায়ের আওয়াজও তিনি শুনতে পান। তিনি আমাদের মনের গোপনীয় কথা জানেন। এত পবিত্র, এত পূর্ণতাপ্রাপ্ত, এত উচ্চ সত্তার অধিকারী আল্লাহ্র ধারণা কোন মানুষে দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ্ই এ ধারণা কারো মনে উদিত করতে পারেন, যিনি এসব ঐগুণে ভূষিত।

রসূল করীম তওরাত ও ইনজীল শিক্ষা করেছেন—খ্রীস্টানদের এ দাবি সত্য নয়

রসূল করীম শিক্ষিত ছিলেন, তিনি তওরাত ও ইনজীল জানতেন এবং জরজীস নামক জনৈক খ্রীস্টানের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন—এ বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য খ্রীস্টানেরা খুবই চেষ্টা করেন। যদি এটা যথার্থ হতো, তবে রসূল করীমের পক্ষে উপরিউক্ত গুণে গুণান্বিত আল্লাহ্র ধারণা দেওয়া একান্ত মুশকিল হয়ে পড়তো। কেননা সে সময়কার তওরাত ও ইনজীলের একজন খ্রীস্টান শিক্ষক তাঁকে

সে আল্লাহ্‌র শিক্ষাই দিতে পারতেন, যা তাঁর (শিক্ষকের) ধারণা মোতাবেক ছিল। বিখ্যাত ফরাসী জ্ঞানী ক্যাণ্ট হেন্‌রী তাঁর 'ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে বলেন ঃ

"যে সব ভাষ্যে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, মুহম্মদ খৃীস্টান, ইহুদী ও নক্ষত্রপূজকদের নিকট থেকে সামনাসামনি ধর্মীয় বিশ্বাস শিক্ষা করেছেন, সেগুলোর সন্ধান পাওয়া গেলে উপকার হবে। কেননা তাতে প্রতীয়মান হবে যে, কোন্ কোন্ স্থানে কুরআন ও ইনজীলের আয়াতসমূহে ভাবের ঐক্য রয়েছে। তথাপি বলতে হয় যে, এটা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর আলোচনা। কারণ যদিও এটা মেনে নেওয়া হয় যে, কুরআন অন্যান্য ঐশ গ্রন্থ থেকেই গৃহীত, তথাপি তাতে এ প্রশ্নের সমাধান হয় না যে, মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে এই ধর্মীয় প্রেরণা কি করে সৃষ্টি হলো এবং তওহীদের প্রতি তাঁর মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস কি ক'রে জন্মালো? এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর দেহ ও আত্মাকে পুরোপুরি ঘিরে রেখেছিল।"

এ লেখক একটু অগ্রসর হয়ে বলেন ঃ

"তওরাত ও ইনজীল অধ্যয়নের ফলেই মুহম্মদের মনে এ বিশ্বাস শিকড় গজিয়েছিল—এ কথা মোটেও ভাবা যায় না। তিনি যদি এসব গ্রন্থ পাঠ করতেন, তবে তা ছুঁড়ে ফেলতেন। কেননা এসব গ্রন্থ ছিল তাঁর স্বভাব, অভিজ্ঞান ও রুচিবিরুদ্ধ। তিনি তাঁর ভাষা দিয়ে যে বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন, তা ছিল তাঁর জীবনের সব চাইতে বড় অভিব্যক্তি। এতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন সত্য রসূল এবং শান্তিবহ পয়গাম্বর।"

এখন আমি বিস্তারিতভাবে দেখাতে চাই যে, রসূল করীম ওহীর মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাস, উপাসনা, নৈতিকতা ও সামাজিকতা সম্পর্কে যে সব নীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তা এত পূর্ণাঙ্গ ও এত উচ্চমানসম্পন্ন ছিল যে, কোন দার্শনিক বা আইনজ্ঞের মনেই তা উদিত হয় নি এবং ওহীর সাহায্য ছাড়া কারো মনে সে সব ধারণা উদিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না।

ধর্মীয় বিশ্বাস

(আকায়েদ)

এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রশ্ন হলো—মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও ইজতেহাদ ক'রে ধর্মীয় বিশ্বাস স্থির করবে, নাকি অন্যান্যদের অনুকরণ ক'রে? ইসলামের পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে ধর্ম-বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া অন্য সবাইকে এ ব্যাপারে অনুকরণ করতে হতো। খৃস্টানদের মধ্যে পোপ, ইহুদীদের মধ্যে ইহুদীপণ্ডিত (আহ্বার), অগ্নিপূজকদের মধ্যে পুরোহিত (দস্তুর) এবং হিন্দুদের মধ্যে ঋষি ছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদিতে কিছু বলার অধিকার আর কারুরই ছিল না। সর্বসাধারণ লোক এ বিষয়ে স্বাধীন মত পোষণ করতে পারতো না।

ইসলাম এ ধরনের অনুকরণকে 'শির্ক্' বলে অভিহিত করলো এবং ঘোষণা করলো:

"খৃস্টান ও ইহুদীরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত (আহ্বার) ও পাদ্রীদেরকে আল্লাহ্-তে পরিণত করেছে।"

(আল্ কুরআন)

ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুকরণ করা শির্ক্

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আহ্লে কিতাবগণ বিস্ময় সহকারে বলতে আরম্ভ করলো: আমরা আহ্বার (ইহুদী ধর্ম-নেতা) ও পাদরীদের কি করে আল্লাহ্-তে পরিণত করলাম? রসূল করীম উত্তরে বললেন: তোমাদের বিশ্বাস হলো: পাদরিগণ যে বস্তুকে হালাল মনে করেন, তাই হালাল হয়ে যায়, আর তাঁরা যে বস্তুকে হারাম বলে ঘোষণা করেন, তাই হারামে পরিণত হয়।

এ বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন:

"হে মুহম্মদ, আপনি আহ্লে কিতাবদের বলুন—আপনারা এমন একটি কথায় সায় দিন, যা আমাদের ও আপনাদের মধ্যে সাধারণ-

ভাবে গ্রহণযোগ্য। সে কথাটি হলো—আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা না করি, আল্লাহ্র সংগে আর কাউকে শরিক না করি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে একে অন্যকে যেন প্রভুতে পরিণত না করি।"

ধর্মীয় বিশ্বাসের বেলায় ইসলাম পূর্ণ আজাদী দান করেছে। রসূল করীমের সাহাবাদের মধ্যে যদিও মর্যাদার দিক থেকে সকল ব্যক্তি একই পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না, বরং একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষেত্রে কেউ কারো অনুকরণ করতেন না। বরং প্রত্যেকেই নিজ বিবেক বুদ্ধি অনুসারে কাজ করতেন। পরবর্তী সময় ইসলামের অবনতি ঘটলে মুসলমানদের মধ্যে অনুকরণের অভ্যাস দেখা দেয়। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষেত্রে এ অনুকরণ স্থান পায় নি। আজও মনে করা হয় যে, ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুকরণ অবৈধ।

ইসলামের এ নির্দেশটি তার জন্মলগ্নের দীর্ঘ এক হাজার বছর পরেই মার্টিন লুথারের মনে জাগে। ধর্মীয় বিশ্বাসের এই স্বাধীন মনোভাব নিয়ে তিনি দুনিয়াকে পোপদের দাসত্ব থেকে রক্ষা করেন। ইওরোপে ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষেত্রে যে আজাদী পরিলক্ষিত হয়, তা বস্তুত ইসলামের এ নির্দেশেরই ফলশ্রুতি।

বিস্তারিত ধর্মীয় বিশ্বাস ঃ

আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলী

ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো—আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলীর বিষয়টি। বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখুন, এমন একান্ত জরুরী বিষয়ে সকল ধর্মাবলম্বী, বলতে গেলে সারা জাহান একটি বড় ভুল ধারণার শিকারে পরিণত ছিল। খ্রীস্টানেরা তিন খোদা মানতো। তারা মনে করতো - তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন রয়েছে। এই যে পরস্পরবিরোধী ধারণা—এটা তাদের জ্ঞানে আসতো না। তারা বলতো—ধর্মীয় বিশ্বাসকে বুঝে নেওয়া জরুরী নয়। মিসরীয় লোকেরা কয়েক কোটি খোদা মানতো।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে ধর্মাবলম্বীদের ভ্রান্তি

পার্সীদের জ্ঞানে এ কথা আসতো না যে, একই আল্লাহ্র হাতে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয় কাজ সাধিত হতে পারে। এ জন্য তারা ভাল ও মন্দের জন্য আলাদা আলাদা আল্লাহ্ স্থির করে নেয়।

হিন্দু ধর্মে কম পক্ষে তিন আল্লাহ ছিল: ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। অবতার ছিল শতে শতে নয়, বরং হাজারে হাজারে। ইহুদীরা অবশ্য এক আল্লাহ্-তে বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা আল্লাহ্র জন্য এমন কতগুলো গুণ নির্ধারণ করেছিল, যাতে তাঁর মহিমা ও মর্যাদা একজন সাধারণ লোকের পর্যায়ে নেমে আসে।

এতো ছিল ওদের অবস্থা, যারা কোন না কোনভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করতো। কিন্তু এমন লোকেরও অভাব ছিল না, যারা সমূলেই আল্লাহ্র অস্তিত্বের বিশ্বাসী ছিল না। এদেরকে বলা হতো 'ধর্মহীন', 'প্রকৃতিবাদী', 'জড়বাদী' ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুনিয়া দিগন্তব্যাপী তিমিরে নিমজ্জিত ছিল। অকস্মাৎ ইসলাম আবির্ভূত হয়ে সমস্ত অন্ধকার, ভুল ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের নিরসন করে দিল। ইসলাম ঘোষণা করলো—আল্লাহ্ এক; তাঁর জন্য কাল, স্থান, দিক, উচ্চতা ও নিম্নতা—এসব কিছুই নেই। ইসলাম আল্লাহ্র পবিত্রতার যে বর্ণনা দিয়েছে, তাতে ইওরোপও বিস্ময় প্রকাশ করেছে। গিবন বলেন: "আল্লাহ্কে স্থান, কাল, দিক, ইংগিত—এসবের উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। সুতরাং তাঁকে বোঝার জন্য আর কি বাকি রয়েছে?"

এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামের এমন একটি ব্যাপক ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যা জড় বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

খাঁটি তওহীদ প্রতিষ্ঠা ও নানাবিধ মূর্তিপূজার উৎখাত সাধন

আল্লাহ্র এই গুণাবলীর উপর ভিত্তি করেই ইসলাম প্রত্যেক প্রকার মূর্তিপূজা উৎখাত করেছে। কেননা আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলাম যে পাকপবিত্র ধারণা সৃষ্টি করেছে, সেটা এমন প্রকৃতির ছিল না যে, তাঁকে কোন একটা রূপে রূপায়িত না করলে মনুষ্য-জ্ঞানে তিনি আসন পেতে পারেন না। হিন্দু, মিসরী, সাবী, রোমান ক্যাথলিক সকল ধর্ম ও সকল দেশের লোকেরা আল্লাহ্র উপলব্ধির জন্য একটি রূপের প্রয়োজন অনুভব করতো এবং এজন্যই তারা মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করতো। ইসলাম ধর্মে শত শত কেন, হাজার হাজার সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ই আজ পর্যন্ত মূর্তিপূজার কথা চিন্তা করে নি। আজ পৃথিবীতে হিন্দু, খ্রীস্টান, পার্সী—সকল ধর্মে প্রগতিভাবাপন্ন লোক জন্মগ্রহণ করছে এবং তারা খাঁটি তওহীদের

দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা যতই প্রসার লাভ করছে, আল্লাহ্ যে অশরীরী ও আকার মুক্ত, ততই তা প্রতিভাত হচ্ছে।

আল্লাহ্কে স্বীকার করে নেওয়ার পর যে প্রশ্নটি দাঁড়ায়, তা হলো—আল্লাহ্র সংগে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক কি করে স্থাপিত হতে পারে? প্রত্যেকটি সম্প্রদায় এ উদ্দেশ্যে একটি মাধ্যম অবলম্বন করে এবং অবতার, দেবতা বা পীরের সাহায্য খুঁজে বেড়ায়। ইসলাম ঘোষণা করলো যে, আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝখানে কোন দেয়াল নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি আল্লাহ্ পর্যন্ত পেঁছিতে পারে এবং নিজের সকল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে পারে। তাঁর দরবারে চেষ্টা, সুপারিশ ও মধ্যস্থতার অবকাশ নেই। তিনি সকলের কাছে রয়েছেন; সকলের আওয়াজ শুনতে পান; সকল মানুষই তাঁর কাছে পেঁছিতে পারে।

"আমি মানুষের ঘাড়ের রগের চাইতেও তার অধিকতর নিকটবর্তী।"

(আল্-কুরআন)

নুবুওয়াত

তওহীদের পরেই হলো নুবুওয়াতের স্থান। এ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী একটি ভ্রান্তি প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকটি দল ও প্রত্যেকটি সম্প্রদায় মনে করতো যে, নবীরা মানুষের অনেক উর্ধ্বে। জোরোয়াস্টার ও হযরত ঈসা (আঃ)-কে হুবহু আল্লাহ্ বা তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে তাদের এ ধারণাই কাজ করেছিল। ইসলাম খুব জোরালো, স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে ঘোষণা করলো যে, নবীরা মোটেই মনুষ্য গণ্ডির বহির্ভূত নয়।

কুরআন মজীদে আছে

"হে মুহম্মদ, আপনি বলুন, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যে, তোমাদের আল্লাহ্ এক।"

"আল্লাহ্র বান্দা সাজতে হযরত ঈসার কোন সংকোচ নেই। হে মুহম্মদ, আপনি বলুন—আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে; এটাও আমি বলছি না যে, অদৃশ্য বিষয়াদি আমি জানি; আবার এটাও দাবি করছি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমি কেবল আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত ওহীরই অনুসরণ করছি। হে মুহম্মদ, আপনি বলুন—আমি যদি অদৃশ্য বিষয়সমূহ জানতাম, তবে আমার অনেক উপকার সাধিত হতো।"

পৃথিবীতে যত ধর্ম বিগত হয়েছে, তন্মধ্যে সব কয়টিই আল্লাহ্ ও নবীকে একই স্তরে উপনীত করেছে, অথবা নবীকে আল্লাহ্‌র কাছাকাছি নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে ইসলামের কৃতিত্ব হলো—তা উভয়ের সীমারেখাকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছে।

খুব চিন্তা করে দেখুন, আমরা মুসলমান। আমরা রসূল করীমকে নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। তা সত্ত্বেও হযরত ইব্রাহীমকে 'খলীলুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র বন্ধু), হযরত মূসাকে 'কলীমুল্লাহ্ (আল্লাহ্-সম্ভাষিত), হযরত ঈসাকে রুহুল্লাহ (আল্লাহ্‌র আত্মা) বলে অভিহিত করি এবং মুহম্মদ (সঃ)-কে রসূলুল্লাহ (আল্লাহ্ প্রেরিত) বলে আখ্যায়িত করি। শুধু এটাই নয়, নামাযে যখন শাহাদত্ (সাক্ষ্য) এর কথা উচ্চারণ করি, তখন রিসালতের প্রতি স্বীকারোক্তি করার পূর্বেই 'আব্দুহু' (তাঁর বান্দা) শব্দটি উচ্চারণ করি এবং বলি—"আশ্হাদু–আন্না-মুহাম্মাদান আব্দুহু-ও-রাসূলুহু।"—অর্থাৎ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (সঃ) প্রথমত আল্লাহ্‌র বান্দা, এর পরবর্তী পর্যায়ে তিনি হলেন আল্লাহ্‌র রসূল। এরূপ কেন বলি? তার কারণ হলো, আল্লাহ্‌র একত্বের পূর্ণতা হলো—তাঁর সামনে কোন মানুষ যেন মনুষ্য-স্তরের উর্ধ্বে না উঠে, সে মানুষটি যতই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হোক না কেন। রসূল করীমের কাজ ছিল মানুষের মনে খাঁটি তওহীদ প্রতিষ্ঠিত করা। এজন্যই তিনি সাদাসিধেভাবে বান্দা এবং রসূল বলে আত্মপরিচয় দেন।

শাস্তি ও প্রতিদান

পরকাল, শাস্তি, পুণ্য ও প্রতিদান সম্পর্কে সকল ধর্মাবলম্বীদের এ ধারণা পূর্বেও ছিল আর এখনো রয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে না চললে তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু দুনিয়া কর্ম-ক্ষেত্র বলে এখানে তাদের শাস্তি দেওয়া হয় না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ যখন বিচারের আসনে বসবেন, তখন তাদের সমস্ত ব্যাপার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। সেদিন তিনি প্রত্যেকের কর্মানুসারে অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেবেন। এমনিভাবে অনুগত লোকেরাও তাদের আনুগত্যের পুরস্কার লাভ করবে।

এ ধারণাটি মানুষের মনের সংগে খাপ খায়। সাধারণ লোকদের ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এর চাইতে উত্তম পন্থা আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু শাস্তি ও পুণ্যের এটা আসল হকিকত নয়। এ দু'টোর আসল স্বরূপ বোঝাবার একটি সহজ উপায় আছে। তা হলো জড় পদার্থে যেমন 'কার্য-কারণ-শৃঙ্খল' রয়েছে, যথা বিষ পান হত্যা ডেকে আনে, গোলাপ-জল সর্দি ডেকে আনে, তৈলাক্ত খাদ্য দাস্ত ঘটায়, তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও রয়েছে। ভাল-মন্দ যত কাজ আছে, আত্মার উপর প্রত্যেকটির ভাল বা মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ভাল কাজে আত্মা উৎফুল্ল হয়, আর মন্দ কাজে সংকোচ, দ্বিধা ও অপবিত্রতা সৃষ্টি হয়। এগুলো এমন ফলাফল, যা কার্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি কারো কিছু মাল চুরি করেছে। এখন মালের মালিক যদি চুরির অপরাধ ক্ষমা করেও দেয়, তবুও চুরি করার ফলে চোরের ইজ্জতে যে ব্যত্যয় ঘটেছে, তা কোন রকমেই বিদূরিত হতে পারে না। মোট কথা, ভাল কাজের ফলে আত্মায় সৌভাগ্যের যে ছাপ অংকিত হয় এবং মন্দ কাজের দরুন দুর্ভাগ্যের যে করাল ছায়া প্রতিফলিত হয়, সেটাকে বলা হয় শাস্তি ও পুণ্য, আর এগুলো হলো মানুষের কার্যাবলীর অপরিহার্য ফল। ইমাম গাযালী 'আল-মাদ্‌নূনু আলা গায়রি আহ্‌লিহী' গ্রন্থে বলেন ঃ

আদেশ-নিষেধ অমান্য করার ফলে যে শাস্তি হবে, তার মানে এ-নয় যে, আল্লাহ্ রুষ্ট হবেন এবং প্রতিশোধ নেবেন। বরং এর দৃষ্টান্ত হলো এমনি ধরনের, যেমন—যে ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করবে না, তার সন্তানাদিও হবে না। আনুগত্য ও অবাধ্যতার ফলে কেয়ামতের দিন যে পুণ্য বা শাস্তি হবে, তার অর্থও এমনি ধরনের। সুতরাং গুনাহ্ করলে কেন শস্তি হবে—এ প্রশ্নটি হলো এমনি ধরনের, যেমন কেউ বললো : বিষ খেলে যে কোন প্রাণী মারা যায় কেন ?

ইমাম গাযালী এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন যে, কোন কার্যের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ দেওয়া বা কোন কার্য থেকে বিরত রাখার ব্যাপারটা হলো এমনি ধরনের, যেমন একজন চিকিৎসক কোন রোগীকে ঔষধ সেবনের ও ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়ে থাকেন। এখন রোগী যদি চিকিৎসকের কথানুযায়ী না চলে, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এ ক্ষতির কারণ হলো—রোগী খাওয়া-দাওয়ায় সতর্কতা অবলম্বন করে নি। কিন্তু সাধারণ লোক বলবে—রোগী চিকিৎসকের কথা মান্য করে নি বলেই তার এ অহিত ঘটেছে। অথচ অহিতের মূল কারণ হলো পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন না করা। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসক যদি রোগীকে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি সতর্কতা

অবলম্বনের আদেশ নাও দিতেন, তবুও অসতর্কতার দরুন তার অহিত নিশ্চয়ই ঘটতো। এমনিভাবে আল্লাহ্ যদি মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ নাও দিতেন, তথাপি এ সব পাপাচারের দরুন তার আত্মাকে কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করতেই হতো।

নাস্তিকেরা প্রশ্ন করে থাকে, মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র কী লাভ? শাস্তি বা প্রতিশোধ কেবল সে ব্যক্তিই দেয় বা নিয়ে থাকে, যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা যার ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা থাকে। আল্লাহ্ এসবের ঊর্ধ্বে। সারা পৃথিবীও যদি পাপাচারে নিমগ্ন হয়, নামায-রোযা কিছুই না করে, তাতে আল্লাহ্‌র কি আসে যায়? এমতাবস্থায় প্রতিশোধ নিয়ে তাঁর কী লাভ?

নাস্তিকেরা আরো ব'লে থাকে, বস্তুত প্রত্যেক ধর্মের লোকেরাই মানবোচিত চিন্তাধারার আলোকে আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করে থাকে। তারা দেখতে পায় যে, দুনিয়াতে বাদশাগণ রায়তের অবাধ্যতায় ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তারা দোষীকে ভীষণ শাস্তি দেয়। এজন্য ধর্মাবলম্বীরাও আল্লাহ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে এবং বলে যে, তিনি পাপের দরুন অসন্তুষ্ট হন এবং কেয়ামতের দিন পাপীদের দোজখে নানাবিধ শাস্তি দেবেন।

কিন্তু শাস্তি ও পুণ্যের যে হকিকত আমি বর্ণনা করেছি, সে বিষয়টির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখা হয়, তবে নাস্তিকদের এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

শাস্তি ও পুণ্য সম্পর্কে ইসলাম সাধারণভাবে ঐ নীতিই অবলম্বন করেছে, যা পূর্ববর্তী সকল ধর্মের লোকেরা করেছিল এবং সর্বসাধারণের জন্য সেটাই ছিল অপরিহার্য। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তা হলো—পরিষ্কারভাবেই হোক, আর ইঙ্গিতেই হোক, ইসলাম শাস্তি ও পুণ্যের আসল হকিকত বর্ণনা না করে ক্ষান্ত হয় নি। এ বৈশিষ্ট্যই ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের উপর স্থান দিয়েছে। অন্যান্য ধর্মে কেবল জনসাধারণের শিক্ষা ও হেদায়তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শাস্তি ও পুণ্যের আসল হকিকত ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাগণও হয়তো জানতেন না। আর জেনে থাকলেও বিশিষ্ট লোকদের তা শিক্ষা দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। পক্ষান্তরে, ইসলাম এসেছে সারা দুনিয়ার হেদায়তের জন্য। এ গণ্ডিতে বিদ্বান, মূর্খ, বোকা, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, দরবেশ, সুফী, প্রকাশ্যবাদী, বিজ্ঞানী—সব শ্রেণীর লোকই রয়েছে।

শাস্তি, প্রতিদান ও পরকালের প্রকৃত স্বরূপ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কোথাও ইঙ্গিতে, আবার কোথাও পরিষ্কার ভাষায় পরিলক্ষিত হয়ঃ

"হাঁ, তোমাদের যদি নিশ্চিত জ্ঞান থাকতো, তবে তোমরা চাক্ষুষ-ভাবেই দোজখ দেখে নিতে।" ইমাম গাযালী 'জওয়াহিরুল কুরআন' গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

অর্থাৎ দোজখ তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।"

কুরআনের অন্য এক স্থানে আছেঃ

"কাফেরগণ আপনাকে বলছে—শাস্তি তাড়াতাড়ি আসুক! অথচ দোজখ এদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।"

ইমাম গাযালী এ আয়াত সম্পর্কে 'জওয়াহিরুল কুরআন' গ্রন্থে বলেনঃ

"আল্লাহ্ এ কথা বলেন নি যে, দোজখ তাদেরকে ভবিষ্যতে ঘিরে রাখবে বরং এ কথা বলেছেন যে, এক্ষনি ঘিরে রেখেছে।"

অন্যত্র কুরআনে আছেঃ

"আমি জালিমদের জন্য এমন আগুন সৃষ্টি করে রেখেছি, যার ঘোমটা তাদের ঘিরে রেখেছে।"

ইমাম গাযালী এ সম্পর্কে বলেনঃ

"আল্লাহ্ এ কথা বলেন নি যে, ভবিষ্যতে ঘিরে আসবে, বরং এ কথাই বলেছেন যে, এক্ষনি ঘিরে রেখেছে।"

এ সব আয়াতের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর ইমাম গাযালী বলেনঃ

তোমরা যদি কুরআনের অর্থ এমনিভাবে না বুঝতে পার, তবে তোমাদের হাতে আসবে কেবল তার খোসাটুকু, যেমন চতুষ্পদ জন্তুর কাছে এসে পৌছে কেবল গমের ভুষিটুকু।"

উপাসনা (ইবাদত)

এ বিষয়ে সকল ধর্মই ভুল করে আসছে এবং এক প্রকার নয়, সেগুলো নানাবিধ ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছে।

অন্যান্য ধর্মের উপাসনা সংক্রান্ত ভ্রান্তি

সব চাইতে বড় ভ্রান্তি হলো—সাধারণত মানুষ মনে ক'রে থাকে যে, উপাসনাটাই উদ্দিষ্ট বস্তু। কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেই উপাসনা করা হয়। মনে করুন, কোন এক বাদশা তাঁর চাকরের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করছেন। তাই

তিনি আদেশ দিলেন, চাকরটি যেন সারা রাত এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এতে বাদশারও কোন লাভ নেই, চাকরটিরও কোন লাভ নেই। একমাত্র উদ্দেশ্য হলো—চাকরটির আনুগত্য পরীক্ষা করা। এমনি-ভাবে আমরা যে নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ করি—এসবের উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা। আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন, তা আমরা পালন করেছি। আমরা যতই কষ্ট করি, আল্লাহ্ ততই খুশী হন। মাস মাস ধরে পানাহার বন্ধ করা, এক পায়ের উপর সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকা, হাতকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে তা শুষ্ক করে ফেলা, শীতকালে অনাবৃত দেহে খোলা আকাশ-তলে নিদ্রা যাওয়া, চল্লিশ দিন একাধারে উপাসনায় মগ্ন থাকা, বিয়ে-শাদী না করা, সারা জীবন সন্ন্যাসীবেশে যাপন করা—এ ধরনের যেসব মনোভাব হিন্দু, খ্রীস্টান ও অন্যান্য ধর্মে দেখা যায়, সে সবের ভিত্তি হলো উপাসনার উক্ত ব্যাখ্যা ও ভাবধারার উপর।

উপাসনার এই ধারণা এক সময় এত চরমে উঠেছিল যে, মানুষ নিজেকে কোরবানী করতেও প্রস্তুত ছিল। নিজেদের সন্তান-সন্ততিকেও তারা কোরবানী করতো।

আসল কথা হলো—মানুষের মনে সে সব ধারণাই উদিত হয়, যা তার চতুষ্পার্শ্বে বিরাজ করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—এমন কোন বস্তুর ধারণা মানুষ করতে পারে না। সে যা দেখে বা শোনে, সেটাকেই বাড়িয়ে-কমিয়ে, রদ-বদল ক'রে উন্নত আকারে প্রকাশ করে। কিন্তু কোন মৌলিক বস্তু সে স্বয়ং সৃষ্টি করতে পারে না।

মানুষের মনে আল্লাহ্‌র ধারণা স্থান লাভ করেছে একজন সর্ব-শক্তিমান সম্রাটরূপে। তাই সম্রাটের যে প্রকৃতি বা মনোভাব থাকে, সে নিরিখেই মানুষ তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করে। মানুষ রাজা-বাদশাদের যেভাবে দেখেছে, বা শুনেছে, সেভাবেই তাদের সম্পর্কে তার ধারণা জন্মেছে। মানুষ জানে যে, রাজা-বাদশা আনুগত্য প্রকাশে সন্তুষ্ট হন, প্রাণ উৎসর্গ করার সংকল্প জ্ঞাপন, আদব, বিনয় ও সম্মান প্রদর্শনকে তাঁরা পছন্দ করেন। এসব খেদমত যে যত বেশী সম্পন্ন করতে পারে, সে ততই রাজকীয় পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জন করে। এসব চিন্তাধারার নিরিখেই মানুষের মনে আল্লাহ্‌র উপাসনা-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা উদিত হয়। এজন্যেই প্রত্যেক ধর্মে যত প্রকার

ইবাদত রয়েছে, তাতে এ নীতিটাই ফুটে উঠেছে। এর উপর ভিত্তি করেই ইওরোপের নাস্তিকেরা বলে থাকে যে, মানুষ নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের ধর্মীয় ভাবধারা সৃষ্টি করে নিয়েছে। ইওরোপের বর্তমান দার্শনিকগণ স্বাভাবিক ধর্মের মূলনীতি ও আনুষঙ্গিক নীতি নির্ধারণের সময় ইবাদতের স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাঁরা ইবাদতের যথার্থতা যাচাই করার জন্য চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন ঃ

১. মানবজীবনে যত কর্তব্য আছে, যেমন জীবিকা অর্জন, সন্তানাদির প্রতিপালন, দেশপ্রেম—এ সবকে ইবাদতের মধ্যে গণ্য করা হোক !

২. ব্যবহারিক ধর্ম যেমন নামায, রোযা ইত্যাদিকে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বলে গণ্য না করা উচিত।

৩. কোন উপাসনাই মানবশক্তি বহির্ভূত হবে না।

৪. এটা মনে করতে হবে যে, উপাসনায় আল্লাহ্‌র কোন উদ্দেশ্য নেই। এতে লাভ রয়েছে আমাদেরই !

দুনিয়া এখন উন্নত স্তরে পদার্পণ করেছে ; স্বভাবের সুপ্ত রহস্য-রাজির দ্বার বর্তমানে পুরোপুরি উন্মোচিত হয়েছে। দুনিয়ার এতগুলো ধাপ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই ইওরোপ মানুষকে উপাসনার এই নীতিগুলো শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে। অথচ ইসলাম তেরশ' বছর পূর্বেই এই রহস্যের কথা শুনিয়েছিল। সর্বপ্রথম ইসলামই ঘোষণা করলো যে, বান্দার ইবাদতে আল্লাহ্‌র কোন উদ্দেশ্য নেই।

কুরআন মজীদ বলে ঃ

"যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে, সে নিজের জন্যেই করে। আল্লাহ্ জগদ্বাসীর কাছে মুখাপেক্ষী নন।"

ইবাদতের নীতি বর্ণনার পর বলা হয়েছে যে, ইবাদতে মানুষেরই লাভ হয়। আল্লাহ্ মানুষের হিতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইবাদতের আদেশ দিয়ে থাকেন। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে, সে নিজ মঙ্গলের জন্যেই তা করে থাকে। আর যদি মন্দ কাজ করে, তবে তার কুফল বর্তাবে তারই উপর। তোমাদের কষ্ট হবে, এমন কোন কার্য আল্লাহ্ ধর্মের

অঙ্গীভূত করতে চান না। বরং তোমাদের পরিশুদ্ধ করতে এবং পূর্ণ নে'মত দিতে তিনি ইচ্ছুক।"

অতঃপর আল্লাহ্ প্রত্যেক উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফল ও মঙ্গল বর্ণনা করেন। নামায সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"নামায লজ্জাকর ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

রোযা সম্পর্কে বলেন ঃ

"খুব সম্ভব তোমরা (রোযা পালনে) আল্লাহ্‌ভীরুতা অবলম্বন করবে।

হজ্জ সম্পর্কে বলেন ঃ

"তাহলে তোমরা যেন নিজেদের লাভজনক স্থানে উপস্থিত হতে পার।"

যাকাতের উপকারিতা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

এ সবের সঙ্গে এ বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, শরীঅতের কোন বিধান যেন সীমারেখা ছাড়িয়ে না যায় এবং তার সম্পাদনে যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমাদের পক্ষে যা কঠিন নয়, বরং সহজ, আল্লাহ্ তাই তোমাদের জন্য করতে চান। তিনি এটাও চান না যে, ধর্মে এমন কোন বিধান রাখা হোক, যা সম্পন্ন করা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর। তিনি তোমাদের বোঝা লাঘব করতে চান। তিনি কাউকে তার শক্তি বহির্ভূত কার্যের জন্য কষ্ট দেন না।"

এর চাইতে মোক্ষম কথা হলো –আল্লাহ্ মানব জীবনের প্রত্যেকটি জরুরী কাজকে ইবাদতরূপে গণ্য করেন এবং তা সম্পন্ন করার জন্য তাগিদও করেন। বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র দান (রিযিক) অনুসন্ধান কর।"

বিশিষ্ট উম্মতের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ কুরআন মজীদে সন্তান লাভের কামনাকে সৎ ও আল্লাহ্ প্রিয় লোকের বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেন ঃ

"আর যাঁরা বলেন, হে আল্লাহ্, আমাদের চোখ জুড়াতে পারে, এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর।"

সকল সাহাবীই ছিলেন ইসলামের নিখুঁত ছবি। তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের জরুরী কার্যাবলী সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করাকে ইবাদত বলে মনে করতেন। আজও মুসলমানেরা মনে করে যে, সাহাবীদের চলাফেরা, পানাহার, বিয়ে-শাদী ও পারিবারিক কাজকর্ম সমাধা করা—এ সবই ছিল ইবাদত। আসল কথা হলো—এ মঙ্গল সাধন সাহাবীদের জন্য খাস নয় অর্থাৎ এই পুণ্য অর্জন সাহাবীদের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেকটি মানুষের এরূপ কাজকর্ম ইবাদত, যদি তা এমনিভাবে করা হয়, যেমন সাহাবিগণ করেছিলেন।

মানবাধিকার

বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের যে সামাজিক সম্পর্ক থাকে, তাই তার উপর কতগুলো কর্তব্য আরোপ করে। এই কর্তব্য-গুলোই হলো নৈতিকতা, আইন ও তহযীব-তমদ্দুন নীতির বুনিয়াদ। পৃথিবীর সব ধর্মেই এ সব কর্তব্যের মোটামুটি আলোচনা হয়েছে। তবে এ আলোচনা ছিল নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। কোন কোন ধর্ম অবশ্য এর গণ্ডিকে আরো কিছুটা প্রশস্ত করেছিল। তারা বিয়ে-শাদী, উত্তরাধিকার, অসিয়ত ইত্যাদিকেও নিজেদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এ সব মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক এত জটিল ও সূক্ষ্ম ছিল যে, সেগুলো নির্ধারণ করতে গিয়ে তাদেরকে অনেক ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হতে হয়। এ সব বিষয়ে ইসলাম যে সূক্ষ্ম দর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, কোন ধর্ম বা দার্শনিকের মতবাদে তার নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। এতেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম যা কিছু দিয়েছে, তা হলো আল্লাহ্-প্রদত্ত ও ওহী প্রাপ্ত। তা না হলে যে সব সূক্ষ্ম বিষয়ের সমাধান বড় বড় দার্শনিক ও দিতে সক্ষম হলেন না, মরু আরবের একজন নিরক্ষর লোক তা কি করে সম্ভব করে তুললেন?

মানবাধিকারের প্রাথমিক প্রশ্ন হলো মানুষের নিজের উপর তার কি পরিমাণ অধিকার রয়েছে? ইতিহাস পাঠে যতটুকু জানা যায়, সারা পৃথিবীতে এটা একটি সমর্থিত বিষয় ছিল যে, প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজ প্রাণের অধিকারী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আত্মহত্যা কোন অপরাধ বলে গণ্য হতো না। গ্রীসের বড় বড় দার্শনিক আত্মহত্যা

বৈধ বলে মনে করতেন। এমন কি সে দেশের কোন কোন প্রখ্যাত দার্শনিকও আত্মহত্যা করেছিলেন।

আত্মহত্যা

সর্বপ্রথম কুরআন মজীদই আত্মহত্যার বিষয়টি তুলে ধরে এবং তা নিষিদ্ধ করে। আল্লাহ্ বলেন:

"তোমরা আত্মহত্যা করো না।"

ইসলাম আত্মহত্যার বিলোপ সাধন করেছে

আত্মহত্যার ব্যাপারটি সন্তানের আত্ম অধিকারের উপর চরম বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। মানুষ বস্তুত তার সন্তান-সন্ততিকে নিজ অঙ্গ-রূপেই মনে করে। সেজন্যেই তাদেরকে প্রাণসম ভালবাসে। কিন্তু মানুষ যেহেতু নিজ প্রাণের অধিকর্তা এবং নিজ প্রাণের উপর যে কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার রয়েছে বলে সে মনে করে, সেহেতু নিজ সন্তানের উপর তার তদ্রূপ অধিকার রয়েছে বলেও সে ধারণা করে। এই মনোভাবের ফলেই বিভিন্ন আকারে সন্তান হত্যার প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সারা জাহানে বিভিন্ন আকারে সন্তান হত্যা প্রচলিত ও বৈধ ছিল

ভারতে তহযীব-তমদ্দুন প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরেও সন্তানকে দেব-দেবীর নামে বলি দেওয়া হতো। ভারত ও আরবে কন্যাহত্যা অত্যধিক প্রচলিত ছিল। স্পার্টা ও রোমে কুশ্রী সন্তানকে পথে-ঘাটে ছুঁড়ে ফেলা হতো। অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ন্যায় প্রখ্যাত দার্শনিকও দুর্বল সন্তানকে ধ্বংস করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অ্যারিস্টটল মনে করতেন, বিকলাঙ্গ শিশু লালন-পালনযোগ্য নয়। স্পার্টায় সন্তান জন্ম হলে তাকে জাতির মহৎ ব্যক্তিদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হতো। সন্তান স্বাস্থ্যবান হলে জিন্দা রাখা হতো। তা না হয় টায়জিট্স্ নামক পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলা হতো। অনেক সম্প্রদায়েই এ প্রথা প্রচলিত ছিল। কুরআনই সর্বপ্রথম এই জোর-জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। আল্লাহ্ বলেন:

"নিজ সন্তানকে হত্যা করো না।"

"এবং এমনিভাবে মুশরিকদের সহযোগীরা সন্তান হত্যাকে তাদের নজরে ভাল বলে প্রতিপন্ন করে।"

স্ত্রী জাতির অধিকার

স্ত্রী জাতি মানব জাতির অর্ধাঙ্গ। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে শত শত নয়, বরং হাজার হাজার আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, পৃথিবীতে ইসলামের ছায়া বিস্তারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীজাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

প্রকৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছে। রোমের অধিবাসীরা আইন প্রণয়নে অভিজ্ঞ ছিল। গ্রীসের খ্যাতি ছিল দর্শনের জন্য। ইটালী ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইরানের সৌখিনতা ছিল সর্বজনবিদিত। এমনিভাবে রোম দেশীয় আইন-কানুন সারা পৃথিবীতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত ছিল। রোমার আইন আজও সমগ্র ইওরোপীয় আইন-কানুনের ভিত্তিরূপে কাজ করছে। এই শ্রেষ্ঠ আইন-কানুন স্ত্রী জাতিকে যে অধিকার দিয়েছিল, তা হলো—স্ত্রীর বিয়ের পর সে তার স্বামীর খরিদা সম্পদে পরিণত হতো। তার সমস্ত ধন-সম্পদ এমনিতেই স্বামীর মালিকানাভুক্ত হয়ে পড়তো। সে ধন-সম্পদ যা কিছু অর্জন করতো, সবই স্বামীর সম্পদে পরিণত হতো। সে কোন পদমর্যাদার অধিকারিণী হতে পারতো না। কারো জামিনও সে হতে পারতো না। সাক্ষ্য দেওয়ারও তার অধিকার ছিল না। সে কারো সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারতো না। এমনকি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করার অধিকারও তার ছিল না।

রোমান-ল

রোম দেশ যখন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হলো, তখন রোমান-ল-এর কিছুটা সংস্কার করা হয়। কিন্তু সে সংস্কার ছিল সাময়িক ব্যাপার। কিছুকাল পর তা আবার পূর্ববৎ হয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকের আত্মা আছে কি-না—এ বিষয়টি স্থির করার জন্য ৫৮৬ খৃঃ ইওরোপে একটি বড় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সে অধিবেশন বিশেষ বদান্যতা সহকারে এতটুকু সমর্থন করলো যে, স্ত্রীলোকেরা আদমজাতভুক্ত। তাই তাদেরও আত্মা আছে। কিন্তু তাদের সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো—পুরুষের সেবা করা।

ইংলণ্ডে বহুদিন পর্যন্ত এ ধরনের আইন প্রচলিত ছিল ঃ বিয়ের পর স্ত্রীর অস্তিত্ব স্বামীর অস্তিত্বে পরিণত হতো। সে কোন প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারতো না। তার সমস্ত সম্পদ স্বামীর সম্পদে পরিণত হতো। স্বামী তার ইচ্ছামত তা ব্যয় করতে পারতো। রোমান এ্যাক্ট রচিত হয়েছে—এখনও ত্রিশ বছর হয় নি। এতে যদিও উক্ত আইন-কানুনের সংস্কার সাধিত হয়েছে, কিন্তু এখনো তাতে অনিয়ম রয়েছে।

ইহুদী ধর্মে বিয়ের মানে ছিল স্ত্রীকে সত্যিকারভাবে খরিদ করা। খরিদের বিনিময় মূল্য লাভ করতো স্ত্রীর পিতা।

হিন্দু ধর্মে হুবহু 'রোমান-ল' প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর সম্পদ স্বামী লাভ করতো। স্বাধীনভাবে কোন প্রকার চুক্তি বা লেন-দেন করার অধিকার স্ত্রীর ছিল না। স্ত্রী, কন্যা, মা—এদের কেউই উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন ধন-সম্পদের মালিক হতো না।

আরব দেশ ইসলামের উৎসভূমি। সেখানকার অবস্থা ছিল এই যে, স্ত্রীলোকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুরই অধিকারী হতো না। পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের অধিকারী হতো পুত্র। সে পিতার স্ত্রীদেরকে নিজ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতো। বিবাহের চারটি নিয়ম প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে তিনটি হলো : (১) দুই ব্যক্তি নির্দিষ্ট কালের জন্য পরস্পর আদের স্ত্রীদের বিনিময় করতো। (২) কয়েকজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করতো। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে স্ত্রী লোকটি তন্মধ্যে একজনের কাছে এমর্মে খবর পাঠাতো ঃ তোমার দিক থেকে আমি গর্ভবতী হয়েছি। অতঃপর সে লোকটি সন্তানের পিতা বলে অভিহিত হতো। (৩) কয়েকজন পুরুষ একজন স্ত্রী লোকের সঙ্গে সহবাস করতো। সন্তান প্রসব করলে হাবভাবে চরিত্র নির্ণয়কারী (পিজিয়নমিষ্ট) বলে দিতো যে, অমুক ব্যক্তির বীর্যে এ সন্তানের জন্ম হয়েছে। তদনুসারে সে ব্যক্তিই সন্তানের পিতা বলে সাব্যস্ত হতো। বিবাহের এ তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে 'সহীহ্ বুখারী'তে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা রয়েছে।

ইসলাম স্ত্রী জাতিকে কি কি অধিকার দিয়েছে

এখন দেখুন, কুরআন মজীদ স্ত্রীজাতির জন্য কি করেছে? তবে এর পূর্বে এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, ইওরোপের অধিকাংশ

গ্রন্থকারের মতে, ইসলামের যত বিধি-বিধান আছে, তা অন্যান্য ধর্ম থেকেই গৃহীত; ইসলামী শরীঅতের নিয়ন্তা ইসলামের জন্য নিজের পক্ষ থেকে নতুন কিছুই করেন নি। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে খ্রীস্টধর্ম, ইহুদী ধর্ম ও হিন্দু ধর্মে কিরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, তা আপনারা ইতিপূর্বে পাঠ করেছেন। এখন চিন্তা করে দেখুন, ইসলাম সে সব ধর্মের অনুকরণ করেছে, না-কি স্বয়ং এমন সব দার্শনিক রীতি-নীতি রচনা করেছে, যা কোন দিন কেউ ভাবতেও পারে নি।

কুরআনই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছে যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃতিগত সম্পর্ক রয়েছে। স্ত্রীজাতি মানব সমাজের একটা বিরাট অঙ্গ। তারা পুরুষদের জন্য আরাম ও সান্ত্বনার আধার আল্লাহ্ বলেন :

"এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তাহলে যেন তোমরা তাদের কাছে আরাম পাও। তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহের উদ্রেক করেন।"

অতঃপর ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সমমর্যাদাসম্পন্ন দুইজন বন্ধু, উভয়ই পরস্পর নির্ভরশীল, উভয় দিক থেকে সম্পর্ক সমান, উভয়ের সম্মান ও উভয়ের অধিকার সমান। আল্লাহ্ বলেন :

"স্ত্রীলোকেরা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাকস্বরূপ।"

"স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষদের যেরূপ অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরেও স্ত্রীলোকদের তদ্রূপ অধিকার রয়েছে।"

আত্মীয়তার সকল স্তরে স্ত্রী-পুরুষ একই পর্যায়ভুক্ত। মা ও বাপের মর্যাদা যেমন এক, তেমনি ভাই ও বোনের মর্যাদাও এক। এমনি-ভাবে চাচা ও ফুফুর মর্যাদাও এক। কুরআনে যেখানে পিতার উল্লেখ রয়েছে, সেখানে মায়েরও আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

"এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিও। এদের মধ্যে কেউ যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি রুষ্ট হয়ো না এবং শাসিয়ে কথা বলো না। তাদের সঙ্গে বিনয় সহকারে কথা বলও। তাদের সামনে স্নেহভরে বিনয়ের স্কন্ধ নত করে দাও এবং বল :

আল্লাহ্। তাঁদের উপর রহমত করুন, যেমন তাঁরা ছোটবেলায় (রহমত সহকারে) আমায় লালন-পালন করেছেন।"

মায়ের অধিকার জোরালোভাবে বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন :

"মা সক্লেশে তাকে উদরে বহন করেছে, এবং সক্লেশে তাকে প্রসব করেছে।"

রোম দেশের অধিবাসী ও হিন্দুদের মতে, স্বামী হলো স্ত্রীর মাল-সম্পদের অধিকারী। কিন্তু কুরআন বলে :

"পুরুষেরা যা অর্জন করবে, সেটা তাদেরই, আবার স্ত্রীলোকেরা যা অর্জন করবে, সেটা তাদেরই।"

হিন্দুদের মধ্যে এবং অন্ধ যুগের আরবদের মধ্যেও মেয়েরা উত্তরাধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকতো। কিন্তু ইসলাম ঘোষণা করলো :

"মাতা-পিতা ও আত্মীয়-পরিজনের ধন সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার-সূত্রে যেভাবে পুরুষদের অংশ রয়েছে, তেমনি মেয়েদেরও রয়েছে।"

ইসলাম কন্যা হত্যার প্রথা দূর করেছে এবং এমনিভাবে তা দূর করেছে যে, তেরশ' বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এরূপ একটি ঘটনাও ঘটে নি। কুরআন মজীদ বলে :

"এবং কেয়ামতের দিন যখন জীবিত অবস্থায় সমাহিত মেয়ের নিকট জিজ্ঞেস করা হবে যে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো?"

অন্ধকার যুগে নিয়ম ছিল যে, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হতো, তখন তার ভাই জবরদস্তিমূলকভাবে তার বিধবা পত্নীকে বিয়ে করে নিতো অথবা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রাখতো। কিন্তু তার নিকট থেকে কিছু অর্থ পেলেই তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিতো। ইসলাম এসব প্রথা দূর করেছে। কুরআন বলে :

"জোর-জবরদস্তি স্ত্রীলোকের ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার ফন্দি করা বৈধ নয়। তারা যা পেয়েছে, সেখান থেকে কিছু পাওয়ার আশায় তাদেরকে আটক রেখো না।"

অন্যান্য ধর্মে মেয়ের বিবাহের জন্য যে মহর নেয়া হতো, তা পেতো পিতা। মহরের পরিবর্তে পিতা যেন মেয়েকে বিক্রয় করে দিতো। কিন্তু ইসলাম বললো :

"মেয়েদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের মহর দিয়ে দাও।"

ইসলাম দৈনন্দিন জীবনে মেয়েদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, অনুগ্রহ ও সমতামূলক আচরণ করার শিক্ষা দেয়। কুরআন বলে ঃ

"সামাজিক জীবনে মেয়েদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিও।"

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম ব্যাপার হলো—তালাকের বিষয়টি। সূক্ষ্ম ও মুশকিল বলেই দুনিয়ার সব জাতি এ বিষয়টির সুরাহার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিল। কিন্তু সব-গুলোই ছিল ভ্রমাত্মক। আজ দুনিয়া এতটুকু উন্নতি লাভ করেছে বটে, কিন্তু সে সব গলদ এখনো রয়ে গেছে। খ্রীস্টধর্মে এত কড়াকড়ি রয়েছে যে, ব্যভিচারের অজুহাত ছাড়া কোন অবস্থায়ই তালাক বৈধ নয়। এর ফলেই আজকালকার তহ্যীব-তমদ্দুনের কেন্দ্রভূমি ইওরোপে সব সময় খুব অশোভন ও লজ্জাকর ব্যাপার ঘটে থাকে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রয়েছে ভীষণ মন কষাকষি ও অনৈক্য। এই গরমিল তাদের জীবনকে তিক্ত করে তুলেছে। তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য নেই। দাম্পত্য জীবনের যে মঙ্গল ও উদ্দেশ্য, তা মোটেও নেই। বছরের পর বছর তারা এ মনোকষ্ট নিয়েই দিন যাপন করে। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হলো স্ত্রীর ব্যভিচার প্রমাণ করা। বড় বড় লোক এবং রাজ-সভাসদেরকেও আদালতে নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভি-চারের অভিযোগ আনতে হয় এবং শত শত কেন, হাজার হাজার লোকের সামনেও স্বামীকে এ লজ্জাকর ব্যাপারটি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে হয়। অনেক দিন ধরে বিচারটি চলতে থাকে এবং কাগজপত্র স্তূপীকৃত হয়ে উঠে। এ ব্যাপারটি তাদের লজ্জাহীনতা ও অসম্মানের পরিচয় বহন করে। কিন্তু যে কোন মূল্যে এ সব সহ্য করতেই হয়। কারণ এ লজ্জাহীনতা ছাড়া স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর কবল থেকে রেহাই পাওয়ার আর কোন জো নেই। এ বাবদ হিন্দু আইনও খ্রীস্টানদের ন্যায়।

অন্যদিকে রয়েছে ইহুদী ধর্ম। তাদের এখানে তো কথায় কথায় তালাক দেওয়া বৈধ বরং পছন্দনীয়। খাদ্যের মধ্যে নিমক বেশী হলো অথবা অধিকতর সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেলো, তখনি দ্বিধাহীন চিত্তে তালাক দিয়ে দাও—এটাই ছিল তাদের প্রথা। এখন দেখুন, ইসলাম কিভাবে সমাধান করেছে?

কুরআন মজীদই সর্বপ্রথম বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গিতে ঘোষণা করলো যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্কটি গড়ে তোলা হয়, তা কামাসক্তি বা যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয়, বরং এ সম্পর্কটি হলো সুমধুর জীবন যাপন ও স্থায়ী স্নেহ মমতা প্রতিষ্ঠার জন্য।

কুরআন মজীদ বলেঃ

"কারাগারে থাকার জন্যেও নয়, আবার যৌন উন্মাদনা চরিতার্থ করার জন্যেও নয়।"

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী পয়দা করেছেন। উদ্দেশ্য হলো—তোমরা তার কাছে যেন সান্ত্বনা লাভ করতে পার। তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করেছেন।"

এখন মনে করুন, কোন একজন পুরুষ তার স্ত্রীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট নয়, সে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। এমতাবস্থায় ইসলাম সে পুরুষকে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়। কুরআন বলেঃ

"তোমরা যদি তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) অপছন্দ কর, তবে এটা বিচিত্র নয় যে, তোমরা এমন একটি বস্তুকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ যথেষ্ট মঙ্গল নিহিত রেখেছেন।" (সূরা-ই-নিসা)

স্ত্রীলোককেও আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেনঃ

"কোন স্ত্রীলোক যদি তার স্বামীর ব্যবহারে তাদের মধ্যে অসন্তোষ বা বিমুখতা গড়ে উঠার আশংকা করে, তবে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করা দূষণীয় নয়। মীমাংসা করা মঙ্গলজনক কাজ।"

অতঃপর আল্লাহ স্ত্রীর কুচরিত্র ও রুক্ষ ব্যবহার দূর করার পন্থা বাতলে দেন। কেননা নিত্য নৈমিত্তিক রুক্ষ ব্যবহার একটি অসহনীয় কষ্ট। আল্লাহ্ বলেনঃ

"যাদের মনে নিজেদের স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা রয়েছে, তাদের উচিত, স্ত্রীদের উপদেশ দেওয়া, তাদেরকে শয়নকক্ষে একা থাকতে দেয়া ও হালকাভাবে) প্রহার করা। অতঃপর তারা যদি আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে ছুতানাতা দাঁড় করো না।"

এতেও যদি তাদের মধ্যে ঐক্য ও সন্ধি স্থাপিত না হয়, তবে স্বয়ং স্বামী-স্ত্রীর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই ইসলামের নির্দেশ হলো—এ বিষয়ে কওমের (সমাজের) হস্তক্ষেপ করা, কারণ প্রত্যেকটি

মানুষ নিজ কওমের অঙ্গস্বরূপ। তার কাজকর্মের প্রভাব সমাজের উপর না পড়ে পারে না। এজন্যই আল্লাহ্ জনগণ ও কওমকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আদেশ দেন এবং বলেন ঃ

"তোমরা যদি পারস্পরিক মনোমালিন্যের ভয় কর, তবে স্বামীর খান্দান থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর খান্দান থেকে অপর একজন সালিস নির্ধারণ কর।"

এ উপায়টিও যদি ফলপ্রসূ না হয় এবং স্বামী তালাক দিতে বদ্ধ-পরিকর হয়, তবে এ অনিবার্য অবস্থায় ইসলাম তালাকের অনুমতি দেয়। কিন্তু এর সঙ্গে বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখারও নির্দেশ দেয়।

তালাক-পদ্ধতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্দেশ হলো—তিনমাসে ধারা-বাহিকভাবে তিন তালাক দিতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে এক-একটি তালাক দিতে হবে। শরীঅতের পরিভাষায় এ সময়টিকে 'ইদ্দত' বলা হয়। এ সময়টি নির্ধারণ করার পেছনে উদ্দেশ্য হলো—হয়তো এর মধ্যে পুরুষ ভেবে-চিন্তে তার মতের পরিবর্তন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

"তাদেরকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর যথেষ্ট রয়েছে, যদি তারা মিলনের ইচ্ছা পোষণ করে।"

অতঃপর প্রাসঙ্গিক নীতি নির্ধারণ করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"অতঃপর স্বামী যদি তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার জন্য আর বৈধ থাকে না, যতক্ষণ না সে (স্ত্রী) দ্বিতীয় বিবাহ করে (এবং দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দেয়)।"

এ শর্তটি আরোপ করার উদ্দেশ্য হলো—স্বামী যেন এ কথা মনে করে—আমি যদি তাকে তালাক দেই এবং ভবিষ্যতে আমার মন-মেজাজ অকস্মাৎ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে তাকে পুনরায় পাবার মত আর কোন উপায় থাকবে না। একমাত্র উপায় থাকবে ঃ সে অন্যের অধীনে গিয়ে ফিরে আসবে। এটা স্পষ্ট কথা যে, এরূপ অবমাননা কে সহ্য করতে পারে?

এর সঙ্গে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, তালাক দেওয়া কোন ঘরোয়া ব্যাপার নয়। তাই বিষয়টি কওমের সামনে উপস্থিত করতে হবে এবং সাক্ষ্যও পেশ করতে হবে। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"স্ত্রীলোকেরা তাদের ইদ্দতের শেষ প্রান্তে উপনীত হলে তাদেরকে বিবেকসম্মত উপায়ে গ্রহণ করবে, নতুবা বিবেকসম্মত উপায়ে

তাদের পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়বান লোককে সাক্ষী করবে। তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য করে ঠিকভাবে সাক্ষ্য দেবে।"

এর উদ্দেশ্য হলো 'তালাক" প্রশ্নটিকে যদি সামাজিক বিষয় ধরা হয় এবং তা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-সাবুদেরও প্রয়োজন হয়, তবে যাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, তারা তালাক দিতে খুব কমই প্রস্তুত হবে।

এ সব সত্ত্বেও পুরুষ যদি তালাক দিয়ে বসে, তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই পালন করতে হবে ঃ

"ইদ্দতের সময় স্ত্রীলোকদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না।" (সূরা-ই-তালাক)

"তোমরা যেখানে থাক, যথাসম্ভব তাদেরকে সেইখানেই থাকার ঘর দাও। তাদেরকে হয়রান করার জন্য তাদের ক্ষতি সাধন করো না। তারা যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণ কর। তারা যদি তোমাদের খাতিরে সন্তানকে দুধ খাওয়ায়, তবে তাদের বিনিময় শোধ করে দিও। তোমরা পরস্পর সদ্ব্যবহার করো।"

"তালাক দেয়া স্ত্রীলোকদের প্রচলিত প্রথা মোতাবেক পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। আল্লাহভীরুদের এ কাজ করতেই হবে।"

অনেকে তালাক দিয়ে স্ত্রীকে আটকে রাখতো। তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করার সুযোগ দিতো না। এর পেছনে উদ্দেশ্য থাকতো—স্ত্রীকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া বা তাকে উত্যক্ত করে তার প্রাপ্য পূর্ণ মহর বা আংশিক মহর মাফ করিয়ে নেওয়া। আবার কখনো কখনো এ আটক রাখার পেছনে উদ্দেশ্য হতো স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত রাখা, যেটাকে সে নিজের জন্য লজ্জাকর ব্যাপার বলে মনে করতো। আল্লাহ্ তাআলা এ মনোভাব পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

"যুলুম করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে এরূপ কাজ করলো, সে যেন নিজের প্রতিই যুলুম করলো।" (সূরা-ই-বাকারা)

তালাক দেয়া স্ত্রীলোক যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসবের পর দু'বছর যাবত পুরুষকে তার ভরণ-পোষণ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"পুরুষ যদি দুধ পান করাবার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়, তবে মা সন্তানকে দু'বছর দুধ পান করাবে। তবে পুরুষের উপর দস্তুর মোতাবেক তার খাওয়ানো পরানোর ভার থাকবে।" (সূরা-ই-বাকারা)

অনেকে বিয়ের সময় বেশী পরিমাণ টাকার মহর নির্দিষ্ট করতো। কিন্তু স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তার পক্ষে তা শোধ করা মুশকিল হতো। এজন্য সে বিভিন্ন উপায়ে স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে মহরের পরিমাণ কমিয়ে নিতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা যদি এক স্ত্রী ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও, তবে প্রথমা স্ত্রীকে দেয়া সম্পদ থেকে কিছুই ফেরৎ নিও না। অন্যায় ও পাপের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কি তোমরা তা ফিরিয়ে নিতে চাও? কিভাবে তা নিতে পার? তোমাদের মধ্যে তো দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

এসব বিধি-বিধানের সার কথা হলো—পুরুষের পক্ষে যদি অনিবার্য কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে হয়, তবে তিন মাস সময়ের মধ্যে আস্তে আস্তে এক-একটি করে তালাক দিতে হবে। তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়া নাগাদ অর্থাৎ তিন মাস পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণের ভার ন্যস্ত থাকবে স্বামীর উপর। এর মধ্যে স্ত্রী তার নতুন স্বামী খোঁজ করার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে। স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব নাগাদ এবং তার পরেও দু'বছর পর্যন্ত তার যাবতীয় ভরণ-পোষণের ভার ন্যস্ত থাকবে স্বামীর উপর। এ ছাড়া সে নির্দিষ্ট মহরের পুরো অংকটিও পাবে এবং এমনিভাবে আর্থিক অভাবের দরুন তাকে কোন কষ্ট করতে হবে না।

কোন দার্শনিক বা কোন আইন বিশেষজ্ঞ কি স্ত্রীজাতির জন্য এর চাইতে উৎকৃষ্ট আইন রচনা করতে পারবে? ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার আর কোন ধর্মে কি এত দয়া ও এত সুযোগ-সুবিধার নজীর দেখতে পাওয়া যায়?

উত্তরাধিকার ঃ

যে সব আইন-কানুন সম্পর্কে দুনিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ ছিল, আর এখনো রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো - উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন। খ্রীস্টানদের মধ্যে কেবল বড় সন্তানই স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়। বাকি সন্তানদের কেবল জীবিকা নির্বাহের অধিকার

রয়েছে। সন্তান ছাড়া বাকি আত্মীয়-পরিজন উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকে।

হিন্দুদের মধ্যে কেবল পুরুষ সন্তানেরাই উত্তরাধিকারী হয়। এ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনেরা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুরই মালিক হয় না। মেয়েরা শুধু ভরণ-পোষণ পেয়ে থাকে।

আরব দেশেও মেয়েরা উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুই পেতো না। বরং যতটুকু জানি, পুরুষ সন্তান ছাড়া পিতা, ভাই, মা, বোন প্রমুখও উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুই লাভ করতো না। ইওরোপ আজ তহযীব-তমদ্দুনের দিক থেকে উন্নত আসনে প্রতিষ্ঠিত। অথচ এখনো পূর্ববৎ এই নিয়মই স্থির রয়েছে যে, কেবল বড় সন্তানই উত্তরাধিকারী হবে।

উত্তরাধিকার কি কি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

এখন ভেবে দেখুন, তমদ্দুন ও প্রকৃতির নিয়মানুসারে উত্তরাধিকারের কিরূপ নীতি হওয়া উচিত? এর উত্তর নির্ভর করে দু'টি প্রশ্নের উপর ঃ প্রথমটি হলো—যথাসম্ভব বেশী লোকের মধ্যে সম্পদ বিভক্ত ও সম্প্রসারিত করা ভাল, নাকি দু-একটি লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা? দ্বিতীয় হলো—কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ধন-সম্পদ আত্মীয় স্বজনেরা পায় কেন?

সমাজবিদ্যার শিক্ষকগণ স্থির করেছেন যে, সম্পদ যত বেশী লোকের মধ্যে সম্প্রসারিত করা যায়, ততই ভাল। সভ্য ও বর্বর দেশের মধ্যে এটাই পার্থক্য। স্বৈরতান্ত্রিক দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—সেখানে বাদশাহ, তাঁর সভাসদ ও তাঁর প্রিয়পাত্র লোকেরাই অর্থশালী হয়ে থাকে। বাকি লোকজন সাধারণত দরিদ্র বা মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। পক্ষান্তরে, সভ্য দেশে বাদশাহ্ থেকে আরম্ভ করে জনসাধারণের স্তর পর্যন্ত মর্যাদা ভেদে সম্পদের বণ্টন হয়ে থাকে এবং তার পরিমাণ উপরের দিক থেকে নিম্ন দিকে ক্রমাগত কমতে থাকে।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনসঙ্গত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন-কানুনে কেবল ইসলামই বিবেক-বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। ইসলামী কানুনানুসারে মৃত ব্যক্তির সকল আত্মীয়-স্বজনেরা আত্মীয়তার স্তরভেদে উপকৃত হয়। মা, বাপ, চাচা,

দাদা, ভাই, বোন, ফুফু, খালা, মামা, যারা আছেন—সবাই উত্তরাধিকার-সূত্রে ধনসম্পত্তির কিছু না কিছু অংশের মালিক হয়। উত্তরাধিকারের মূল নীতি হলো—মৃত ব্যক্তির সঙ্গে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির সম্পর্ক ও নৈকট্যের মাত্রাভিত্তিক। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল এবং যারা সুখে দুঃখে তার সাহায্য করতো, পাশে এসে দাঁড়াতো, তারাই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত। এ নীতি মোতাবেক এটা খুবই হীনমন্যতা হবে, যদি কেবল এক শ্রেণীর আত্মীয়কে উত্তরাধিকারের জন্য বেছে নেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সব আত্মীয় সমান নয়। সুতরাং এ পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। শুধু এক শ্রেণীর আত্মীয়কে উত্তরাধিকারের জন্য বেছে নেওয়া এবং বাকি সবাইকে বঞ্চিত করা প্রকাশ্য অন্যায়। শুধু বড় সন্তান উত্তরাধিকারী হবে—ইওরোপের এ আইন সম্পূর্ণ বিবেক বিরোধী। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সন্তানের যে সম্পর্ক থাকে, তা সকল সন্তানের বেলায় এক ও অভিন্ন রয়েছে। এ সত্ত্বেও শুধু বড় সন্তানকে বেছে নেওয়া এবং বাকি সব সন্তানকে বঞ্চিত করা পুরোপুরি প্রাকৃতিক আইন-বিরোধী।

ইসলাম খুব সূক্ষ্ম ও নাজুক পার্থক্যের প্রতিও দৃষ্টি রেখেছে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার আত্মীয়দের যে পর্যায়ের আত্মীয়তা থাকে, ঠিক সেই পর্যায় মোতাবেকই তাদের জন্য ছোট-বড় বিভিন্ন অংশ নির্ধারণ করা হয়।

সর্বসাধারণের অধিকার

সর্বসাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার, উদারতা ও দয়া প্রদর্শনের জন্য ইসলামে তাগিদ রয়েছে। কিন্তু আমি সে বিষয়টি এখনো আলোচনা করতে চাই না। কারণ নৈতিকতার শিক্ষা সব ধর্মেই মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। এতে কোন ধর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের যে মাপকাঠি আছে, তা হলো : এটা দেখতে হবে যে, কোন্ ধর্ম বা সম্প্রদায় অপরাপর ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ ব্যবহারের শিক্ষা দিচ্ছে ?

পৃথিবীতে যে সব বড় জাতি বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে তন্মধ্যে হিন্দু, পার্সী, খ্রীস্টান ও ইহুদী জাতি হলো অন্যতম। হিন্দু ধর্ম ভারতীয় সকল অনার্যকে শূদ্র বলে অভিহিত করেছিল। আর্য

ও অনার্য—উভয় এক ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আর্যরা অনার্যদের জন্য এমন সব আইন রচনা করেছিল, যার চাইতে হীন ও কঠিন আইনের কথা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। তাদেরকে প্রত্যেক প্রকার সম্মান, স্বাধীনতা, পদ ও এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। হিন্দুদের চরম ভাবাপন্নতার কথা ভেবে দেখুন, কোন শূদ্র যদি দৈবক্রমে পবিত্র বেদের আওয়াজ শুনতো, তবে তার কানে সীসা গলিয়ে দেওয়া হতো। কারণ তার অপবিত্র কানকে পবিত্র বেদের আওয়াজ শোনার যোগ্য বলেও মনে করা হতো না।

রোম সাম্রাজ্যের যুগ ছিল প্রাচীন খ্রীস্টানদের সুবর্ণ যুগ। এ সাম্রাজ্য বহুদিন পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। এর এত জাঁকজমক ছিল যে, দুনিয়ার অন্যান্য অংশে এর নাম শুনেই লোকেরা শিউরে উঠতো। কিন্তু এত বড় সাম্রাজ্যের স্বরূপ কি ছিল? ফরাসী বিশ্বকোষে নিম্নলিখিত শব্দে এর চিত্র অংকিত করা হয়ঃ

"রোমের শাসন ব্যবস্থা কি প্রকৃতির ছিল? সেখানে দয়াহীনতা, ও রক্তপাত আইনের পোশাক ধারণ করেছিল। বীরত্ব, প্রতারণা, দূরদর্শিতা, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক ঐক্য—এগুলো ছিল চোর-ডাকাতেরই গুণাবলী। দেশপ্রেম ছিল বর্বরোচিত। অত্যধিক ক্ষমতার লোভ, অপরাপর কওমের প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ, দয়ার অনুভূতির বিলোপ—এসব বস্তু ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিল না। প্রতাপ-প্রতিপত্তি বলতে বুঝাতো—তলোয়ারবাজি, চাবুকের প্রহার, যুদ্ধ-বন্দীদের শাস্তি দান, ছোট-বড় সকলকে দিয়ে গাড়ী টানার কাজ সম্পাদন ইত্যাদি।"

এখন দেখুন, ইসলাম কি করেছে?

ইসলাম বিধর্মী ও অমুসলিম জাতিকে কি ধরনের অধিকার দিয়েছে

ইসলাম গোত্রগত ও বংশগত পার্থক্য সমূলে উৎখাত করেছে। ইসলামের উৎসভূমি হলো আরব দেশ। কিন্তু ঈমান গ্রহণের পর ইসলাম পার্সী, হিন্দু, তুর্কী, তাতারী, কাফ্রী, আফগানী—মোট কথা, দুনিয়ার সকল কওমকে আরবদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে পরিগণিত করেছে। ইওরোপ আজ স্বাধীনতার দাবি করছে। কিন্তু তাঁরা অন্যান্য কওমের প্রতি যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে, তা এখন কিছুতেই মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। কোন লোক যদি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইওরোপীয়দের সহ-ধর্মাবলম্বীতে পরিণত হয়, তখন তাকে

সে ধর্মের-নেতাগণ এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কেয়ামতের দিন সে তাদের সমতুল্য হতে পারবে। কিন্তু এ ধ্বংসশীল জগতে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে, তা থাকবেই।

পক্ষান্তরে ইসলাম গজনবী, দায়লমী, সলজুকী, তুর্কী—এমনকি যাদের দেহে আরবদের এক ফোঁটা রক্তও ছিল না, তাদেরকেও ইসলাম পুনঃ পুনঃ সাম্রাজ্য দান করেছে, এমনকি আরবদেরকেও তাদের শাসনাধীন করেছে।

ধর্ম বিরোধীদেরকে ইসলাম দু'ভাগে বিভক্ত করেছে ঃ

১ যিম্মী (আশ্রয়প্রাপ্ত) ও মুআহিদ্ (চুক্তিবদ্ধ) অর্থাৎ যারা ইসলামী শাসনাধীন থাকে বা মুসলিম শাসনকর্তাদের সঙ্গে চুক্তি ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

২. হর্‌বী (যুদ্ধ-বিজড়িত)—অর্থাৎ যাদের সঙ্গে কোন প্রকার চুক্তি নেই, বরং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে আছে বা লাগার আশংকা রয়েছে।

ইসলাম যিম্মীদেরকে জান, মাল, আযাদী, ইজ্জত—সকল দিক থেকে মুসলমানের সম-অধিকারী বলে ঘোষণা করেছে। আমি 'হুকুকুয্ যিম্মিঈন' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছি। তাই এখানে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই না।

'হর্‌বী'দের সঙ্গে ইসলাম কিরূপ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে, তা কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে প্রতিভাত হবে ঃ

"এমন লোকদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই কর, যারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু সীমা লংঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে এতটুকু নেবে, যতটুকু তারা নিয়েছে। যদি ধৈর্য ধারণ করতে পার, তবে তা হবে ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম কাজ। কোন কওমের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্রবৃত্ত না করে।"

কুরআনে আরো রয়েছে "কাফেরদের যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা কর"; "সকল কাফেরের সঙ্গে লড়াই কর"; "কাফের আল্লাহ্‌র শত্রু"—এ ধরনের আয়াতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, প্রত্যেক

ধর্মবিরোধী ব্যক্তির প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করাই মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য।

এই পরিপেক্ষিতেই কোন কোন পক্ষপাতদুষ্ট মুসলমান এ মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রথম প্রকারের আয়াতগুলো রহিত করা হয়েছে। কিন্তু এই পরস্পর বিরোধিতার নিরসন আল্লাহ্ নিজেই করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত নয় এবং তোমাদেরকে ঘর থেকেও উচ্ছেদ করেনি, তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন। যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্ম-যুদ্ধে লিপ্ত এবং তোমাদেরকে ঘর থেকে উচ্ছেদ করেছে বা এ কাজে অন্যকে সাহায্য করেছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেছেন। যারা এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তারা অত্যাচারী।"

এ সব আয়াতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম বিরোধীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয় বা তাদেরকে (মুসলমান-দেরকে) আপন ঘর থেকে উচ্ছেদ করে বা উচ্ছেদ করার ব্যাপারে অপরকে সাহায্য করে, তবেই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা বা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অন্যথা নয়। খ্রীস্ট ও অন্যান্য ধর্মে আপাতদৃষ্টিতে এর চাইতেও বেশী উদারতা দেখা যায়। যেমন ইনজীলে আছে—"যদি তোমার এক গালে কেউ চপেটাঘাত করে, তবে তুমি তাকে অপর গালটিও পেতে দেবে।"

এ ধরনের কথাগুলো আপাতদৃষ্টিতে খুবই সুন্দর বলে মনে হয়। বস্তুত তা নিরর্থক। কেননা এসব কথা মানব-স্বভাব বিরুদ্ধ এবং এজন্য তা বাস্তব রূপে রূপায়িত হতে পারে না।

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হলো—এতে চরম কড়া-কড়িও নেই, আবার চরম নমনীয়তাও নেই। এতে যত বিধি-বিধান রয়েছে, সবই মানব-স্বভাব সম্মত।

অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস

ইসলামের আসল বুনিয়াদ হলো দু'টি বস্তু : তওহীদ ও নুবুওয়াত। "যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই) বলেছে, সে-ই বেহেশ্তে প্রবেশ করেছে"—এটাই ছিল ইসলাম। এই ইসলাম ছিল সাদাসিধে, সাফ্ ও সংক্ষিপ্ত ধর্ম। এই সরলতার দরুনই সকল ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এই সরলতা দেখেই ইওরোপের একজন সমালোচক দুঃখ করে বলেছিলেন : "যদি কোন দার্শনিক খ্রীস্টধর্মের সুদীর্ঘ ও জটিল ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে তিনি দুঃখ করে বলে উঠবেন যে, আমার ধর্ম এরূপ সরল ও পরিষ্কার হলো না কেন ? তবেই তো আমি খুব সহজে ঈমান আনতে পারতাম এক আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহম্মদের উপর।" মাত্র এ দু'টি শব্দই ছিল, যা উচ্চারণ ও বিশ্বাস করলেই কাফের মুসলমানে পরিণত হতো, পথভ্রষ্ট সুপথে পরিচালিত হতো, হতভাগ্য ভাগ্যবান ও অভিশপ্ত সুজনে পরিণত হতো। কিন্তু কালপ্রবাহে এবং বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মনোবৃত্তির ফলে এই সরল ইসলামে নানাবিধ টীকা-টিপ্পনীর সৃষ্টি হয়েছে। এখন ইসলাম বলতে এমন একটি গোলকধাঁধাকে বোঝায়, যা আদি যুগের লোকদের শত বোঝালেও তারা এ ধর্ম বুঝতে সক্ষম হতো না। আর যে আরবদের উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তারা তো আজও এই ইসলামকে বুঝতে পারছে না। মজার ব্যাপার হলো, কুরআন নশ্বর, নাকি অবিনশ্বর, আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁর সহজাত বস্তু, নাকি সত্তাবহির্ভূত, কর্ম ঈমানের অঙ্গ নাকি বহিস্থ বস্তু এসব নব্য সৃষ্ট বিষয়কেই ধরে নেয়া হয়েছে কুফুর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠিরূপে। ইসলামের আদিযুগে এ সবের নাম-নিশানাও ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলোকে ধরে নেয়া হয়েছে কুফ্র ও ইসলামের তুলাদণ্ডরূপে। ইল্মে কালামের ইতিহাসে আপনারা এসব পড়ে থাকবেন। এসব বিষয়ের দরুন কত

যে কাণ্ড ঘটেছে, তা কারো অজানা নয়। এখন এ বিষয়গুলো ইলমে কালামের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। আধুনিক ইলমে কালামে এসব বিষয়ের উল্লেখ না করে গত্যন্তর নেই।

এ বিষয়গুলো দু'ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত :

১. এসব বিষয়ের প্রকৃতি ও স্বরূপ কি?

২. বস্তুত ইলমে কালামের সঙ্গে এগুলোর কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে?

ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রকৃতি

আমি যেখানে ইলমে কালামের ইতিহাস আলোচনা করেছি, সেখানে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবেই লিখেছি। এখানে শুধু এতটুকু বলবো যে, আকায়েদ সংক্রান্ত বিষয়াদি দু'প্রকার : এমন কতগুলো বিষয় আছে, যাদের উল্লেখ কুরআন বা হাদীসে মোটেই নেই। কিন্তু মোতাকাল্লিমগণের মতে, তওহীদ ও নুবুওয়াতের সঙ্গে জড়িত বলে সেগুলোরও আলোচনা করা আবশ্যক। কেননা সেগুলো ছাড়া তওহীদ ও নুবুওয়াতের পূর্ণতা সাধিত হতে পারে না। যেমন কুরআন মজীদের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা—যদিও হাদীস ও কুরআনে প্রকাশ্যভাবে বিষয়টির উল্লেখ নেই, তবুও এর আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যে সব আকায়েদ কুরআনে আলোচিত হয়েছে এটি সেগুলোর সঙ্গেই জড়িত। কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। আর ঐশবাণী হলো তাঁরই অন্যতম গুণ। গুণ ও গুণের আধার—এ দুটো বস্তু পরস্পর সংযুক্ত। এমতাবস্থায়, কুরআন মজীদ যদি নশ্বর হয়, তবে আল্লাহ্‌র সত্তাও নশ্বর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা নশ্বর গুণাবলীর আধারও নশ্বর। অথচ আল্লাহ্ যে চিরন্তন ও অবিনশ্বর—এটা অনস্বীকার্য। এ ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে।

ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত যে সব বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে নেই

এমন কতগুলো বিষয় আছে, যেগুলোর উল্লেখ কুরআনে অবশ্য আছে, কিন্তু সেগুলোর বিশ্লেষণ নেই। এজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ইজ্‌তেহাদ মাফিক সেগুলোর বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলে অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষয় সৃষ্টি হয়েছে। যেমন পরকালের উত্থানের বিষয়টি। কুরআন মজীদে অনেক স্থলে এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু

এর প্রকৃতির উল্লেখ নেই। আশায়েরা এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, পৃথিবীতে যে মানুষের কায়া থাকে, পরকালে অবিকল সেই কায়াকেই পুনঃ সৃষ্টি করা হবে। মুসলিম হুকামার মতে, কায়ার সঙ্গে পরকালের উত্থানের কোন সম্পর্ক নেই। শাস্তি ও প্রতিদান— সবকিছুই হবে আত্মার উপর। আত্মাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রয়োজন নেই। কেননা আত্মা হলো অমিশ্র মৌলিক বস্তু। সেটা একবার সৃষ্টি হওয়ার পর আর ধ্বংস হয় না।

প্রথম প্রকারের ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি অর্থাৎ যেগুলোর উল্লেখ কুরআন মজীদ ও যথার্থ হাদীসে মোটেই নেই, সেগুলো মূলত ইলমে কালামের বিষয়ই নয়। কিন্তু ছয়-সাতশ' বছর ধরে সেগুলো যেন ইসলামের অঙ্গে পরিণত হয়ে আছে। তাই সেগুলোরও আলোচনা প্রয়োজন। বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

আশায়েরার মতে	অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে
১. আল্লাহ্ বিশেষ কোন দিক বা স্থানে অবস্থিত নন।	হাম্বলীপন্থী ও অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ এ মতের বিরোধী।
২. আল্লাহ্‌র কোন আকার নেই।	কার্‌রামিয়া এ মতের বিরোধী। ইবনে তাইমিয়াও সাকার আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী।
৩. আল্লাহ্ দ্রব্যও নন, গুণও নন।	ইবনে তাইমিয়া প্রমুখের মতে, আল্লাহ্ দ্রব্য ও স্বমূর্ত।
৪. আল্লাহ্ কালের উর্ধ্বে।	
৫. আল্লাহ্ কোন পদার্থের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন না।	মায়াবাদীদের মতে, প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্।
৬. আল্লাহ্‌র সত্তায় কোন নশ্বর বস্তু নেই।	কার্‌রামিয়া এ মতের বিরোধী।
৭. আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সত্তাভুক্ত বস্তু নয়।	মুসলিম হুকামা ও অধিকাংশ মুতাযিলার মতে, তা আল্লাহ্‌র সত্তাভুক্ত বস্তু।

৮. আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি কোন কাজের ইচ্ছা করলে করতে পারেন, আবার না-ও করতে পারেন।	বু-আলী সিনা প্রমুখের মতে, আল্লাহ্র সত্তা থেকে কার্য সম্পন্ন হওয়া অনিবার্য। অর্থাৎ সূর্য থেকে যেমন আলোর বিকীরণ হয়, তেমনি আল্লাহ্র সত্তা থেকেও কার্য সম্পন্ন হয়।
৯. আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির প্রত্যক্ষ স্রষ্টা।	বু-আলী সিনা প্রমুখের মতে, আল্লাহ্র সত্তা একক বস্তু। যে বস্তু সত্তাগতভাবে একক, তা থেকে একটি মাত্র বস্তু উৎপন্ন হতে পারে। তদনুযায়ী আল্লাহ্ কেবল 'আক্লে আও-ওয়াল' (প্রথম জ্ঞান) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর 'আক্লে আও-ওয়াল' থেকে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।
১০. আল্লাহ্র ইচ্ছা চিরন্তন।	মুতাযিলাপন্থীদের মতে, অচিরন্তন।
১১. আল্লাহ্র বাণী চিরন্তন এবং সেটা হলো তাঁর সত্তাজাত বস্তু।	হাম্বলীদের মতে, আল্লাহ্র বাণী চিরন্তন বটে, কিন্তু তা সত্তা-জাত বস্তু নয় বরং তা হলো অক্ষর ও আওয়াজের নামান্তর। মুতাযিলার মতে, ঐশ বাণী নশ্বর এবং তা অক্ষর ও আওয়াজের নামান্তর।
১২. মানুষ থেকে যে সব কার্যাবলী সংঘটিত হয়, তা আল্লাহ্র এখতিয়ারের অধীনেই হয়, এতে মানব-শক্তি ও তার এখতিয়ারের কোন ভূমিকা নেই।	মুতাযিলার মতে, মানুষের ইচ্ছা ও তার শক্তিবলেই কার্যাবলী সংঘটিত হয়। অবশ্য এ ইচ্ছা ও শক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত।
১৩. আল্লাহ্র কার্যাবলীর পেছনে তাঁর কোন উদ্দেশ্য নেই।	মুতাযিলার মতে, আল্লাহ্র প্রত্যেকটি কাজের পেছনে কোন একটি উদ্দেশ্য থাকে।

১৪. স্থায়িত্ব অস্তিত্বের একটি গুণ। এটা মৌল অস্তিত্বের উপর একটি অতিরিক্ত বস্তু।

১৫. শ্রবণ ও দর্শন—আল্লাহ্‌র এ গুণ দুটো সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে।

১৬ আল্লাহ্‌র বাণীতে একাধিক্য নেই। তা একক।

১৭. আল্লাহ্‌র সত্তাগত বাণী শ্রবণীয়।

এ ছাড়া আরো অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু এগুলোই প্রধান। তাই এখানেই ক্ষান্ত হলাম।

দ্বিতীয় প্রকারের আকায়েদ হলো সেগুলো, যাদের উল্লেখ কুরআনে রয়েছে।

কুরআনে ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত যে সব বিষয়ের কেবল উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতি ও স্বরূপের আলোচনা নেই

এ সকল ধর্মীয় বিশ্বাস প্রধানত আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্য জগত সম্বন্ধীয়। যেমন—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, ফেরেশতা, হাশর, নশর, বেহেশ্‌ত, দোযখ, পুলসিরাত, দাঁড়ি পাল্লা ইত্যাদি—এ সবের উল্লেখ কুরআন মজীদে আছে বলে সকল সম্প্রদায়ই এগুলো মোটামুটি মেনে নিয়েছে। কিন্তু এগুলোর প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণের প্রশ্নে মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন সম্প্রদায় এসব পরিভাষার প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন। আবার কোন কোন সম্প্রদায় সেগুলোকে ভাবার্থ ও রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন। আবার কোন কোন সম্প্রদায় বিশেষ বিশেষ শব্দের মোটেও ভাবার্থ করেন নি। বরং তাঁরা বলেছেন যে, এটা হলো আধ্যাত্মিক বিষয়াদি বোঝাবার বিশেষ একটি পদ্ধতি। এ মতভেদ অবশ্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু কুরআনেও এ মতভেদের বীজ ও ইংগিত নিহিত ছিল। এই বীজ ও ইংগিতই এ বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টির একটি বড় কারণ। কুরআন মজীদে আছে:

"এর (কুরআনের) কোন কোন আয়াত পরিষ্কার এবং সেগুলোই এর প্রাণকেন্দ্র। আবার কতগুলো আয়াত আছে অস্পষ্ট। এমতাবস্থায়

যাদের মনে কুটিলতা আছে, তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা দেওয়ার অজুহাতে অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে। অথচ এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর ঝানু-আলিমেরা বলেন, আমরা এগুলো বিশ্বাস করলাম।" (আলে-ইম্‌রান, রুকূ'—১)

এখানে কুরআনের শব্দ হলো—"মা-ইয়ালামু তাবীলাহু ইল্লাল্লাহ্ ওয়ার্-রাসিখুনা ফিল্-ইল্‌মে ইয়াকুলুনা আমান্নাবিহি"

মতভেদ সৃষ্টির কারণ হলো এক সম্প্রদায় "ওয়ার্-রাসিখুনা ফিল্ ইল্‌মে"—এই শব্দগুলোকে স্বতন্ত্র বাক্য বলে গণ্য করেন। তাতে অর্থ হয়, যে সব আয়াত অস্পষ্ট, সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর যাঁরা ঝানু আলিম, তাঁরা শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হন যে, আমরা সেগুলো বিশ্বাস করলাম। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতে, "ওয়ার্-রাসিখুনা ফিল্ ইল্‌মে" স্বতন্ত্র বাক্য নয়, বরং তা পর্ব বাক্যের সঙ্গে যুক্ত। তদনুসারে আয়াতটির অর্থ হবে—অস্পষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ এবং ঝানু আলিম ব্যতীত আর কেউ জানে না। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার পক্ষে রয়েছেন হযরত আয়েশা, হাসান বস্‌রী, মালেক ইব্‌নে আনাস, কিসাই, ফার্‌রা ও জব্বাই প্রমুখ। শেষোক্ত ব্যাখ্যার পক্ষে রয়েছেন মুজাহিদ, রাবি' ইব্‌নে আনাস ও অধিকাংশ মুতাকাল্লিমগণ। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস থেকে দু'ধরনের ভাষ্য পাওয়া যায়। এসব মতভেদের দরুন অপর একটি মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। তা হলো—কোন্ আয়াতগুলো পরিষ্কার অর্থবোধক, আর কোনগুলো অস্পষ্ট? এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আকায়েদে অনেক মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে :

১. যে সব আয়াতে উপরোক্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে, তা অস্পষ্ট বলে পরিগণিত হবে কি-না ?

২. যদি অস্পষ্ট হয়, তবে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা উচিত হবে কি-না ?

৩. যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে কিভাবে করতে হবে ?

পরবর্তী আলোচনায় 'তাবীল' (অপ্রকাশ্য ও পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ) -এর কথা বারবার আসবে। তাই আমাদের স্থির করতে হবে যে, তাবীলের স্বরূপ কি? তাবীল করা সর্বত্র অবৈধ, নাকি কোথাও বৈধ,

আর কোথাও অবৈধ? যদি কোথাও কোথাও বৈধ হয়, তবে কোন্ নীতির উপর ভিত্তি করে তা করা হবে? তাবীলকে কুফ্র ও ইসলাম -- এ দুটোর মধ্যে তারতম্যের মাপকাঠিরূপে গণ্য করা কতটুকু সমীচীন হবে?

তাবীলের স্বরূপ

(অপ্রকাশ্য ও ভাবার্থ গ্রহণ)

'তাবীল'এর মূল আভিধানিক অর্থ হলো—অনুধাবন ও ভ্রমণ। কিন্তু পরিভাষায় ব্যাখ্যা করাকে 'তাবীল' বলা হয়। কুরআন মজীদে শব্দটি প্রধানত শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন শরীফে আছে ঃ 'সাউনাব্বিউকা-বি-তাবীলি মা-লাম-তাস্‌তাতি' আলাইহি সাব্‌রান্।"—যা জানতে আপনি অস্থির, তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনাকে আমি শিগগিরই অবহিত করছি। (অনুবাদ) কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিদ্যার সংজ্ঞায় ও তফসীরের পরিভাষায় তাবীলের মানে হলো—প্রকাশ্য ও আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করে অন্য কোন মানে গ্রহণ করা।

'হাশ্‌বিয়া' ছাড়া ইসলামের বাকি সব সম্প্রদায় তাবীলকে বৈধ বলে মনে করেন। ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি তাবীলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনিও তিন জায়গায় তাবীলকে বৈধ মনে করেন। মোটকথা, হাশ্‌বিয়া ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ই তাবীল বিরোধী নন। মতবিরোধ থাকলে তা রয়েছে তাবীলের স্থল নিয়ে, অর্থাৎ কোথায় তা বৈধ, আর কোথায় অবৈধ। ইসলামী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রকাশ্য অর্থেরও সমর্থক রয়েছেন, আবার সূক্ষ্ম পর্যালোচকও রয়েছেন। এঁদের পরস্পর বিরোধী মনোভাবের দরুন তাবীলের গণ্ডি একদিকে যেমন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে আবার তাতে বেশ প্রশস্ততা এবং ব্যাপকতা স্থান লাভ করেছে। কঠোরতার দিক থেকে সর্বপ্রথম স্থান হলো প্রকাশ্যবাদীদের (আরবাব-এ-যাহিরদের)। এঁদের মতে, তাবীল কোথাও বৈধ নয়। যেমন কুরআন মজীদে আছে—'আমি (আল্লাহ্) আকাশ-জমিনকে এ মর্মে আদেশ দিলাম—খুশীতে হোক আর অখুশীতেই হোক, তোমরা উপস্থিত হও। উভয়ই বললো ঃ আমরা অনুগত হয়ে উপস্থিত হলাম।"

কুরআনে অন্যত্র আছে ঃ "আমি যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চাই, তখন বলি ঃ 'হও' এবং তখনি তা হয়ে যায়।" প্রকাশ্যবাদীদের

মতে, এসব আয়াতে আভিধানিক অর্থই উদ্দিষ্ট। তার মানে বস্তুত জমিন ও আসমান এসব শব্দ মুখে উচ্চারণ করেছিল এবং বস্তুত প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করার সময়ই আল্লাহ্‌তাআলা 'হও'—এ শব্দটি প্রয়োগ করে থাকেন। ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরীর অভিমতও এর কাছাকাছি। তিনি 'কিতাবুল ইবানাত্‌' গ্রন্থে বলেছেন যে, এসব শব্দের মৌলিক অর্থই উদ্দিষ্ট। এতে ভাবার্থ বা রূপকার্থ করা উদ্দিষ্ট নয়।

'আরবাব-এ-যাহির' ছাড়া এ বিষয়ে সাধারণ আশায়েরা; মাতুরিদিয়া, মুতাযিলা ও হুকামা-এ-ইসলাম-এরও মতামত রয়েছে। এ আলোচনায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাবীলের নীতি নির্ধারণের প্রশ্নটি। অর্থাৎ কোথায় তা বৈধ, আর কোথায় বৈধ নয়, তা নিরূপণ করা। ইমাম গাযালী 'এহ্‌ইয়াউল উলূম' ও 'ফস্‌লুত্‌ তাফ্‌রিকা বাইনাল্‌ ইসলামে ওয়ায্‌-যানাদিকাহ্‌' গ্রন্থে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। এজন্য আমি তাঁর ভাষ্যের শাব্দিক অনুবাদ পেশ করছি। 'এহ্‌ইয়াউল উলূম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড হলো 'কিতাবু ফওয়াইদিল্‌ আকায়েদ'। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনামে রয়েছে ঃ

তাবীল সম্পর্কে ইমাম গাযালীর অভিমত

'আপনারা হয়তো বলবেন, এতে (পূর্বোক্ত আলোচনায়) প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্ঞানের দু'টো দিক আছে ঃ একটি প্রকাশ্য, অপরটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য দিকের মধ্যে কতক বিষয় রয়েছে, যা খুবই পরিষ্কার এবং প্রথম নজরেই তাদের ভাব উপলব্ধি করা যায়। অপ্রকাশ্য দিকটি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও পরিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমেই হাসিল করা যায়। আরো পরিষ্কার কথায়, সকল বস্তু থেকে নজর এড়িয়ে সে দিকটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই তা সহজে অনুধাবন করা যায়। অথচ আপাতদৃষ্টিতে একথা শরীঅত বিরোধী বলেই মনে হয়। কেননা শরীঅতে যাহির ও বাতিন, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিধি বলে আলাদা আলাদা দু'টো বস্তু নেই। শরীতাতে যা যাহির, তাই বাতিন, আবার যা বাতিন, তাই যাহির।''

''আপনারা যদি এ কথা বলতে চান, তবে আমি তা মানতে বাধ্য নই। কারণ জ্ঞানের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট—এ দুটো দিক আছে। একথা কোন জ্ঞানী অস্বীকার করতে পারেন না। এ বিষয়টি কেবল তারাই অস্বীকার করে, যারা ছোটবেলায় কোন কথা শুনেছে এবং সেটার

উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা সামনের দিকে মোটেও অগ্রসর হয়নি। আলিম ও ওলীদের আধ্যাত্মিক মনজিলগুলোও তারা বুঝতে চেষ্টা করেনি। জ্ঞানের যে দু'টো দিক আছে, এ কথার প্রমাণ শরীঅতেও রয়েছে। রসূল করীম (সঃ) বলেছেন : কুরআনের অর্থ দু' প্রকার : একটি যাহির, অপরটি বাতিন ; একটি প্রাথমিক, অপরটি চরম পর্যায়ের। (এ হাদীসটি শুদ্ধ নয়—অনুবাদক)। হযরত আলী তাঁর বক্ষের দিক ইংগিত করে বলেছেন : এতে বড় বড় জ্ঞান নিহিত রয়েছে। কত ভাল হতো, যদি কেউ তা গ্রহণ করতে পারতো! রসূল করীম (সঃ) বলেছেন : আমি পয়গাম্বর। আমাদের প্রতি আদেশ রয়েছে যে, আমরা যেন লোকের সঙ্গে তাদের বুদ্ধি মাফিক কথা-বার্তা বলি। (এ হাদীসটিও মরফু' নয়)। হযরত আলী রসূল করীম (সঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করে বলেছেন : যদি কোন কওমের সামনে এমন কথা বলা হয়, যা তাদের বুদ্ধি-সীমার উর্ধ্বে, তবে সেটা তাদের পক্ষে হবে ফ্যাসাদ স্বরূপ। আল্লাহ্ বলেন : "আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষকে বোঝাবার জন্যই দিয়ে থাকি। এগুলো আলিম ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।" রসূল করীম (সঃ) বলেছেন : "আমি যা কিছু জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী।" তিনি (সঃ) আরো বলেছেন : "কতক জ্ঞানমূলক বিষয় রয়েছে, যা কেবল আল্লাহ্র আরিফেরাই জানেন।"

এখন বলুন, এগুলো যদি রহস্যাবৃত না হতো, তবে রসূল করীম (সঃ) কেনই বা সেগুলো প্রকাশ করলেন না? এটা স্পষ্ট কথা যে, এ কথাগুলো যদি রসূল করীম (সঃ) প্রকাশ করতেন, তবে লোকেরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা বুঝতে পারবে না বা তাতে অন্য কোন মঙ্গল নিহিত ছিল বলেই তাঁকে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়। কুরআন শরীফে আছে : আল্লাহুল্লাযী খালাকা সাব্আ সামাওয়াতিওঁ-ওয়া-মিনাল্ আর্দি মিস্লাহুন্না"—"আল্লাহ সপ্ত আকাশ ও তদরূপ সপ্ত জমিন সৃষ্টি করেছেন।" ইব্নে আব্বাস এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : "আমি যদি এ আয়াতের ব্যাখ্যা করি, তবে তোমরা আমাকে পাথর মারবে।" অন্য বর্ণনায়, "তোমরা বলবে —আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস কাফের।" আবু হুরায়রা বলেন : "আমি রসূল করীমের নিকট দু'প্রকারের কথা শিক্ষা করেছি। তন্মধ্যে একটা প্রকাশ করেছি। অপরটা যদি প্রকাশ করি, তবে আমার গর্দান

কাটা যাবে।" রসূল করীম (সঃ) বলেছেন : "তোমাদের উপর আবু বকরের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তা নামায-রোযা বেশী করার দরুন নয়, বরং তাঁর বক্ষে যে রহস্য নিহিত আছে, সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।" এতে প্রকাশ্যে বোঝা যায় যে, এ রহস্য ছিল ধর্মনীতি সংক্রান্ত। অথচ যে বস্তু ধর্মনীতিভুক্ত, তা সাধারণতঃ গোপন রাখা হয় না। সহল তসতরী বলেছেন, উলামা তিন ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হন :

১. প্রকাশ্য জ্ঞান, যা তাঁরা প্রকাশ্যবাদীদের সামনে প্রকাশ করেন।

২. অন্তর্নিহিত জ্ঞান, যা শুধু যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে ব্যক্ত করা হয়।

৩ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যার সংযোগ থাকে কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে। অপর কারো কাছে তা প্রকাশ করা হয় না। কোন কোন আরিফ্ (আল্লাহ্ প্রেমিক) বলেন : ঐশিক রহস্য প্রকাশ করা কুফ্র। কোন কোন লোক বলেন : আল্লাহ্র প্রভুত্ব এমন একটি রহস্য, তা যদি প্রকাশ করা হয়, তবে নুবুওয়াত অর্থহীন হয়ে পড়ে। আবার নুবুওয়াত এমন একটি রহস্য, তা যদি প্রকাশ করা হয়, তবে জ্ঞান অর্থহীন হয়ে পড়ে। আবার আল্লাহ্র সঙ্গে উলামার এমন একটি রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে, তা যদি প্রকাশ করা হয়, তবে সমস্ত বিধি-বিধান নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।" খুব সম্ভব এ প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা—মস্তিষ্কহীনদের কাছেই নুবুওয়াত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি এ উদ্দেশ্য না হয়, তবে তাঁদের এ উক্তি ভ্রমাত্মক বলে পরিগণিত হবে।

যে ব্যক্তি বলে, শরীঅত ও হকিকত, অন্য কথায়, যাহির ও বাতিন পরস্পর বিরোধী, সে ইসলামের চাইতে কুফরেরই বেশী নিকটবর্তী। যে সব রহস্য আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ জানেন, কিন্তু জনসাধারণ জানে না এবং যা তাদের কাছে প্রকাশ করাও নিষেধ, সেগুলো পাঁচ প্রকার :

১. প্রথম প্রকার রহস্য হলো—যা মূলতই সূক্ষ্ম এবং যা বেশীর ভাগ লোকেই বুঝে না। এ রহস্য কেবল আল্লাহ্র প্রিয়জনরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। সুতরাং তাঁদের কর্তব্য হলো এগুলো অযোগ্য লোকের কাছে প্রকাশ না করা। তা না হয় এ রহস্য তাদের জন্য

ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ তাদের ধ্যান-ধারণা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। লোকেরা যখন নবীজীকে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দেন নি। কারণ আত্মার স্বরূপ সাধারণ লোকের ধারণাতীত।

এখানে কারো এ ধারণা করা উচিত নয় যে, নবীজীও হয়তো আত্মার হকিকত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কেননা যে ব্যক্তি রুহের হকিকত জানে না, সে নিজের হকিকতও জানে না। আর যে ব্যক্তি নিজ হকিকত সম্পর্কে অনবহিত, সে আল্লাহ্‌কে কি করে চিনতে পারে? অনেক আলিম আর ওলীও আত্মার হকিকত উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা শরীঅতের চিরাচরিত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তা প্রকাশ করেন না। তাঁরা মনে করেন, যেখানে নবিগণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সেখানে তাঁদের অন্যরূপ করা শোভা পায় না। আত্মার কথা বাদই দিলাম। আল্লাহ্‌র গুণাবলীতেও এমন মাহাত্ম্য আছে, যা সাধারণ লোক বুঝতে সক্ষম নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নবীজী কেবল আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য গুণাবলী যেমন, জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এই গুণগুলো বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ তারা নিজেরাও জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। তাই তারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শক্তিকে নিজের জ্ঞান ও শক্তির উপর আন্দাজ করে নেয়। আর আল্লাহ্‌র যে গুণগুলো মানুষের গুণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেগুলো যদি বর্ণনা করা হয়, তবে সাধারণ মানুষ তা অনুধাবন করতে পারবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো এমনি ধরনের, যেমন কোন শিশু বা খোজাকে যদি স্ত্রী-সহবাসের আনন্দের কথা বুঝাতে হয়, তবে খাওয়া-দাওয়ার আনন্দ ও স্বাদ দিয়ে বোঝানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এ উপলব্ধি বাস্তব উপলব্ধি নয়। এই দুই উপলব্ধির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শক্তি এবং মানুষের জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার আনন্দ ও স্ত্রী-সহবাসের আনন্দের মধ্যে যে পরিমাণ পার্থক্য রয়েছে, তার চাইতেও তা অনেক বেশী।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো মানুষ কেবল নিজের সত্তা ও গুণেরই ধারণা করতে পারে। অতঃপর সে নিজের উপর অনুমান করে অন্যের সত্তা ও গুণের অনুমান করতে পারে। এক্ষেত্রে সে এটাও বুঝতে পারে

যে, তার নিজের ও অন্যের মধ্যে পূর্ণতার দিক থেকে কতটুকু পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং মানুষ স্বয়ং কর্ম, শক্তি, জ্ঞান এরূপ যত গুণের অধিকারী, কেবল সেগুলোকেই সে আল্লাহ্‌র জন্য প্রমাণ করতে পারে। শুধু পার্থক্য হলো—সে আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে নিজ গুণাবলীর চাইতে অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করে। সুতরাং অনুসিদ্ধান্তে বলা যায় যে, বস্তুত মানুষ নিজের গুণেরই প্রতিষ্ঠা করে থাকে। আল্লাহ্‌র খাস গুণাবলীকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই নবীজী বলেছিলেন: "হে আল্লাহ্! তুমি স্বয়ং যেভাবে তোমার প্রশংসা করেছ, তদ্রূপ আমি করতে পারি না।" এই হাদীসের অর্থ এ নয় যে, নবীজী আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রতি অনবহিত ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করতে অক্ষম ছিলেন। তার মানে হলো তিনি স্বয়ং স্বীকারোক্তি করেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলীর হকিকত অনুধাবনে তিনি অক্ষম। কোন কোন আল্লাহ্ ভীরু লোক বলেন, আল্লাহ্‌র হকিকত কেবল আল্লাহ্‌ই বুঝতে সক্ষম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেন: সেই আল্লাহ্‌ই প্রশংসার যোগ্য, যিনি নিজ পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন যে, মানুষের বোধগম্য না হওয়াই হলো তাঁর পরিচয়।"

আমি আবার আসল উদ্দেশ্যে ফিরে আসছি। সেই পাঁচ প্রকার রহস্যের মধ্যে এক প্রকার হলো—এমন সব বিষয়, যা জ্ঞান-গণ্ডি বহির্ভূত। তন্মধ্যে একটি হলো—আত্মা। আল্লাহ্‌র কোন কোন গুণও এ শ্রেণীভুক্ত। পরবর্তী হাদীসটিও এ মর্মে ইংগিত বহন করছে: নবীজী বলেন: আল্লাহ্ সত্তরটি নূরের পর্দার মধ্যে অবস্থিত। সেগুলো খুলে গেলে অবলোকনকারী দগ্ধ হয়ে যাবে।"

২. দ্বিতীয় প্রকারের রহস্য নবী ও সত্যিকার বান্দাগণ প্রকাশ করেন না। এ বিষয়গুলো অনুধাবনযোগ্য বটে, কিন্তু সেগুলোর প্রকাশ অনেকের পক্ষে ক্ষতিজনক। অবশ্য নবী ও সত্যিকার বান্দাদের পক্ষে ক্ষতিজনক নয়। যেমন 'জব্‌র' ও 'কদ্‌র'—এ বিষয়টি। এ ব্যাপারটি প্রকাশ করার অধিকার উলামারও নেই। এটা বিচিত্র নয় যে, কোন কোন হকিকতের প্রকাশ কতক লোকের পক্ষে ক্ষতিকর, আবার কতকের পক্ষে তদ্রূপ নয়। যেমন সূর্যের কিরণ বাদুড়ের পক্ষে এবং গোলাপের সুগন্ধ গুব্‌রে পোকার জন্য ক্ষতিকর। অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, কুফ্‌র, ব্যভিচার, গুনাহ্, অন্যায়—এসবই আল্লাহ্‌র আদেশে

সম্পন্ন হয়—এ বিশ্বাস সত্য বটে, কিন্তু অনেকের পক্ষে তা ক্ষতিকর। কেননা তাদের মতে, এটা অন্যায় ও হেক্‌মত-বিরোধী এবং এ বিশ্বাস করার মানে—যেন অন্যায় ও যুলুমের বৈধতা স্বীকার করা। এসব কথা ভেবেই ইব্‌নুর রাবিন্দী ও কতক অথর্ব লোক বিধর্মী হয়ে গেছে। 'কাযা-কদর' (নির্ধারিত ভাগ্য) এর ব্যাপারটিও তদ্রূপ। যদি এর রহস্য প্রকাশ করা হয়, তবে অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র অক্ষমতার কথা ভাবতে শুরু করবে। অন্যদিকে, এ সন্দেহ দূর করার জন্য যে প্রকৃত উত্তর রয়েছে, তা জনসাধারণের ধারণাতীত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রহস্যটি এমনিভাবেও বোঝানো যায়ঃ যদি বলা হতো যে, কেয়ামত সংঘটিত হতে এখনো এক হাজার বছর বা তার চাইতে বেশী বা কম সময় বাকি আছে, তবে প্রত্যেকটি মানুষ অবশ্য তা বুঝে নিতে পারতো। কিন্তু এর জন্য সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হলে তা হতো মঙ্গলের পরিপন্থী এবং তাতে মানুষের ক্ষতিই সাধিত হতো। কেননা কেয়ামতের আগমন যদি দূরবর্তী বলে ঘোষিত হতো, তবে লোকেরা এর তেমন পরোয়াই করতো না। আর যদি নিকটবর্তী বলে ঘোষিত হতো, তবে লোকেরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো যে, কাজ-কর্মই তারা ছেড়ে দিতো। ফলে দুনিয়াটা অচল হয়ে পড়তো।

৩. তৃতীয় শ্রেণীর রহস্য হলো—এমন কতগুলো বিষয়—তা যদি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হতো, তবে মানুষ অবশ্য সেসব বুঝতে পারতো এবং তাতে তাদের কোন ক্ষতিও হতো না। কিন্তু সেগুলোকে রূপকভাবে বা ইংগিতে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাদের মনে সে বিষয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করা। যেমন কেউ যদি বলে, "আমি অমুককে শূকরের গলায় মুক্তার হার পরাতে দেখছি", আর তার একথা বোঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, শিক্ষক অনুপযুক্ত লোকদের শিক্ষা দিচ্ছে, তবে সাধারণ শ্রোতাগণ অবশ্য এ বাক্যের প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করবে। কিন্তু একজন পণ্ডিত লোক যখন চিন্তা করে দেখবে যে, সেখানে শূকরও নেই, মুক্তাও নেই, তখন তাঁর ধারণা ধাবিত হবে সেই আসল তথা রূপক অর্থের দিকে।

এ ধরনের আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো নবীজীর একটি হাদীস। তা হলো—"থুথু ফেলার দরুন মসজিদ দুঃখিত হয়ে এমনি সংকুচিত হয়, যেমন চর্ম সংকুচিত হয় অগ্নি দাহনে।" থুথু ফেলার দরুন

মসজিদ-দেহে প্রকাশ্যে কোন সংকোচন দৃষ্ট না হলেও তাতে হাদীসের যথার্থতায় গায়ে আঁচড় লাগতে পারে না। কেননা হাদীসের উদ্দেশ্য হলো—মসজিদ সম্মানের বস্তু—একথা বোঝানো। এ হাদীসে থুথু ফেলার মানে মসজিদের অবমাননা করা। তাই এ কাজটি মসজিদের সম্মানের এত পরিপন্থী যেন চর্মকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করা। আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো—নবীজীর সেই হাদীসটি, যাতে তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উঠায়, আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করলেও যেন সে তাতে ভয় পায় না।" যদিও প্রকাশ্যভাবে কখনো মানুষের আকারের এরূপ কোন পরিবর্তন ঘটেনি, আর ঘটবেও না। তবুও এতে হাদীসের গায়ে আঁচড় লাগতে পারে না, কারণ আসল উদ্দেশ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে কথাটি ঠিকই আছে। কেননা আকৃতির দিক থেকে গাধার মাথায় কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। তার যেটুকু বৈশিষ্ট্য আছে, তা হলো বোকামি ও আহাম্মকির দিক থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমামের আগে রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে, আহাম্মকির দিক থেকে তার মাথা যেন গাধারই মাথা। যে ব্যক্তির কারো পেছনে থাকার কথা, সে যদি অগ্রে চলে যায়, তবে তা কি চরম আহাম্মকি নয়? এখানে যে প্রকাশ্য অর্থ উদ্দিষ্ট নয়, তা বুদ্ধিজাত যুক্তিতেই বোঝা যায়। তাছাড়া শরীঅত ভিত্তিক যুক্তিতেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়। বুদ্ধিজাত যুক্তি হলো—এখানে প্রকাশ্য অর্থ করা সম্ভব নয়। নবীজীর অন্য একটি বাণীতেও এরূপ রূপক অর্থ দেখা যায়। তা হলো—"মুসলমানদের অন্তর আল্লাহ্র দুই অঙ্গুলির মাঝখানে অবস্থিত।" অথচ বাস্তবে মুসলমানদের অন্তরে কোথাও অঙ্গুলি দেখা যায় না। এতে বোঝা যায় যে, অঙ্গুলির অর্থ এখানে শক্তি। কেননা অঙ্গুলির আসল হকিকত হলো শক্তি। অঙ্গুলি শব্দটি উচ্চারণ করে শক্তির অর্থ করা—এটাই হলো পরিপূর্ণ শক্তি বর্ণনার সর্বোত্তম পন্থা। তাই হাদীসের ভাবার্থ হবে ঃ মুসলমানদের অন্তর ঐশ শক্তির প্রতীক। এভাবে শক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চাই, তখন বলি—'হও' আর তখনি তা হয়ে যায়।" এখানে প্রকাশ্য অর্থ কিছুতেই করা যায় না। কেননা যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই, তাকে কি করে সম্বোধন করা যায়? সম্বোধনই যদি ঠিক না হলো, তবে আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর যদি

কোন বস্তুর সৃষ্টি হওয়ার পর এ সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে তা হবে নিরর্থক। কিন্তু এটাই হলো আরবী ভাষায় অতুলনীয় শক্তি বর্ণনার উত্তম পদ্ধতি। তাই এখানে সে পদ্ধতিটাই প্রয়োগ করা হলো। শরীঅত ভিত্তিক যুক্তিতেও বোঝা যায় যে, এরূপ স্থলে প্রকাশ্য অর্থ করা সম্ভব নয়। যেমন কুরআনে আছেঃ "তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর উপত্যকাসমূহ তাদের ধারণ ক্ষমতা মোতাবেক নিজেদের জন্য পানি চেয়ে নিয়েছে।" 'পানি' শব্দে অর্থ করা হয়েছে—'কুরআন', আর 'উপত্যকা' শব্দে বোঝানো হয়েছে—অন্তর। কোন কোন উপত্যকায় খুব বেশী তৃণ-লতা জন্মায়, আবার কোন কোনটায় কম, আবার কোনটায় মোটেও থাকে না। পানি থেকে উদ্ভূত ফেনা দিয়ে বোঝানো হয়েছে—কুফ্‌র্ ও কপটতা। কেননা যদিও তা স্পষ্টত দেখা যায় এবং পানির উপরই ভাসমান থাকে, তবুও মূলত তা অস্থায়ী। কুফর ও কপটতাও ঠিক তেমনি ধরনের। পক্ষান্তরে হেদায়ত, যা মানুষের উপকারে আসে, তা হলো দীর্ঘস্থায়ী।

লোকেরা কেয়ামতের দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত ইত্যাদিকেও তৃতীয় শ্রেণীর রহস্যের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এগুলোকে তারা রূপক অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু এ ধরনের ব্যবহার বেদা'ত। কেননা এর সমর্থনে কোন হাদীস দেখা যায় না। দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত ইত্যাদির বাহ্য অর্থে প্রয়োগে কোন অযৌক্তিকতা সৃষ্টি হয় না। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রকাশ্য অর্থ করাই প্রয়োজন।

৪. চতুর্থ প্রকার রহস্য হলো—মানুষ কোন বস্তুকে প্রথমত মোটামুটিভাবে বুঝে নেয়। অতঃপর মনোনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করে তার স্বরূপ এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, যা সর্বক্ষণ তার অন্তর-চোখে ভাসতে থাকে। কোন বস্তুকে মোটামুটি দেখা ও গভীরভাবে উপলব্ধি করা—এ দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে এত বড় পার্থক্য রয়েছে, যেমন পার্থক্য থাকে খোসা ও শাঁসের মধ্যে, অন্য কথায়, জাহির ও বাতিনের মধ্যে। এর দৃষ্টান্ত হলো কোন ব্যক্তি যদি অন্ধকারে থেকে বা দূর থেকে কোন বস্তু অবলোকন করে, তবে সেই জ্ঞান হবে এক ধরনের। কিন্তু যদি আলোতে থেকে বা নিকট থেকে সেই বস্তুটি দেখে, তবে সেই জ্ঞান হবে অন্য ধরনের। দ্বিতীয় অবস্থা প্রথম অবস্থার পরিপন্থী নয়, বরং তা হলো প্রথম অবস্থারই পূর্ণতা সাধন। ঈমানের ব্যাপারটিও তদ্রূপ। মানুষ প্রেম, পীড়া, মৃত্যু—

এ সবই বিশ্বাস করে। কিন্তু সে যখন নিজেই এসবের ভুক্তভোগী হয়, তখন তার বিশ্বাস পূর্বকার বিশ্বাসের চাইতে অধিকতর গভীর না হয়ে পারে না। মানুষের কামাসক্তি, প্রেম এবং অন্যান্য ভাবাবেগের বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এসব ব্যাপারে ভুক্তভোগী হওয়ার পূর্বে এক ধরনের অবস্থা থাকে, ভোগের অবস্থায় তা অন্য ধরনের হয় এবং ভোগ অবসানের পর তার ভিন্ন অবস্থা দাঁড়ায়। বিভিন্ন স্তরে এসব বিষয়ে বিশ্বাসের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। আমরা দেখতে পাই, ক্ষুধা নিবারিত হলে সেই অনুভূতি আর থাকে না, যা ক্ষুধার সময় হয়ে থাকে। ধর্মীয় জ্ঞানের অবস্থাও তদ্রূপ। জ্ঞান যদি স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির পর্যায়ে উপনীত হয়, তাকেই বলা হয় পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। এ পূর্ণতা লাভের পূর্বাবস্থাকে বলা হয়—বাহ্যজ্ঞান (যাহিরী ইল্ম্)। আর তার পূর্ণতা লাভের পর দৃঢ় জ্ঞানকে বলা হয় অন্তর্নিহিত জ্ঞান (বাতিনী ইল্ম)। একজন রোগীর মনে সুস্থতার যে ধারণা থাকে, তা একজন স্বাস্থ্যবান লোকের ধারণা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র।

এ চার শ্রেণীর রহস্যে মানুষের জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই অন্তর্নিহিত জ্ঞান বাহ্য জ্ঞানের পরিপন্থী হয় না। বরং অন্তর্নিহিত জ্ঞান বাহ্য জ্ঞানের এমনি পরিপূরক, যেমন শাঁস খোসার পরিপূরক।

৫. এমন কতগুলো বিষয় আছে, যেখানে জড় বস্তুকে মানব মূর্তিরূপে কল্পনা করা হয় এবং তার ব্যঞ্জনাসূচক কথাকে বাস্তবিক মানুষের কথারূপে অভিহিত করা হয়। সংকীর্ণমনা লোকেরা বাহ্য দিকটা নিয়ে আটকে পড়ে। তারা এই রূপক কথাবার্তাকেই সত্যিকার কথাবার্তা বলে মনে করে। কিন্তু গূঢ়তত্ত্বের অনুধাবকেরা আসল রহস্য উপলব্ধি না করে ক্ষান্ত হন না। প্রবাদ আছে ঃ "দেয়াল পেরেককে বললো, তুমি আমাকে ছেদ কর কেন? পেরেক বললো, ওর কাছেই জিজ্ঞেস কর, যে আমাকে ঘা দিচ্ছে। কারণ আমি স্বাধীন নই।" এখানে পেরেককে মানব মূর্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং তার মুখে মানুষের ভাষা দেওয়া হয়েছে। পেরেকের ভাবভঙ্গি-মূলক ভাষাকে তার মৌখিক ও উচ্চারণমূলক ভাষারূপে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে এর একটি দৃষ্টান্ত অনুধাবন করুন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"অতঃপর আল্লাহ্ আকাশ পানে এমতাবস্থায় লক্ষ্য করলেন, যখন তা ছিল ধূম্রময়। তিনি আকাশ ও জমিনকে সম্বোধন করে বললেন, খুশিতে হোক, আর অখুশিতেই হোক, তোমরা উপস্থিত হও; তখন উভয়ই বললো: আমরা খুশি সহকারেই হাযির হলাম।"

আহাম্মকদের মতে, এর অর্থ হলো আকাশ-জমিনেরও বিবেক-বুদ্ধি আছে। তাই অক্ষর ও আকার যোগে আল্লাহ্ আকাশ ও জমিন-কে এ কথাগুলো বলেছিলেন। তারা সেগুলো বুঝেছিল এবং উত্তরে বলেছিল যে, আমরা উপস্থিত আছি। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা জানেন, এটা ছিল ব্যঞ্জনাসূচক ও রূপক কথা। এতে এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, আকাশ-জমিন আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন। কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ্র এমনি ধরনের আরো আরো বাণী রয়েছে:

"এমন একটি বস্তুও নেই, যা আল্লাহ্র প্রশংসায় তস্বীহ্ পাঠ করছে না।"

আহাম্মক লোকেরা এ আয়াতের যে অর্থ করে, তা হলো এই: জড় বস্তুতেও জীবন, বুদ্ধি ও বাক্শক্তি রয়েছে এবং তা সত্যিই 'সুব্হানাল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা জানেন, এখানে উচ্চারণীয় কোন ভাষার কথাই বলা হয় নি বরং আল্লাহ্র এ কথা বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, জড় বস্তুর অস্তিত্বটাই তাঁর তস্বীহ্ স্বরূপ এবং তা তাঁর পবিত্রতা ও একত্ববাদের সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন কোন কবি বলছেন:

"প্রত্যেক বস্তুতেই আল্লাহ্র এমন নিদর্শন রয়েছে, যা তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য বহন করছে।" রূপক ভাষায় বলা হয়: "এ উৎকৃষ্ট শিল্পটি কারিগরের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছে।" এর মানে এ নয় যে, সেই শিল্পই নিজ মুখে কথা বলছে, বরং তার অবস্থা ও লক্ষণে এ অর্থটি অনুমিত হয়। এমনিভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল। স্রষ্টা কোন বস্তুকে সৃষ্টি করে, সেটাকে ও সেটার গুণকে সে স্থায়িত্ব দান করে এবং তার অবস্থারও পরিবর্তন সাধন করে। সৃষ্ট বস্তুর এই নির্ভরশীলতাই হলো স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও তার পবিত্রতার প্রতি সাক্ষ্যদান। কিন্তু প্রকাশ্যবাদীদের দৃষ্টি কেবল বাহ্য দিকটার উপরই পড়ে। তাই তারা এ সাক্ষ্য বুঝতে অক্ষম। কেবল অন্তর্বাদীরাই এ সাক্ষ্য অনুধাবন করতে পারে। এজন্য আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন:

"কিন্তু তোমরা (প্রকাশ্যবাদীরা) তাদের তস্‌বীহ্‌ বুঝতে পারছো না।"

অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তো এর অর্থ মোটেই বুঝে না। ঝানু আলিম ও আল্লাহ্‌র প্রিয়জনেরা অবশ্য বুঝেন। কিন্তু তাঁরাও গূঢ়তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝতে অক্ষম। কেননা জড়বস্তু আল্লাহ্‌র পবিত্রতা সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেয়, তা নানা ধরনের। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি মাফিক সেগুলো উপলব্ধি করে থাকে। এ সাক্ষ্য দানের রকমারি বর্ণনা করা সমাজবিদ্যার কাজ নয়।

মোট কথা, এটা এমন একটা মনযিল, যেখানে প্রকাশ্যবাদী ও অন্তর্বাদীদের মধ্যে নিহিত পার্থক্য ধরা দেয়। তাই প্রতীয়মান হয় যে, যাহির ও বাতিনের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে।

এ মনযিলে লোকেরা চরম কড়াকড়িও করে, আবার চরম নমনীয়তাও অবলম্বন করে। কেউ কেউ এত অগ্রসর হন যে, তাঁরা যাহির ও বাহ্য দিকটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন। যেমন আল্লাহ্‌র নিম্নলিখিত বাণীকেও তাঁরা বাহ্য অর্থে ব্যবহার করতে রাজী নন ঃ

"এবং আমার সঙ্গে তাদের হাত কথা বলবে; তাদের পা সাক্ষ্য দেবে, তারা আপন ত্বককে বলবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? ত্বক বলবে ঃ আমাকে আল্লাহ্‌ বাক্‌শীল করেছেন, যিনি সব বস্তুকে বাক্‌শীলতা দান করেছেন।"

এমনিভাবে মুন্‌কির-নকীরের প্রশ্নোত্তর, দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত, হিসাব-কিতাব, দোযখবাসী ও বেহেশতবাসীদের মধ্যে বিতর্ক, দোযখীদের সামান্য পানির জন্য আকুল আবেদন—এ সবকে তাঁরা রূপক অর্থেই ব্যবহার করেন।

আবার অন্য সম্প্রদায় এত বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তাঁরা আক্ষরিক অর্থ করতে গিয়ে রূপক অর্থের দ্বারই বন্ধ করে দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল এ সম্প্রদায়ের অন্যতম। তিনি সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র 'হও' (কুন্‌) বলা, অতঃপর "তা হয়ে যায়" (ফা-ইয়াকুন্‌)—এ বাণীতেও তাবীল করতে নিষেধ করেন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেন, প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ্‌ 'কুন্‌' শব্দ বলে থাকেন। আমি ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বলের কোন কোন অনুবর্তীকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম সাহেব নাকি তিনটি হাদীস ছাড়া আর

কোথাও 'তাবীল' করা বৈধ মনে করতেন না। সেই তিনটি হাদীস হলো : (১) "কালো পাথর (হাজর-এ-আস্ওয়াদ্) দুনিয়াতে আল্লাহ্র ডান হাত স্বরূপ।" (২) "মুসলমানের অন্তর আল্লাহ্র দুই অঙ্গুলির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।" (৩) "আমি ইয়েমেন থেকে আল্লাহ্র গন্ধ পাচ্ছি।" ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল সম্পর্কে এ ধারণা করা যায় না যে, তিনি আরশের প্রতি আল্লাহ্র ধাবিত হওয়াকে আরশের উপর তাঁর আসীন হওয়া অর্থ করেছেন বা আকাশ থেকে কোন কিছুর অবতরণকে স্থানীয় অবতরণের অর্থে গ্রহণ করেছেন। তবে হয়তো তিনি জনসাধারণের উপকারার্থে আগেভাগেই তাবীল করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ কোন বস্তুর জন্য দ্বার খুলে দিলে শেষ পর্যন্ত তা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, তিনি যদি তাবীলের প্রশ্নে বাধা-বিঘ্ন আরোপ করে থাকেন, তবে অন্যায় কিছু করেন নি। পূর্বসূরীদের কাজ-কর্মেও এ নীতির সমর্থন মেলে। তাঁরা এ ধরনের জায়গায় বলতেন : যেভাবে আল্লাহ্-রসূলের বাণী বিবৃত হয়েছে, সেভাবেই থাকতে দিন।

ইমাম মালিকের নিকট কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আরশের প্রতি আল্লাহ্র ধাবমান হওয়ার অর্থ কি? তিনি বল্লেন, ধাবমান হওয়ার কথাতো জানি। কিন্তু কিভাবে ধাবিত হলেন, তা জানি না। তবুও এটা বিশ্বাস করা কর্তব্য। কিন্তু এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিদা'ত।

কোন কোন লোক চরম প্রকাশ্যবাদ ও চরম অন্তর্বাদের মধ্যে সমতা ও মধ্যবর্তিতা সৃষ্টির জন্য কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত আল্লাহ্র গুণাবলীর তাবীল করে থাকেন এবং কেয়ামত সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তা স্পর্শ করতে ও তাতে তাবীলের আশ্রয় নিতে নিষেধ করেন। এঁরা হলেন আশায়েরা। মুতাযিলা সম্প্রদায় আরো কিছুটা অগ্রসর হন। তাঁরা আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে তাঁর দর্শন ও শ্রবণের তাবীল করেন এবং নবীজীর মে'রাজকে অশারীরিক মেরাজ বলে পরিগণিত করেন। তাঁরা কবরের শাস্তি, দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত ইত্যাদিরও তাবীল করেন। তথাপি তাঁরা এতটুকু স্বীকার করেন যে, পরকাল হবে শারীরিকভাবে। বেহেশতের পানাহার, সুগন্ধ গ্রহণ, বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য উপভোগও হবে বস্তুনিষ্ঠভাবে। এমনিভাবে দোযখের শাস্তি

হবে শারীরিকভাবে। এরূপ আগ্নেয় উপাদান থাকবে, যাতে শরীরের ত্বক পুড়ে যায়। মুসলিম দার্শনিকগণ এ ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়ে যান। তাঁরা বলেন, কেয়ামত সম্পর্কিত যত উপভোগ ও কষ্টের কথা বর্ণিত হয়েছে, সবই আধ্যাত্মিক। এঁরা দৈহিক পরকালে অবিশ্বাসী এবং আত্মার স্থায়িত্বে বিশ্বাসী। এঁরা বলেন, আত্মাকে যে শান্তি বা শাস্তি দেয়া হবে, তা ইন্দ্রিয়গম্য হবে না।

এঁরা সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। দার্শনিকদের অতিআজাদী ও হাম্বলীদের কঠোরতার মাঝখানে অপর একটি পথ আছে, যা খুবই সূক্ষ্ম। তাঁরাই সে পথের সন্ধান লাভ করতে পারেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তওফীক বা ঐশ ক্ষমতা দান করেন। তাঁরা বস্তু সমূহকে রেওয়াইয়াত (পরম্পরাগত বর্ণনা) দিয়ে বিচার না করে আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকেই বিচার করে থাকেন। বস্তুর গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটিত হওয়ার পরেই তাঁরা শাব্দিক বর্ণনা ও শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তখন যেসব বর্ণনা ও ধারণা তাঁদের কাছে ঐশ জ্ঞান মাফিক বলে মনে হয়, সেগুলোকেই তাঁরা সঠিক অর্থ বলে ধরে নেন। আর যেগুলো বাহ্য বর্ণনার পরিপন্থী বলে মনে হয়, সেগুলোর তাবীল করেন। যাঁরা কেবল শব্দকে আঁকড়ে ধরে রাখেন, তাঁদের কোথাও ঠাঁই নেই। তাঁদের আশ্রয়স্থল কোথাও নেই। তাঁদেরকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পথই ধরতে হবে। আর যদি সত্যিকার সমতা ও মধ্যবর্তী পথের সন্ধান লাভ করতে হয়, তবে আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-জগতে প্রবেশ করতে হবে। এর জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। তাই আমি সেদিকে যেতে চাই না।

এখানে শুধু এতটুকু প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, যাহির ও বাতিন পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। উক্ত পাঁচ প্রকার রহস্যের বিস্তারিত আলোচনার ফলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

তাবীল সম্পর্কে ইমাম গাযালীর 'ফসূলুত্‌তাফ্‌রিকা' গ্রন্থের সারমর্ম ঃ

ইমাম গাযালী উক্ত সূক্ষ্ম প্রবন্ধে বিতর্কমূলক ও অস্পষ্ট বিষয়াদিকে যেভাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করেছেন, তাতেই তাবীল-সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। তথাপি তাবীল কত প্রকার, তাবীলের বৈধতার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে, গুরুত্বের দিক

থেকে কোন্ ধরনের তাবীলের কোথায় অবস্থান—এসব বিষয়ে তিনি 'ফসলুত্তাফরিকা' নামক বিশেষ একটি পুস্তিকা রচনা করে জটিলতার অনেকটা সুরাহা করে দিয়েছেন। তাই এর সারাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করি।

তিনি বলেন, বস্তুর অস্তিত্ব পাঁচ প্রকার ঃ

১. বাস্তব অস্তিত্ব, যেমন আকাশ-জমিনের অস্তিত্ব।

২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব, অর্থাৎ যে অস্তিত্ব কেবল বিশেষ ইন্দ্রিয় শক্তির অধিকারীর কাছে বোধগম্য—যেমন স্বপ্নে দেখা ঘটনাবলী, রোগীর জাগ্রত অবস্থায় দেখা ছবি, নবীর দেখা ফেরেশতার ছবি। ইমাম সাহেব এসব অস্তিত্বকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে অভিহিত করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বের আলোচনায় তিনি বলেন ঃ

"বরং কখনো কখনো নবী আর ওলীরাও জাগ্রত ও সুস্থ অবস্থায় দেখতে ফেরেশতার ন্যায় মনে হয়, এমন সুন্দর ছবি দেখতে পান। এ ছবির মাধ্যমেই নবী ও ওলীদের উপর ওহী ও এলহাম (অন্তরঢালা জ্ঞান) অবতীর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং যেসব অদৃশ্য বস্তু অন্যান্য মানুষেরা নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পায়, নবী ও ওলীদের অন্তর সাফ বলে তাঁরা সেগুলো জাগ্রত অবস্থায়ই দেখতে পান। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ মরিয়ম (আঃ)-এর সামনে জিব্রাঈল (আঃ) অবিকল মানুষের আকার ধারণ করে এসেছিলেন। এ অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরো বলা যায় যে, রসূল করীম জিব্রাঈলকে বহুবার দেখেছিলেন।

৩. কাল্পনিক অস্তিত্ব।

৪. বুদ্ধিসম্মত অস্তিত্ব। যেমন আমরা বলি, এ বস্তুটি আমার হাতে আছে এবং তাতে এ অর্থ করা যায় যে, এটি আমার অধিকারে আছে। এ ধরনের হস্তগত অস্তিত্ব হলো বুদ্ধিসম্মত অস্তিত্ব। কেননা হস্তগত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হলো অধিকারভুক্ত হওয়া এবং শক্তি অর্জন করা।

৫. সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব, অর্থাৎ স্বয়ং সে বস্তুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে, এমন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। ইমাম সাহেব এর দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করেছেন আল্লাহ্র ক্রোধ ইত্যাদিকে। ক্রোধের আসল অর্থ হলো—অন্তরের খুন উথলে উঠা। এটা জানা

কথা যে, আল্লাহ্ এরূপ মতি-গতি থেকে মুক্ত। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি বস্তু আছে, যা ক্রোধ-সদৃশ।

অস্তিত্বের এ রকমারি বর্ণনা করার পর ইমাম গাযালী বলেন ঃ

"মনে রাখুন, যে ব্যক্তি শরীঅতের কোন বিষয়কে এসব অস্তিত্বের মধ্যে যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করে, তাকে শরীঅতের বিশ্বাসী বলে গণ্য করতে হবে। যে ব্যক্তি এসব অস্তিত্বের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে শরীঅতকেই অস্বীকার করে।"

এর পর ইমাম গাযালী গুরুত্বের দিক থেকে এসব অস্তিত্বের স্ব-স্ব অবস্থান নির্ধারণ করেন। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কুরআন-হাদীসে যে সব বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, সে সবের অস্তিত্বকে বাস্তব অস্তিত্ব বলে ধরে নিতে হবে। যদি কোন প্রমাণে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তা বাস্তব অস্তিত্ব হতে পারে না, তবে সে ক্ষেত্রে তাকে হয়তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নয়তো কাল্পনিক, নয়তো বুদ্ধিসম্মত, নয়তো সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব বলে সাব্যস্ত করতে হবে। অতঃপর ইমাম সাহেব এসব অস্তিত্বের স্ব-স্ব অবস্থান ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকটির উদাহরণ পেশ করেন এবং বলেন যে, তাবীল থেকে কোন সম্প্রদায়ের গত্যন্তর নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—হাদীসে আছে "মানুষের কর্ম ওজন করা হবে।" কর্ম হলো একটি গুণ বিশেষ। এটা জানা কথা যে, গুণ কখনো ওজন করা যায় না। তাই কর্মের পরিমাপ করাও সম্ভব নয়। এজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই তাবীল করতে হয়।

আশায়েরাপন্থী তাবীল করে বলেন, কর্ম নয়, বরং কর্ম সংক্রান্ত কাগজ-পত্রেরই ওজন করা হবে। মুতাযিলার মতে, এখানে দাঁড়ি-পাল্লার পরিমাপ বোঝানো হয় নি, বরং পরিমাপের অর্থ হলো—পাপ-পুণ্যের অনুমান করা। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন দাঁড়ি-পাল্লা হবে না।

ইমাম গাযালী যেভাবে অস্তিত্বের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন এবং সেগুলোর হকিকত তুলে ধরেছেন, তাতে তাবীলের বিষয়টি পরিষ্কার না হয়ে পারে না। এজন্য শেষ যুগীয় ইমামগণ, যেমন ইমাম রাযী, আল্লামা আমুদী প্রমুখ ইমাম গাযালী প্রণীত নীতি অনুসারেই তাবীলের

বিষয়টি সুরাহা করেন। কিন্তু একটি বিষয় অস্পষ্ট থেকে গেল, যার ফলে এ যাবত শত শত ভ্রান্তি সংঘটিত হচ্ছে। তা হলো— ইমাম সাহেব তাবীলের নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, যেখানে প্রকাশ্য অর্থ করা ঠিক হবে না বলে নিশ্চিত প্রমাণ থাকবে, কেবল সে ক্ষেত্রেই অপ্রকাশ্য তথা অন্যান্য অর্থের চিন্তা করা যেতে পারে। এ নীতি অবশ্য পুরোপুরি ঠিক। তবে কথা হলো —'নিশ্চিত প্রমাণ' শব্দগুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এ শব্দ দুটো সম্পর্কে ভুল বোঝা-বুঝির ফলেই শত শত ভুলের অবতারণা করা হয়েছে।

ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী প্রমুখ 'নিশ্চিত প্রমাণ' বলতে একথাই বুঝিয়েছেন যে, বাস্তব ও প্রকাশ্য অর্থ নিলে যদি কোন প্রকার অসম্ভাব্য কিছু দেখা দেয়, তবেই তাবীল করা যাবে। অন্যথা নয়। এখন প্রশ্ন হলো 'অসম্ভাব্য শব্দটি নিয়ে। যে ব্যাপারটির ঘটে যাওয়া বিবেক বিরোধী, সেটাকে 'অসম্ভাব্য' বলা হয়। আবার যা বিবেক বিরোধী নয়, কিন্তু সাধারণত ঘটে না, সেটাকেও 'অসম্ভাব্য' বলে পরিগণিত করা হয়। ইমাম গাযালীর মতে, যদি প্রকাশ্য অর্থ বিবেক বিরোধী হয়, তবেই তাবীল করা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি শারীরিক হাশ্‌র অস্বীকারকারীকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ তাঁর নিকট কেয়ামতের দিন মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়া বুদ্ধি বিরুদ্ধ নয়। তাই তাঁর মতে, এক্ষেত্রে তাবীলের কোন প্রয়োজন নেই।

ইমাম গাযালীর ভাবধারার সমালোচনা

আমাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, স্বয়ং ইমাম গাযালী ও ইল্‌মে কালামের অন্যান্য ইমামগণ উক্ত নীতিকে কতটুকু বাস্তবায়িত করেছেন? হযরত মরিয়মের সম্মুখে হযরত জিব্রাঈলের উপস্থিতিকে ইমাম গাযালী বাস্তব অস্তিত্ব বলে স্বীকার করেন না। এ অভিমতটি তিনি তাঁর 'ফস্‌লুত্‌তাফ্‌রিকা' নামক পুস্তিকায় ব্যক্ত করেন। অথচ তাঁর মতে, জিব্রাঈলের অস্তিত্ব হলো প্রকৃত ও বাস্তব। কুরআন শরীফে জড় বস্তুর তসবীহ্‌ পাঠের কথা রয়েছে। ইমাম গাযালী সেখানে প্রকাশ্য অর্থ করেন না। বরং তস্‌বীহ্‌ পাঠকে রূপক অর্থে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁর কথানুযায়ী জড় বস্তুর তসবীহ্‌ পাঠ বিবেক বিরুদ্ধ নয়। কুরআন শরীফে আছে, আল্লাহ্‌ যখন কোন

বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে থাকেন—'হও',। একথা বলা মাত্রই তা হয়ে যায়'। এখানেও ইমাম গাযালী আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন না। বরং রূপক অর্থেই তা ব্যবহার করেন। অথচ আল্লাহ্‌র পক্ষে এরূপ কথা বলা 'অসম্ভব' কিছু নয়। এভাবে শত শত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে।

এখন আমাদের নিজেদের খতিয়ে দেখতে হবে যে, এ নীতি কতটুকু যথার্থ? আমরা যখন কারো সম্পর্কে বলি—'অমুক ব্যক্তির হাত খোলা', তখন কি প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করলে কোন অযৌক্তিকতা দেখা দেয়? তার হাত সত্যিকার খোলা হওয়া কি অসম্ভব? এ সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি এ বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ করে না। বরং এর অর্থ করা হয় দানশীলতা ও বদান্যতা। প্রত্যেক ভাষায় শত শত স্থানে ভাবার্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেসব স্থানে আক্ষরিক অর্থ করা হলে কি অসম্ভাব্য কিছু দাঁড়ায়?

এখন রয়েছে বুদ্ধি বিরুদ্ধ অসম্ভাব্যের প্রশ্নটি। এটা আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। এক ব্যক্তি যে বস্তুটিকে অসম্ভাব্য বলে মনে করে, অন্য ব্যক্তি সে সম্পর্কে অন্যরূপ ধারণা পোষণ করে। আল্লাহ্‌র দিক-বিশিষ্ট হওয়া ইমাম গাযালীর কাছে অসম্ভাব্য। কিন্তু হাম্বলীদের কাছে তা সম্ভব। মৃত্যুর ভেড়ার আকার ধারণ করা আশায়েরার নিকট অসম্ভাব্য। কিন্তু অনেক মুহাদ্দিসের কাছে তা সম্ভব। ইমাম গাযালী এসব মতামতের প্রতি ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন। তিনি হাম্বলী-দেরকে কাফের রূপে আখ্যায়িত করেন নি। তিনি মনে করতেন, হাম্বলিগণ সেসব বস্তু স্বীকার করেন, যেমন আল্লাহ্‌র দিক-বিশিষ্ট হওয়া বা ইংগিত যোগ্য হওয়া—এগুলো যদিও প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব, তবুও হাম্বলিগণ এগুলোকে সম্ভব মনে করছে বলে তাঁরা এ ব্যাপারে ক্ষমার যোগ্য। ইমাম গাযালীর এ মনোবৃত্তিকে নিঃসন্দেহে উদারতা বলা যায়। তবে প্রশ্ন হলো এ উদারতা হাম্বলীদের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? 'হুকামা-এ-ইসলাম'-এর মতে, বিলীন পদার্থের পুনঃ অস্তিত্ব লাভ করা বিবেক বিরুদ্ধ ব্যাপার। তাই তাঁরা সশরীরে হাশর হওয়ার কথা অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে ইমাম গাযালী 'কাফের' বলছেন কেন?

‘অসম্ভাব্য’ শব্দটির ভুল ব্যাখ্যার দরুন অনেক ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হয়েছে

এ বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির দরুন অনেক ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি রচিত হয়েছে। ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী প্রমুখ বুদ্ধির দিক থেকে অসম্ভাব্য (মহাল-এ-আক্‌লী) বলতে যা বুঝিয়েছেন, তাতে দু’একটা বস্তু ছাড়া সবই সম্ভাব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য সব জায়গায়ই প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে হয় এবং শত শত কল্পনা-প্রসূত বিষয়কেও স্বীকার করে নিতে হয়। এই যে কল্পনা-প্রসূত বস্তুর স্বীকারোক্তির দ্বার উন্মোচিত হলো, তা ক্রমেই বেড়ে চললো।

বিভিন্ন রেওয়াইয়াতে (বর্ণনা) আছে ঃ

“সূর্য প্রত্যহ আরশের নীচে গিয়ে তাকে (আল্লাহ্-কে) সেজ্‌দা করে।” “আকাশে এত বেশী ফেরেশতা আছেন যে, তাঁদের বোঝার চাপে আকাশ থেকে ত্রাহি ত্রাহি আওয়াজ শ্রুত হয়।” “আল্লাহ্ আদিতে যখন হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর বাম পাঁজরের হাড় বের করে সেখান থেকে হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন।” “পৃথিবীর আদিমুহূর্তে আল্লাহ্ হযরত আদমের পিঠ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তান সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাদের নিকট থেকে নিজ প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি আদায় করে পুনরায় তাদেরকে তাঁর পিঠে অনুপ্রবিষ্ট করেন।” “সামিরী জিব্রাঈলের ঘোড়ার খুর থেকে ধূলি-কণা কুড়িয়ে নিল। অতঃপর মাটির একটি বাছুর প্রস্তুত করে সেই ধূলি-কণা তার পেটে প্রবেশ করালো। ফলে বাছুরটি হাম্বারব করতে লাগলো।” ইত্যাদি ইত্যাদি। উক্ত বর্ণিত হাদীস সমূহে যদি প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে আশায়েরার মতে, বিবেকের দিক থেকে অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন উঠে না। এ জন্য তাঁরা এসব স্থলে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

বিবেক-বিচারিত অসম্ভাব্যতার এ প্রশ্নটি সমস্ত মুসলমানকে আজ সংস্কারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ অমুক দরবেশ দরিয়ার সমস্ত পানিকে দুধে পরিণত করেছেন ; অমুক আল্লাহ্-প্রেমিক তাঁর শরীরের ত্বক খুলে ফেলেছেন ; অমুক কামিল লোকটি শত শত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেছেন। আশায়েরার ব্যাখ্যানুসারে এসব অসম্ভব কিছু নয়। তাই তাঁদের কাছে এসব বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন প্রকার সমালোচনা বা পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় না। এগুলো তাঁরা

এ বলে স্বীকার করে নেন যে, এসব ক্ষেত্রে অসম্ভাব্যতার কিছুই নেই। তাই মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়?

কুরআন মজীদ অবশ্যই আল্লাহ্‌র বাণী। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তা আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য তাদের ভাষাগত সব বৈশিষ্ট্যই তাতে পাওয়া যায় এবং এর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। এতে ভাবার্থ, রূপকার্থ, উপমা সব কিছুই রয়েছে এবং তা আরবী ভাষার সাধারণ রীতিনীতি অনুসারেই রয়েছে।

ভাবার্থ ও রূপক অর্থ গ্রহণ করার জন্য এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হলে যদি অসম্ভাব্যতা দেখা দেয়, কেবল তখনি ভাবার্থ বা রূপকার্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে। এরূপ কোন শর্ত মোটেও নেই। "হাম্মালাতাল হাতাব্"-এর অর্থ হলো কাষ্ঠ সংগ্রহ করা। কিন্তু কুৎসা রটানোর অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআন মজীদ আবু লাহাবের স্ত্রীকে 'হাম্মালাতাল্ হাতাব্' খেতাবে আখ্যায়িত করেছে। এখানে মৌলিক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু অভিধান রচয়িতাগণ এ শব্দটিকে কুৎসাকারীর অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। অথচ কোন ব্যক্তিই প্রকাশ্য অর্থ লংঘিত হয়েছে বলে তাঁদেরকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে না।

প্রকাশ্য অর্থ পরিহার করার জন্য এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, তা করা হলে অসম্ভাব্য কিছু একটা এসে দাঁড়াতে হবে। বরং অনেক স্থলে রচনার ভাবভঙ্গি বলে দেয় যে, এখানে মৌলিক অর্থ উদ্দিষ্ট নয়। কুরআন শরীফে আছে: "আমি আকাশ ও জমিনকে বলেছিলাম, খুশীতে হোক, আর অখুশীতে হোক, তোমাদেরকে আমার সামনে উপস্থিত হতে হবে। তখন উভয়ে বললো, আমরা খুশী মনে উপস্থিত আছি।" এখানে রচনাশৈলী বলে দিচ্ছে যে, শক্তিমত্তা প্রকাশের এটাই উত্তম পন্থা।

কোন কোন রচনার ভাবভঙ্গিতে এ ব্যাপারে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণে অসম্ভাব্যতা দেখা দেয় বলেই ভাবার্থ গ্রহণ করা হয়।

তাবীল বস্তুত তাবীল নয়

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মর্তব্য বিষয় রয়েছে। তা হলো—যে সব অর্থকে তাবীল বলে অভিহিত করা হয়, তা বস্তুত তাবীলের

পর্যায়ে পড়ে না। তাবীলের অর্থ হলো—প্রকাশ্য অর্থ পরিহার করে দ্বিতীয় অর্থ অবলম্বন করা। এখানে প্রকাশ্য অর্থ বলতে যা বোঝায়, তার ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ব্যবহারিক ও পরিভাষাগত অর্থও প্রকাশ্য অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু লোকেরা এটাকে তাবীল বলে আখ্যায়িত করেছে। অভিধানের নীতি হলো—একটি শব্দের একটি মাত্র অর্থ হওয়া। তবে একটি অর্থ নির্ধারিত হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে সামঞ্জস্যমূলক অন্যান্য অর্থও তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়। যেমন, 'ইখ্‌বাত্' (আরবী) শব্দটি। এর আসল মানে হলো—নুয়ে পড়া। কিন্তু এখন বিনয় ও শিষ্টাচারকেও 'ইখ্‌বাত্' বলা হয়। কারণ বিনয় প্রদর্শনটাই যেন নুয়ে পড়া। আরবীতে 'লফ্‌য্' শব্দটির মৌলিক অর্থ হলো—নিক্ষেপ করা। এখন এর অর্থ হলো—শব্দ বা উচ্চারণ। কেননা কোন শব্দের উচ্চারণ করা যেন তাকে মুখ থেকে নিক্ষেপ করা। এসব মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থ। এটাকে ইংরেজী ভাষায় 'সেকেণ্ডারী অর্থ' বলা হয়। এ ধরনের অর্থকেও অভিধানে শামিল করা হয়েছে এবং মৌলিক অর্থ রূপেই ব্যবহার করা হচ্ছে। আরবীতে এক-একটি শব্দের দশ-বিশটি অর্থ থাকে। এর মধ্যে মৌলিক অর্থ হলো মাত্র একটি। কিন্তু সে অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে, এমন আরো অর্থ সৃষ্টি হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে সেগুলো মৌলিক অর্থে পরিণত হয়। তা না হয়, যদি অভিধান গ্রন্থকে কেবল মৌলিক অর্থে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে সেসব গ্রন্থের আকার হ্রাস পেয়ে অর্ধেক বরং এক-চতুর্থাংশে পরিণত হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে যে সব অর্থকে তাবীল বলে অভিহিত করা হয়, তা তাবীলই নয়। কেননা সেগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রকাশ্য অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, শরীঅতে যে সব বস্তু আপাতদৃষ্টিতে আলোচ্য বিষয় বলে মনে হয়, সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। কতক বিষয় আছে, যা সাধারণ লোকের জ্ঞান বহির্ভূত। শরীঅত এসব বিষয়ের হকিকত বর্ণনা থেকে হয়তো সম্পূর্ণরূপে বিরত রয়েছে, নয়তো এমন উপমা ও রূপকের মাধ্যমে সেগুলো বর্ণনা করেছে, যাতে সে সম্পর্কে লোকের মোটামুটি ধারণা জন্মে।

আর কতগুলো বিষয় আছে, যা ততটা সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু সেগুলোর গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করা জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর।

আবার এমন কতগুলো বিষয়ও রয়েছে, যা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করা যেতো। কিন্তু তা না করে সেগুলো উপমা ও রূপকের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো—বিষয়গুলোকে হৃদয়গ্রাহী ও মনোপূত করে তোলা। যেমন আল্লাহ্‌র পরম ও চরম শক্তির বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "তিনি যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলেন, 'হও'; তখনি তা হয়ে যায়।" ইমাম রাযী এ বিষয়টিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন ঃ "অধিকাংশ লোক কেয়ামত সংক্রান্ত ঘটনাবলী যেমন—দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত ইত্যাদিকে অর্থের দিক থেকে এ শ্রেণীভুক্ত করেছে। কিন্তু এটা হলো বেদা'ত। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণে কোন অসম্ভাব্যতা দাঁড়ায় না।"

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, ইমাম গাযালীর এ অভিমত কেবল তাঁর 'এহ্ইয়াউল্ উলূম' ও 'ইলমে কালাম' গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'জওয়াহিরুল্ কুরআন' ও 'আল–মাদ্নূন' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি কেয়ামত সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করেন নি। বিস্তারিত বিবরণ পরে দেওয়া হচ্ছে।

কোন কোন স্থলে বিশেষ একটি অবস্থাকে মানব মূর্তিরূপে রূপায়িত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন জড় বস্তুর তসবীহ পাঠের বিষয়টি।

শরীঅতে যে সব বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, সব খানেই যে তাদের বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকতে হবে, এমন কোন শর্ত ধর্মের বিধি-বিধানে নেই। সে সব বস্তুর বাহ্যিক অস্তিত্ব না হয়ে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, কল্পিত, বুদ্ধিজনিত বা সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্বও হতে পারে। ইমাম গাযালী এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ভূমিকার পর এখন আসল উদ্দেশ্য বর্ণনায় হাত দিচ্ছি।

আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয়াদি

(ফেরেশ্‌তা, ওহী, কেয়ামতের ঘটনাবলী ইত্যাদি)

কুরআনে এসব বস্তুর উল্লেখ রয়েছে বলে তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। অন্যকথায়, মুসলমান হওয়ার জন্য এগুলো শর্ত। এজন্য প্রত্যেকটি মুসলিম সম্প্রদায়ে এসব ধর্মীয় বিশ্বাস মোটা-মুটি সমর্থিত। কিন্তু কুরআনে এসব বস্তুর হকিকত বর্ণিত হয়নি বলে বিভিন্ন সম্প্রদায় এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আশায়েরার মতে, প্রত্যেক বস্তুর গোচরীভূত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই এমনও হতে পারে যে, উল্লিখিত বস্তুগুলো বিদ্যমান আছে। কিন্ত গোচরীভূত হয় না।

আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ সম্পর্কে 'শর্‌হে মওয়াকিফ' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"আমরা এটা মানতে চাই না যে, দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য যে আটটি শর্ত রয়েছে, সেগুলো পাওয়া গেলেই তা গোচরীভূত হবেই।"

এ দাবি যতটা অদ্ভুত, এর যুক্তি তার চাইতেও অদ্ভুত। আশায়েরা তাঁদের দাবির প্রতিষ্ঠায় বলেন ঃ

"আমরা বড় পদার্থকে দূর থেকে ছোট দেখতে পাই। এর কারণ এটা হতে পারে যে, আমরা যে বস্তুর কতকাংশ দেখতে পাই, তার অন্য কতকাংশ দেখতে পাই না। অথচ কোন বস্তুর দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য যতগুলো শর্তের প্রয়োজন, তা সব অংশেই সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে।"

এরূপ শিশুসুলভ যুক্তি ও অনুমানের ফলেই আজ সমগ্র জাতি কল্পনাপ্রসূত ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারক ও বাহক হয়ে বসেছে।

কিন্তু আমাদের এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকাশ্যবাদী আশা-য়েরা ছাড়া অন্যান্য লোক এরূপ কল্পনাপ্রসূত ভাবধারার শিকারে পরিণত হবে কিরূপে? ইমাম গাযালী, শায়খুল ইশ্‌রাক, শাহ ওলী উল্লাহ ও অন্যান্য পর্যালোচকগণ এসব বস্তুর গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটনের প্রতি লক্ষ্য

করেছেন এবং সমস্যার সমাধানও করেছেন। তাঁরা যে নীতি পেশ করেছেন, তা হলো—শরীঅতে যত বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, তা দু'প্রকার: সর্ব-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সর্ব অতীন্দ্রিয়। দর্শন, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা—এসব বস্তু সর্বসাধারণের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এসব বস্তুর সাথে অতীন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। এতদসত্ত্বেও এটা বলতে হবে যে, অতীন্দ্রিয় বস্তুও বাস্তব অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এমনও হতে পারে যে, একটি বস্তু প্রকাশ্যে নেই এবং সাধারণ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, অথচ তার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। বাস্তব অস্তিত্বের জন্য প্রকাশ্য অস্তিত্ব শর্ত নয়।

বাস্তব সত্যের জন্য প্রকাশ্য অস্তিত্বের প্রয়োজন না হলেও অন্য যে কোন প্রকার অস্তিত্বের প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন অস্তিত্বকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

আধ্যাত্মিক বস্তুর অস্তিত্ব কি ধরনের?

ইমাম গাযালী এ অস্তিত্বকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব বলে অভিহিত করেন। এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে আমি তাবীলের অধ্যায়ে ইমাম সাহেবের মূলভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি। তিনি বলেন: এ অস্তিত্ব কোন বিশেষ বিশেষ মানুষের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

নবিগণ ফেরেশতার যে ছবি দেখতে পেয়েছিলেন, রসূল করীম, হযরত জিব্রাঈলের যে আকৃতি দেখতে পেয়েছিলেন, হযরত মরিয়ম হযরত জিব্রাঈলের যে আকার অবলোকন করেছিলেন, ইমাম গাযালী সে সবকে এ অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাবীলের অধ্যায়ে আমি ইমাম সাহেবের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছি।

'আল্-মাদ্নূনু-বিহি আলা গায়রি আহ্লিহি' নামক গ্রন্থে ইমাম সাহেব মুজিযার আলোচনায় এ ধরনের অস্তিত্বকে কাল্পনিক অস্তিত্ব বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন:

"অতীন্দ্রিয় বিষয়ও বিশেষ আকার ধারণ করার ফলে চাক্ষুষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠে। এটা হলো নবী ও রসূলদের বৈশিষ্ট্য। সাধারণ লোক নিদ্রাভিভূত অবস্থায় যেরূপ বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পায়, তাদের আওয়াজ বা কথাবার্তাও শুনতে পায়, তেমনি নবিগণ জাগ্রত অবস্থায়ও বিভিন্ন বস্তুর আওয়াজ ও কথাবার্তা শুনতে পান। এসব বস্তু তাঁদের প্রতি জাগ্রত অবস্থায় সম্বোধনও করে থাকে।"

ইমাম গাযালী কবর সংক্রান্ত ঘটনাবলীর অস্তিত্বকেও এ ধরনের অস্তিত্ব বলে অভিহিত করেন। 'আল-গাযালী' নামক পুস্তিকায় আমি ইমাম সাহেবের মূল ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি।

শায়খুল ইশরাকের মতামত :

শায়খুল ইশরাকের অভিমত হলো—ইন্দ্রিয় জগত ছাড়া আরো একটি জগত রয়েছে। তা 'সদৃশ জগত' (আলম-এ আশ্‌বাহ্ বা আলম-এ-মিসাল) নামে অভিহিত। তাঁর যুক্তি হলো—কল্পনা জগতে বা দর্পণে যে সব আকৃতি দৃষ্ট হয়, বস্তুত সেগুলোর কোন জড়াত্মক অস্তিত্ব নেই। বরং কল্পনা ও দর্পণ হলো এসব আকৃতি প্রতিফলিত হওয়ার একটি উপায় মাত্র। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, এসব হলো সত্যিকার আকৃতি, ভিত্তিহীন নয়। তাই সদৃশ জগত বলে অন্য একটি জগত মেনে নিতেই হবে, যেখানে থাকবে এসব আকৃতির মৌলিক ও প্রকৃত অস্তিত্ব। শায়খুল ইশ্‌রাক জিন ও শয়তানের অস্তিত্বকে এ জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, শারীরিক হাশর বেহেশ্‌ত, দোযখ ইত্যাদির অস্তিত্বও এ পর্যায়ভুক্ত। 'হিক্‌মাতুল ইশ্‌রাক' গ্রন্থে সাদৃশ জগতের উল্লেখ করে শায়খুল ইশ্‌রাক বলেন :

"কেয়ামত-দিবসের দৈহিক পুনরুত্থান, আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ও নবীদের ওয়াদা—এসবই সদৃশ জগত দ্বারা প্রমাণিত।"

এ গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেন :

"অন্তরিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী (আহ্‌লে কাশ্‌ফ্) লোকেরা, অর্থাৎ পয়গাম্বর ও ওলিগণ যেসব ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পান, সেগুলোকে মস্তিষ্কের বাতাস-তরঙ্গ-সৃষ্ট বলে অভিহিত করা মোটেই ঠিক হবে না। কেননা বাতাস-তরঙ্গ এত প্রবলভাবে মস্তিষ্কে ধাক্কা দেবে—এটা অভাবনীয় ব্যাপার। বরং এটা হলো সদৃশ জগতে বিদ্যমান আওয়াজেরই প্রতিধ্বনি।"

অন্যস্থানে তিনি বলেন :

"পয়গাম্বর ও ওলীদের সঙ্গে অদৃশ্য জগত থেকে যেসব কথাবার্তা বলা হয়, সেগুলো কখনো লিখিত আকারে দৃষ্ট হয়, কখনো সমধুর আওয়াজ, আবার কখনো ভয়াবহ কণ্ঠে শ্রুত হয়। তাঁরা কোন কোন সময় পার্থিব দৃশ্যাবলীও দেখতে পান। তাঁরা কখনো কখনো

সুন্দর সুন্দর মানুষের আকৃতিও দেখতে পান। এসব সুন্দর আকৃতি-বিশিষ্ট লোকেরা পয়গাম্বর ও ওলীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁদেরকে অদৃশ্য জগত সম্পর্কে অবহিত করেন। এসব মানবাকৃতি কখনো কখনো তাঁদের কাছে অদ্ভুত সুন্দর ও শিল্প সুষমা-মণ্ডিত বলে মনে হয়। আবার কখনো কখনো তারা ভয়াল আকারও ধারণ করে। নবী ও ওলিগণ জ্বলন্ত আকৃতিও দেখতে পান। মানুষ নিদ্রিত অবস্থায় পাহাড়, সাগর, জমিন, কর্কশ আওয়াজ, মানবাকৃতি—যা কিছু দেখতে পায়, সবই সদৃশ জগতের প্রতিচ্ছবি। এগুলোর মৌলিক অস্তিত্ব রয়েছে অন্য এক জগতে।"

শাহ ওলীউল্লার অভিমত

শাহ ওলীউল্লাহ অতিন্দ্রিয় অস্তিত্বের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। কুরআন-হাদীসের যেসব জায়গায় এসব ধরনের অস্তিত্বের কথা আছে, শাহ সাহেব সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, হাদীস-কুরআনে উল্লেখিত এসব বিষয়ের প্রতি যাঁরা লক্ষ্য করেন, তাঁদেরকে নিম্নের তিনটি বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে ঃ হয়তো মানতে হবে যে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগত ছাড়া সদৃশ জগত (আলম-এ-মিসাল) নামে আরো একটি জগত আছে (শাহ সাহেবের এ সদৃশ জগত মুহাদ্দিসগণের সদৃশ জগতের অনুরূপ), নয়তো স্বীকার করতে হবে যে; কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিই এ অস্তিত্বের দর্শন লাভ করতে পারে, যদিও তাদের অনুভূতির বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই, নয়তো বলতে হবে যে, এসব ঘটনা রূপকাকারে বর্ণিত হয়েছে। এই বিকল্পগুলো উল্লেখের পর শাহ সাহেব বলেনঃ "যাঁরা তৃতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করবেন, তাঁদেরকে আমি ন্যায় পথের পথিক বলে মনে করি না।" শাহ সাহেব কেবল তৃতীয় বিকল্পটিকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেন। আমাদের ধর্মবেত্তাগণ যদি প্রথমোক্ত বিকল্প দু'টি মেনে নিতেন, তবে বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। আমি শাহ সাহেবের ভাষ্যের পূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

সদৃশ জগতের আলোচনা

মনে রাখতে হবে, অনেক হাদীসে প্রতীয়মান হয় যে, অস্তিত্ব জগতে এমন একটি অস্তিত্বও রয়েছে, যা অজড় এবং যাতে বিষয়-

বস্তু নিজ বৈশিষ্ট্য ও গুণের অনুসারে এমন আকার ধারণ করে, যা তার জন্য শোভা পায়। প্রত্যেক বস্তুর প্রাথমিক আকার সৃষ্টি হয় সদৃশ জগতে। অতঃপর তার দ্বিতীয় সংস্করণ হয় এ পৃথিবীতে। এ পার্থিব আকারটি এক হিসেবে সদৃশ জগতের আকারেরই পুনঃ-রূপায়ণ। জনসাধারণ যেসব বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না, সেগুলো সদৃশ জগত থেকেই নির্গত হয় এবং পার্থিব জগতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তা দেখতে পায় না।

নবীজী বলেছেনঃ "আল্লাহ্ যখন আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সৃষ্টি করলেন, তখন সে দাঁড়িয়ে বললো, এটা সে ব্যক্তিরই আশ্রয়-স্থল, যে লোকটি আত্মীয়দের অবহেলায় অবহেলিত হয়ে তোমার (আল্লাহ্র) কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।"

নবীজী আরো বলেছেনঃ "সূরা-এ-বাকারা ও সূরা-এ-আল-ইমরান্ কেয়ামতের দিন মেঘ বা তাবু বা দলবদ্ধ পাখীর আকার ধারণ করবে এবং তা সেসব লোকের জন্য সুপারিশ করবে, যারা সেগুলো পাঠ করেছিল।"

নবীজী অন্যত্র বলেছেনঃ "কেয়ামতের দিন মানুষের কৃতকর্ম বিশেষ আকার ধারণ করে উপস্থিত হবে। সর্বপ্রথম উপস্থিত হবে নামায, অতঃপর দান, অতঃপর রোযা।

তিনি (সঃ) আরো বলেছেনঃ "পুণ্য ও পাপ দু'টো সৃষ্ট বস্তু। এগুলো কেয়ামতের দিন লোকের সামনে দণ্ডায়মান হবে। অতঃপর পুণ্য পুণ্যবানদের সুসংবাদ দেবে এবং পাপ পাপীদের বলবে, 'দূরে হট, দূরে হট'। কিন্তু তারা তার সঙ্গে জড়িয়েই থাকবে।"

নবীজী অন্য এক স্থলে বর্ণনা করেছেনঃ "কেয়ামতের দিন দুনিয়াকে একজন বৃদ্ধার আকারে উপস্থিত করা হবে। তার চুলগুলো হবে এলোমেলো; দাঁতগুলো হবে নীল এবং আকার হবে কুৎসিৎ।"

তিনি (সঃ) আরো বলেছেনঃ "আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বিপদ তোমাদের ঘরের উপর এমনিভাবে বর্ষিত হচ্ছে, যেমন বৃষ্টিকণা বর্ষিত হয়ে থাকে।"

মে'রাজের হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে রসূল করীম (সঃ) বলেনঃ হঠাৎ চারটি ঝরনার উপর আমার নযর পড়লো। দু'টি ছিল ভেতরে,

আর দু'টি বাইরে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলো কি ?" উত্তরে তিনি বললেন, "ভেতরকার ঝরনা দু'টো হলো বেহেশতের, আর বাইরের দু'টো নীল ও ফোরাত।"

সূর্য গ্রহণের নামায সংক্রান্ত হাদীসে নবীজী বলেন: "বেহেশত ও দোযখ আমার সামনে দেহ ধারণ করে উপস্থিত হলো ; আমি হাত বাড়ালাম, যেন বেহেশত থেকে আঙ্গুরের থোকা চয়ন করতে পারি। কিন্তু দোযখের আগুনের উত্তাপে থেমে গেলাম।"

অন্য এক হাদীসে আছে: "রসূল করীম (সঃ) হাজীদের মাল হরণকারী একজন চোর ও একজন মেয়ে লোককে দোযখে দেখেছেন। মেয়ে লোকটি একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে বধ করেছিল। তিনি একজন ব্যভিচারিণী মেয়ে লোককেও বেহেশতে দেখেছেন। কেননা সে একটি কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল।"

এটা প্রকাশ্য কথা যে, সাধারণ লোকের ধারণায় বেহেশত ও দোযখের প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা এত বেশী যে, কাবার চার দেয়ালের মধ্যেও তাদের স্থান সংকুলান হয় না।

অন্য হাদীসে আছে: "বেহেশতকে ঘিরে রেখেছে কষ্ট, আর দোযখকে ঘিরে রেখেছে কামুকতা।" অন্য এক স্থানে রসূল করীম (সঃ) বলেন: "বিপদ-আপদ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু দোআ তা ফিরিয়ে রাখে।" অপর হাদীসে রয়েছে: "মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে তাকে জবাই করা হবে।"

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমি আমার রুহ্‌কে মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং তা তার সামনে অবিকল মানুষের আকার ধারণ করে উপস্থিত হলো।"

হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে: জিব্রাঈল রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে উপস্থিত হতেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। অথচ কেউ তাঁকে (জিব্রাঈলকে) দেখতো না।

অন্য হাদীসে আছে: কবর এদিক থেকে সত্তর গজ, আবার ওদিক থেকে সত্তর গজ প্রশস্ত হয় অথবা তার উভয় দিক এমনভাবে মিলিত হয় যে, কবরস্থ ব্যক্তির পাঁজরের হাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

অন্যত্র রসূল করীম (সঃ) বলেন ঃ "ফেরেশতা কবরে অবতীর্ণ হন এবং মৃত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মৃত ব্যক্তির কৃতকর্ম আকার ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয়। মানুষের মৃত্যুর সময় ফেরেশতা রেশম বা সূতার কাপড় পরিধান করে আসেন এবং মৃত ব্যক্তিদের লোহার লাঠি দিয়ে প্রহার করেন। মৃত ব্যক্তিরা চিৎকার করে এবং সে আওয়াজ পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তের প্রত্যেকটি বস্তু শুনতে পায়।

অন্য হাদীসে আছে ঃ কাফেরের কবরে নিরানব্বইটি অজগর বাসা বাঁধে। সে সাপগুলো কেয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকে।

অন্যত্র আছে ঃ মৃত ব্যক্তি যখন কবরে আসে, তখন তার কাছে মনে হয় যে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে। তখন সে বসে পড়ে এবং বলে, হে সূর্য ! তুমি একটু থাম। আমি নামাযটুকু পড়ে নিই।

হাদীসের অনেক জায়গায় আছে ঃ "কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ বিভিন্ন আকারে লোকের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন। এমন অবস্থায় রসূল করীম (সঃ) আল্লাহ্‌র সামনে যাবেন, যখন তিনি (আল্লাহ্) নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন এবং মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি কথাবার্তা বলবেন।"—এ ধরনের অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এসব হাদীস যাঁদের নযরে পড়বে, তাঁদেরকে নিম্নের তিনটি বিকল্পের যে কোন একটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে ঃ

১. হয়তো তাঁরা এসব হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ করবেন। যদি তাই করেন, তবে তাঁদেরকে এমন একটি জগত স্বীকার করতে হবে, যার স্বরূপ পূর্বে বর্ণনা করেছি। সেটা হলো সদৃশ জগত বা 'আলম-এ-মিসাল্'। আহলে হাদীসও অনুরূপ মত পোষণ করেন। আল্লামা সুয়ূতীও এদিকেই ইংগিত করেন। আমার নিজের অভিমতও তাই।

২. নয়তো প্রকাশ্য অর্থ করবেন না। যদি প্রকাশ্য অর্থ না করেন, তবে হয়তো এটা স্বীকার করবেন যে, দর্শকদের চোখে সে সব ঘটনা এরূপ আকারই ধারণ করবে, যদিও তাদের অনুভূতির বাইরে সেগুলোর প্রকাশ্য কোন অস্তিত্ব না থাকে। কুরআন মজীদে আছে ঃ "আকাশ সে দিন ধোঁয়াময় হয়ে উঠবে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ যে অর্থ করেছেন, তা শাব্দিক অর্থেরই কাছাকাছি। অর্থাৎ

লোকের উপর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়েছিল। তাদের কেউ যখন আকাশের দিকে দেখতো, তখন ক্ষুধার আতিশয্যে তা তাদের কাছে ধোঁয়াময় বলে মনে হতো।

ইব্‌নে মাজিশুন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র অবতরণ ও গোচরীভূত হওয়ার যে কথাটি বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে, তার মানে হলো- আল্লাহ্ মানুষের দৃষ্টিতে এমন একটি পরিবর্তন সাধন করবেন, যাতে তার কাছে মনে হবে যে, তিনি (আল্লাহ্) অবতরণ করেছেন এবং নিজ বান্দাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। বস্তুত এতে আল্লাহ্‌র মহিমায় কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না এবং তিনি সত্যিকারভাবে অবতরণও করবেন না। এরূপ করার উদ্দেশ্য হলো লোকেরা যেন মনে করে, আল্লাহ্ প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

৩. তৃতীয় বিকল্পটি হলো—এসব কথা রূপকাকারে বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো – প্রকাশ্য অর্থ থেকে ফিরিয়ে স্বতন্ত্র অর্থের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বত্র কেবল এ অর্থই গ্রহণ করে ক্ষান্ত হবে, আমি তাকে ন্যায় পথের পথিক বলে মনে করি না।

শাহ ওলীউল্লাহ আরো একটি জগতের সমর্থক। সেটা হলো—সদৃশ জগত এবং ইন্দ্রিয় জগতের মাঝামাঝি এবং তা 'আলম-এ-বর্‌যখ্' (বিরতি বা দুটি বিপরীত অবস্থার মাঝামাঝি বস্তু) নামে অভিহিত। শাহ সাহেব ওহী, ফেরেশতার সাক্ষাৎ, মে'রাজ, বুরাক, সিদ্‌রাতুল্ মুন্‌তাহা, বেহেশ্‌তের ঝরনা—এসবের ব্যাখ্যা করেছেন 'আলম-এ-বরযখ'-এর আলোকেই। 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা' গ্রন্থে শাহ সাহেব রসূল করীমের জীবন চরিত লিখতে গিয়ে ওহী সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন, তা হলো—"রসূল করীমের উপর ওহী অবতীর্ণ হতো কখনো ঘণ্টা-ধ্বনির আকারে, আবার কখনো ফেরেশতা ঐশ বাণী নিয়ে আসতেন মনুষ্যের রূপ ধারণ করে।" অতঃপর ঘণ্টা-ধ্বনির স্বরূপ বর্ণনা করে শাহ সাহেব বলেন ঃ

"ঘণ্টা-ধ্বনির স্বরূপ হলো—ইন্দ্রিয়ের উপর যখন কোন প্রবল শক্তির চাপ পড়ে, তখন তা বিহ্বল হয়ে পড়ে। দর্শন শক্তির বিহ্বলতা হলো চোখে লাল, হলদে ও সবুজ বর্ণ দেখা। শ্রবণ শক্তির বিহ্বলতা হলো—অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসা। অতঃপর ঐশ শক্তি যখন

পুরোপুরিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তখনই জ্ঞান অর্জিত হয়। ফেরেশতার দেহ ধারণ করে উপস্থিত হওয়া এটা হলো সে জগতের কার্য, যাতে সদৃশ জগত ও ইন্দ্রিয় জগত উভয় দিক থেকে কোন কোন প্রভাব এসে মিলিত হয়। এজন্য কোন কোন নবী ফেরেশতাকে দেখতেন, আবার কেউ কেউ হয়তো দেখতেন না।

অতঃপর মে'রাজ সম্পর্কে শাহ সাহেব বলেন ঃ

এসব ঘটনা রসূল করীমের দেহের উপর দিয়ে জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। এগুলো সংঘটিত হওয়ার সময় তিনি সদৃশ জগত ও ইন্দ্রিয় জগত-এ দুটির মধ্যবর্তী স্তর অর্থাৎ 'বর্‌যখে' ছিলেন। এই স্তরে উভয় দিকের প্রভাব এসে মিলিত হয়। এজন্যই রসূল করীমের দেহের উপর আধ্যাত্মিক জগতের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তিনি রুহানী ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি প্রকাশ্যরূপে দেখতে পেয়েছিলেন। খারকীল ও মূসা (আঃ) প্রমুখের বেলায়ও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ওলীদের সঙ্গে অনুরূপ ঘটনা ঘটে থাকে।

এরপর শাহ সাহেব এ নীতি অনুসারে বুরাক, নবীদের সঙ্গে রসূল করীমের সাক্ষাৎ, বিভিন্ন আকাশে তাঁর উত্তরণ, সিদ্‌রাতুল্ মুন্‌তাহা, বাইতুল্ মা'মূর ইত্যাদির ব্যাখ্যা করেন।

শাহ সাহেবের বক্তব্য দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও তাতে কিছুটা অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি সদৃশ জগত ও মধ্যবর্তী জগত (আলম-এ-বরযখ্)-এর গণ্ডিকে এত বেশী প্রসারিত করেছেন যে, তাতে সমস্ত ভাবার্থ আর রূপকার্থও সদৃশ জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। রসূল করীমের এ হাদীসটি দেখুন ঃ "কেয়ামতের দিন মৃত্যু ভেড়ার আকার ধারণ করে উপস্থিত হবে এবং তাকে জবাই করা হবে।" এখানে আক্ষরিক অর্থ উদ্দিষ্ট নয়। এটা হলো এক ধরনের বর্ণনা শৈলী। মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু নেই—এ কথাটা বোঝানোই ছিল এ বর্ণনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য। শাহ সাহেব এ কাজটিকেও সদৃশ জগতের একটি ঘটনা বলে বর্ণনা করেন।

ইমাম গাযালী, শায়খুল ইশরাক ও শাহ্ ওলীউল্লাহ্ বর্ণনার মধ্যে যেসব ছোটখাট পার্থক্য রয়েছে, তা বাদ দিলে তাঁদের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তদনুসারে শরীঅতের বুদ্ধি-বিরুদ্ধ

(আপাত-দৃষ্টিতে) বিষয়াদিকে নিম্নশ্রেণীগুলোতে বিভক্ত করা যায় ঃ

শরীঅতের যে বিষয়গুলো আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিবিরুদ্ধ, তাদের শ্রেণীবিভাগ

১. এরূপ বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবার্থ ও রূপকার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন জড় বস্তুর তস্‌বীহ্ পাঠ, আকাশ ও জমিনের প্রতি আল্লাহ্‌র সম্বোধন ও তাদের পক্ষ থেকে উত্তর দান, সৃষ্টির গোড়ায় আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের প্রতি আদম সন্তানদের স্বীকারোক্তি, আর্‌শের উপর আল্লাহ্‌র আসন গ্রহণ ইত্যাদি এ পর্যায়ে পড়ে।

২. আধ্যাত্মিক বিষয়াদিকে আল্লাহ্ জড় পদার্থের রূপ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এ পদ্ধতি সব ধর্মেই আছে। মানুষ কেবল সে সব বস্তুই উপলব্ধি করতে পারে, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং যদি এমন সব বস্তুর বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যা পরকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যা মানুষের ধারণাতীত, তবে অবশ্যই সেগুলোকে জড় পদার্থের রূপ দিয়ে বর্ণনা করতে হবে। যেমন মৃত্যুর পর যে সুখ-দুঃখ ভোগ করা হবে, তার বিবরণ দিতে হলে বাগান, ঝরনা, বৃশ্চিক, সাপ ইত্যাদির বর্ণনা ছাড়া আর কি উপায় আছে? আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ছিলেন ঘোর প্রকাশ্যবাদী। তাঁকেও এ কথাগুলো স্বীকার করতে হলো। তিনি বলেন ঃ

অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে সেসব সুখ-দুঃখের প্রতি অবহিত করেছেন, যা তিনি কেয়ামতে ভোগ করতে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তিনি সুখ-দুঃখের বিবরণ দিতে গিয়ে পানাহার, স্ত্রী সম্ভোগ ও ফরশ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। আমরা যদি পৃথিবীতে এসব বস্তু সম্পর্কে অবহিত না হতাম, তবে সেসব প্রতিশ্রুত বস্তু সম্পর্কে কিভাবে অনুমান করতে পারতাম? কিন্তু আমরা একথাও জানি যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত বস্তুগুলো কোনমতেই পার্থিব বস্তুর মত নয়। ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ দুনিয়া ও পরকালের বস্তুসমূহের মধ্যে একমাত্র নামের সামঞ্জস্য ছাড়া আর কোন দিক থেকেই সামঞ্জস্য নেই।

মওলানা রুমীর চাইতে শরীঅতের রহস্য আর বেশী কে জানে? তিনি এ বিষয়টি বিভিন্ন স্থানে চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন, "শিক্ষক যদি কোন শিশুকে শিক্ষা দিতে চান, তবে তাকে শিশুর ভাষায়ই কথা-বার্তা বলতে হয়।"

৩. নবিগণ আধ্যাত্মিক বিষয়াদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকারে অনুভব করেন। এ বস্তুটিকে শাহ্ ওলী উল্লাহ ও শায়খুল ইশ্‌রাক সদৃশ জগত (আলম-এ-মিসাল বা আলম-এ-আশ্‌বাহ) নামে অভিহিত করেন। ইমাম গাযালী এর নাম রেখেছেন—'কাল্পনিক রূপ" (তামসীল-এ-খেয়ালী)। নাস্তিকেরা এ বিষয়টির প্রতি বেশী অভিযোগ এনে থাকে। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করে বলছি।

সর্বপ্রথম এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, বর্তমান দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করলে কাল্পনিক রূপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন দাঁড়ায় না। কাল্পনিক রূপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম গাযালী বলেন, ভাবের রূপ ধারণ করার ফলে তা দৃষ্ট হয় ও তার শব্দও শ্রুত হয়—যেমন স্বপ্নজগতে হয়ে থাকে। স্বপ্নের এ অবস্থাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এখন চিন্তা করা দরকার, স্বপ্নে এরূপ হয় কি করে? এর এক মাত্র কারণ হলো—স্বপ্নে প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখন কেবল রুহ্ বা আত্মা বা চিন্তাশক্তি একাই কাজ করে যায়। যদি কোন ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় বিশেষ ভাবাবেশ ও তন্ময়তার ফলে স্বপ্নলোকে উপনীত হয় এবং তার কাছে অতীন্দ্রিয় বিষয়াদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুরূপে অনুভূত হয়, তবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের অনুভূতি সাধারণ অনুভূতি নয়। তা না হয় এরূপ অনুভূতি সকলের হয় না কেন? কেবল নবী ও ওলীরাই তো এরূপভাবে অনুভব করে থাকেন। সাধারণ লোকের জন্য এরূপ অনুভূতির প্রয়োজন নেই।

ইমাম গাযালী ও অন্যান্য সূক্ষ্মদর্শিগণ এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম। তাই ভাষায় সামান্যতম পরিবর্তনের দরুন এর ভাব বিকৃত হতে পারে - এ ভয়ে আমি সূক্ষ্মদর্শীদের মূলভাষ্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ পেশ করে ক্ষান্ত হচ্ছি।

রাগিব পাশা রচিত 'মাকাসিদুল মারাসিদ' গ্রন্থে মুসলিম দার্শনিকদের মতানুসারে, স্বপ্ন, ওহী, ইলহাম ও কারামত ইত্যাদির গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষের মধ্যে একটি শক্তি আছে, যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের আকারসমূহ প্রতিবিম্বিত হয়; যেমন মানুষ পায়েস দেখে বলে—এটা সাদা। যদি তার মধ্যে এমন একটি শক্তি না থাকতো, যা ইন্দ্রিয় অনুভূত বাস্তব আকারসমূহকে পুঞ্জীভূত

করে রাখে, তবে সে কি করে পায়েস দেখে তার বর্ণনা দিতে সক্ষম হতো? এ শক্তিকেই বলা হয় সাধারণ অনুভূতি বা সাধারণ জ্ঞান। এতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকারসমূহ দুইভাবে অংকিত হয়ঃ (ক) কোন কোন সময় কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহবা, ত্বক—এসব অঙ্গ পরিদৃশ্যমান বস্তুর আকার গ্রহণ করে তা সাধারণ জ্ঞানের নিকট সরাসরি পাঠিয়ে দেয়। (খ) দ্বিতীয়ত মস্তিষ্কের কল্পনাশক্তি বলে কথিত আরো একটি শক্তি আছে। এর কাজ হলো বিভিন্ন আকারগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। এ শক্তি কোন কোন সময় মানুষের জন্য দু'টি মাথারও কল্পনা করে। আবার কখনো কখনো এমন মানুষেরও কল্পনা করে, যার কোন মাথাই নেই। এ শক্তি যখন বিভিন্ন কল্পিত আকারকে সাধারণ জ্ঞানের কাছে পৌঁছে দেয়, তখন তা দৃষ্ট হয়, যেমন বাস্তব জগতে বিভিন্ন আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। কোন আকারের দৃষ্ট হওয়ার জন্য এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, তার অস্তিত্ব বাস্তব জগতেও থাকতে হবে। সাধারণ অনুভূতির মধ্যে অঙ্কিত থাকলেই তা দৃষ্ট হতে পারে। চিন্তাশক্তিতে পুঞ্জীভূত আকারসমূহ সাধারণ অনুভূতির পরশ পেয়ে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে।

তাই আমরা বলতে পারি যে, স্বপ্নযোগে যে সব ছবি মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলোতে দু'টি সম্ভাবনা থাকেঃ হয়তো সেগুলো পরিদৃশ্যমান জগতে আছে, নয়তো নেই। প্রথম বিকল্পটি অবান্তর। কেননা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যদি তাদের অস্তিত্ব থাকতো, তবে প্রকৃতিস্থ যে কোন মানুষ নিশ্চয়ই সেগুলো জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেতো। তাই বোঝা গেল যে, সেগুলো বাহ্য জগতে নেই। বরং সেগুলো কল্পনাশক্তিরই কাজ। কল্পনাশক্তি যদি সব সময় মৌলিক অবস্থায় অবিঘ্নিত থাকতো, তবে মানুষ নিত্যই সে ধরনের দৃশ্য দেখতে পেতো। কিন্তু দু'টো বস্তু কল্পনা শক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করেঃ (১) প্রথম হলো সাধারণ অনুভূতি, তা কেবল সে সব আকার গ্রহণে ব্যস্ত থাকে, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে মানুষের কাছে অনুভূত হয়। (২) দ্বিতীয় হলো—বিবেক বুদ্ধি অনেক সময় কল্পনাশক্তিকে দাবিয়ে রাখে। তাই যখন এ দু'টো বিঘ্ন বা তন্মধ্যে একটি অপসারিত হয়, তখনি কল্পনাশক্তি থেকে ঐ সব কাজের উদ্ভব হয়। কল্পনাশক্তির প্রথম বিঘ্নটি নিদ্রার সময় অপসারিত হয়। কেননা তখন বাহ্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং সাধারণ অনুভূতি বহিস্থ আকার গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। দ্বিতীয় বিঘ্নটি পীড়ার সময় দূরীভূত

হয়। কেননা পীড়ার অবস্থায় বিবেক পীড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন কল্পনাশক্তি বিভিন্ন প্রকার আকারের কল্পনা করে এবং সেগুলো সাধারণ অনুভূতির মাধ্যমে পরিদৃষ্ট হয়।

ওহী (প্রত্যাদেশ) ও ইল্‌হাম (অন্তর ঢালা জ্ঞান)

এর স্বরূপ হলো এই যে, মানুষের আত্মা যখন এতখানি শক্তিশালী হয়ে উঠে, যার ফলে সে কায়িক বন্ধন সত্ত্বেও ঐশ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, বা তার কল্পনাশক্তি যখন এত বেশী ক্ষমতা লাভ করে, যার ফলে সে তার সাধারণ অনুভূতিকে জড় জগতের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তখন সে (মানবাত্মা) জাগ্রত অবস্থায়ও ইন্দ্রিয়াতীত জগত ও স্বর্গীয় সত্তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে তখন অদৃশ্য জগতের কথাবার্তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে থাকে। অতঃপর কল্পনাশক্তি সামঞ্জস্যমূলক একটি খণ্ড প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। এই প্রতিচ্ছবি সাধারণ অনুভূতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একটি দর্শনসাধ্য রূপ ধারণ করে। কোন কোন লোক এই কল্পিত বস্তুটি দেখতে পান এবং তাঁর সঙ্গে বরাবর কথাবার্তাও বলেন। আবার কোন কোন সময় উন্নত আত্মাবিশিষ্ট লোকেরা অতি সুন্দর আকৃতিও লক্ষ্য করে থাকেন। সেই আকৃতি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে থাকে। এ কথাবার্তা হয়তো তাঁদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, নয়তো তাঁদের গণ্ডিভুক্ত লোকদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

ইমাম গাযালী 'মাআরিজুল্ কুদ্স্' গ্রন্থে ওহীর যে স্বরূপ বর্ণনা করেন, তা নিম্নরূপ ঃ

ইমাম গাযালী 'মাআরিজুল্ কুদ্স্' গ্রন্থে 'নুবুওয়াত' শীর্ষক যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন, তাতে তিনি নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন ঃ

'নুবুওয়াতের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ তন্মধ্যে একটি হলো—কল্পনাশক্তি। বুদ্ধিজাত শক্তি কর্ম শক্তিরই অধীন।"

ইমাম গাযালী এ বৈশিষ্ট্যটি ফলাও করে বর্ণনা করেন। তাঁর যে কথাগুলো এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেগুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"অতঃপর কল্পনাশক্তি সে কাজই করে থাকে, যা সে মানুষের নিদ্রার সময় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ স্বপ্নের বেলায় করে থাকে। অর্থাৎ কল্পনাশক্তি ঘটনাবলীকে গ্রহণ করে এবং তাদের প্রতিচ্ছবিকে সাধারণ

অনুভূতিতে উপস্থাপিত করে। তাই এই প্রতিচ্ছবি বাহ্য ইন্দ্রিয় শক্তিকে প্রভাবিত করে। আরো পরিষ্কার কথায়, এই কল্পনাশক্তি ইন্দ্রিয়ের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করে যে, কল্পনাশক্তি প্রসূত দৃশ্যগুলো সাধারণ জ্ঞান ও অনুভূতির উপর বিধৃত হয়। এ সময় কল্পনাশক্তির অধিকারী এ মানুষটি অদ্ভুত ঐশ দৃশ্য দেখতে পান এবং ঐশ আওয়াজও শুনতে পান। এটা হলো এমনি অবস্থা, যেমন ওহী উপলব্ধি করার সময় হয়ে থাকে। এটা হলো নুবুওয়াতের চাইতে নিম্নতর পর্যায়। এর চাইতে শক্তিশালী পর্যায়ে ঐশ দৃশ্যগুলো মানুষের কল্পনাশক্তিকে এত ব্যস্ত করে রাখে যে, সে তখন অন্যান্য জড় বস্তুর দৃশ্য গ্রহণ করার সুযোগই পায় না। এর চাইতে শক্তিশালী পর্যায় হলো—কল্পনাশক্তি নিত্য তার কাজ চালিয়ে যায়। চিন্তাশক্তি ও সাধারণ অনুভূতি তার পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। তাই কল্পনাশক্তি যে আকৃতি গ্রহণ করে, তাই স্মরণশক্তিতে অটুট থাকে। কল্পনাশক্তি সাধারণ জ্ঞান ও অনুভূতির উপর এতখানি গভীর প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে সেই কল্পিত অদ্ভুত দৃশ্যগুলোর ছবি সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিবিম্বিত না হয়ে পারে না। এটা হলো নুবুওয়াতের সেই স্তর, যেখানে তার সঙ্গে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির সম্পর্ক রয়েছে।

ইমাম গাযালী জটিল বর্ণনার মধ্য দিয়ে সে কথাটাই ব্যক্ত করেছেন, যা 'মাকাসিদুল্ মারাসিদ'-গ্রন্থ-রচয়িতা সাদাসিধে ভাষায় তুলে ধরেছেন। আবুল বাকা-বু-আলী সিনার বরাত দিয়ে এ কথাগুলো খুব সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি 'তা'রীফাত্' গ্রন্থে ওহীর সংজ্ঞায় বলেন ঃ

আমরা তো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুনিচয় দেখতে পাই। কিন্তু পয়গাম্বরগণ তা দেখতে পান অন্তর্নিহিত শক্তির আলোকে। আমরা প্রথমে একটি বস্তু দেখতে পাই; তার পর তা উপলব্ধি করি। কিন্তু পয়গাম্বরগণ প্রথমে কোন বস্তু উপলব্ধি করেন, অতঃপর প্রকাশ্যে তা দেখতে পান।

হাকীম আবু নসর ফারাবী, বু-আলী সিনা প্রমুখও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে এঁদেরকে অনুসরণীয় ইমাম বলে মনে করা হয় না। তাই আমি এঁদের ভাষ্যের উদ্ধৃতি থেকে বিরত রইলাম।

ইসলাম তমদ্দুন ও উন্নতির পরিপন্থী নয় বরং সহায়ক

এ মাপকাঠি দিয়েই ধর্মের অশুদ্ধতা ও বিশুদ্ধতা বিচার করা যায়। ধর্ম-অবিশ্বাসীদের মতে, যে ধারণাটি তাদেরকে ধর্মের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন করে তুলেছে, প্রধানত তা হলো—সকল ধর্মই পার্থিব উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তারা বলেঃ

কি-কি কারণে ধর্মকে পার্থিব উন্নতির পরিপন্থী বলা হয়?

১. কেবল বিশ্বাস ক্ষেত্রেই নয়, বরং আমরা যা কিছু বলি, যা কিছু করি—সর্বস্থলেই ধর্ম হস্তক্ষেপ করে। চলা ফেরা, শয়ন করা, জগ্রাত হওয়া, উঠা-বসা, পানাহার করা—কোন একটি বস্তুই তার গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না। এরূপ কোণঠাসা হয়ে মানুষ কি করে উন্নতি লাভ করতে পারে? কোন জাতি উন্নতি করে থাকলে ধর্মীয় কড়াকড়ি থেকে মুক্ত হয়েই তা করেছে।

২. ধর্মীয় বিধি এত কঠিন যে, তার বাস্তবায়ন মানুষকে সামাজিক ও তামদ্দুনিক উন্নতির সুযোগ দেয় না।

৩. প্রত্যেকটি ধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও বিদ্বেষ শিক্ষা দেয়। ফলে কোন জাতিই কোন সময় অন্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায়ানুগভাবে শাসন করে নি। এজন্যই মানবজাতির এক বিরাট অংশ সব সময় লাঞ্ছিত ও তহযীব-তমদ্দুন থেকে বঞ্চিত ছিল।

ইসলাম ধর্মে এ বিষয়গুলো নেই

সাধারণ ধর্মের বেলায় এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, ইসলাম ধর্ম এসব অভিযোগে কতটুকু অভিযুক্ত বা এগুলো থেকে কতটুকু মুক্ত?

এতে সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ ধর্মই মানুষের জীবনের ছোট-খাট ব্যাপারকেও ধর্মীয় বিধি-বিধানের আওতায় টেনে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে এসব সংকীর্ণতা মুছে দেওয়ার জন্য। ইহুদীদের ধর্মে প্রত্যেকটি বস্তুই ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। মানুষকে এসব বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ্ রসূল করীমকে নবীরূপে পাঠিয়েছেন। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"যারা উম্মী (আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন) পয়গাম্বরের অনুসরণ করে, তারা নিজেদের তওরীত ও ইনজীলে তাঁর নাম লিখিত পাবে। তিনি তাদের ভাল কাজের প্রতি আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখেন। তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম বলে ঘোষণা করেন। তাদের উপর যে বোঝা চাপানো ছিল এবং যে শৃংখল তাদের আবদ্ধ করে রেখেছিল, তা তিনি তাদের উপর থেকে অপসারিত করেন।" (আ'রাফ, রুকু'—১৮)

খুব চিন্তা করে দেখুন, ইহুদীদের উপর কি বোঝা ছিল, যা রসূল করীম লাঘব করেছেন এবং তাদের পায়ে কি শৃংখল ছিল, যা তিনি উন্মুক্ত করেছেন ?

কুরআন মজীদে, বিশেষ করে ইহুদী ও খৃীস্টানদের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ "ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না।" ধর্মে বাড়াবাড়ি হতে পারে দু'ভাবে ঃ ছোট-খাট প্রত্যেকটি ব্যাপারকে ধর্মের গণ্ডিভুক্ত করা বা ধর্মীয় বিধি-বিধানকে কঠিন এবং বাস্তবায়নের সাধ্যাতীত করে তোলা। ইসলাম উভয় প্রকার বাড়াবাড়িকেই দূর করেছে। লোকেরা অযথা ধর্মের গণ্ডিকে প্রসারিত করে তাতে জীবনের ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ, উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ—সব কিছুকেই ধর্মের আওতাভুক্ত করে নিয়েছিল এবং এসবকে অবৈধ বলে ঘোষনা করেছিল। এর প্রতি লক্ষ্য করে কুরআন মজীদ বলে ঃ

"হে পয়গাম্বর ! আপনি তাদের বলুন, ভোগ-বিলাস ও উত্তম আহার্যকে আল্লাহ্ বান্দার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোকে কে হারাম করলো ?"

আল্লাহ্র এসব বিধি-বিধানের উপর ভিত্তি করেই রসূল করীম পার্থিব সমাজ ব্যবস্থা ও তমদ্দুনকে ধর্মের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখেছেন এবং বলেছেন "বৈষয়িক ব্যাপারে তোমরাই ভাল জান।"

দ্বিতীয় অভিযোগটির সঙ্গে ইসলামের দূর সম্পর্কও নেই। ইসলাম দাবি করছে এবং যথার্থই দাবি করছে যে, তার ধর্মীয় বিধি-বিধান খুবই নমনীয়, সহজ ও বাস্তব ধর্মী। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"ধর্মীয় ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ করেন নি।"

"তোমাদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা আল্লাহ্রই ইচ্ছা নয়। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছা হলো তোমাদের পরিশুদ্ধ করা এবং তোমাদেরকে তাঁর নিয়ামত পুরোপুরিভাবে প্রদান করা।"

"আল্লাহ্ তোমাদের সহজসাধ্যতা কামনা করেন। তোমাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা তাঁর ইচ্ছা নয়।"

"আল্লাহ্ কারো উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না।"

"তোমাদের বোঝা লাঘব করাই আল্লাহ্র ইচ্ছা। কারণ মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এগুলো শুধু দাবি নয় বরং ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান এ দাবি বাস্তবায়নের সাক্ষ্য বহন করছে।

ধর্মীয় কাজে নানাভাবে কড়াকড়ি আরোপিত হতে পারে ঃ

১. অবশ্য কর্তব্য কার্যের সংখ্যা বেশী হওয়া বা এমনি ধরনের হওয়া যা বাস্তবায়িত করা মুশকিল বা যা পালন করতে সময় বেশী লাগে।

ইসলামে কেবল পাঁচটি বড় কর্তব্য আছে ঃ সওম (রোযা), সালাত (নামায), যাকাত, হজ্ ও জিহাদ। হজ্ ও যাকাত বিত্তশালীদের সঙ্গে সীমাবদ্ধ। জিহাদ কেবল তখনি ফরয, যখন আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়। কেবল দুটো ফরয সবলের প্রতি প্রযোজ্য। তা হলো সালাত ও সওম। রোযা বছরে এক মাস, আবার তাও মুসাফির, পীড়িত ও নিতান্ত দুর্বল লোকদের জন্য নয়। নামায অবশ্য কোন সময় মাফ নেই। ঘোড়ায় অথবা জাহাজে সওয়ার হলে কেবলা রোখ হওয়া শর্ত নয়। এ সময় প্রয়োজন অনুসারে দাঁড়িয়ে, বসে, শু'য়ে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে—মোটকথা নানাভাবে নামায আদায় করা যায়। সফরে চার রাক্আতের স্থলে মাত্র দু' রাক্আত পড়তে হয়। নামায পড়ার জন্য যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, তন্মধ্যে এমন বিষয় খুবই কম, যা অবশ্য পালনীয়।

হাত খুলেও নামায পড়া যায়, আবার হাত বেঁধেও পড়া যায়। হাত বুকেও বাঁধা যায়, আবার নাভির উপরেও বাঁধা যায়। 'আমীন' সশব্দেও বলা যায়, আবার মনে মনেও বলা যায়। মোটকথা, কয়েকটি বিষয় ছাড়া কোথাও বিশেষ নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় নয়। তাই ইমামগণ বিভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করেছিলেন।

২. ফরয কার্য সম্পাদনের জন্য খুব ছোটখাট শর্ত আরোপ করা এবং সেগুলোকে অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করা। অন্যান্য ধর্মে এ ধরনের কতটুকু কড়াকড়ি ছিল, তা তওরাতের বিধি-বিধান পাঠে প্রতীয়মান হয়। যেমন কুরবানী ইসলাম ধর্মে খুব সাদাসিধে উপায়ে সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু এর জন্য কিরূপ শর্তাদি আরোপিত ছিল, তওরাতে তার সংক্ষিপ্ত নমুনা দেখুন ঃ

"এবং হারুন পবিত্রতম জায়গায় উপস্থিত হবেন। তিনি পাপের কুরবানীর জন্য একটি বাছুর এবং অগ্নিদহনের কুরবানীর জন্য একটি ভেড়া আনবেন। তিনি পবিত্র কাত্তানী (এক প্রকার মিহিন কাপড়) জামা ও পাজামা পরিধান করবেন। তাঁর কোমরে থাকবে একটি কাত্তানী পেটি, মাথায় থাকবে কাত্তানী পাগড়ী। তিনি সারা শরীর পানি দিয়ে ধৌত করবেন। অতঃপর এ সব জামা কাপড় পরিধান করবেন এবং বনী ইসরাঈলের গোত্র থেকে পাপের কুরবানীর জন্য দুটো ছাগল ছানা আনবেন। প্রত্যেকদিন তিনি সেগুলো তাঁর কাছে রাখবেন এবং নিজ ঘরের জন্য কাফ্ফারা দেবেন। অতঃপর সেই উৎসর্গীকৃত বলি দুটোকে বনি ইস্রাঈলের শিবির-দ্বারে প্রভুর সামনে উপস্থিত করবেন এবং প্রত্যেক দিন সে দুটো নৈবেদ্য নিয়ে গুটিকাপাত (লটারী) করবেন। একবার গুটিকাপাত করবেন প্রভুর জন্য, আবার করবেন মনের আনন্দের জন্য প্রভুর নামে যে গুটিকাপাত হবে, সে নৈবেদ্যটি নিয়ে আসবেন এবং পাপের কুরবানীতে জবাই করবেন।

এ ধরনের ছেলেসুলভ শর্তাবলী হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মে পরিলক্ষিত হয়। এসব ধর্মে কেউই একজন ধর্মীয় নেতার তত্ত্বাবধান ছাড়া স্বয়ং আল্লাহ্র কোন উপাসনা সম্পন্ন করতে পারে না। হিন্দুদের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন, খৃস্টানদের জন্য পাদ্রীর প্রয়োজন এবং ইহুদীদের জন্য ইহুদী ধর্মনেতার প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমানের ইবাদতের জন্য কোন পীরের সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

ইসলাম যদি কোথাও কর্ম-পদ্ধতির নমুনাস্বরূপ কোন শর্ত আরোপ করে থাকে, তবে সেখানে এটাও বলে দিয়েছে যে, এ ধরনের শর্ত মূলত জরুরী নয়। নামাযের জন্য যেখানে কেবলার দিকে রোখ্ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এটাও বলা হয়েছে, "যেদিকেই রোখ্ কর না কেন, সেদিকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রয়েছে।" যেখানে কুরবানীর আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ পর্যন্ত কুরবানীর গোশতও পৌঁছে না, রক্তও পৌঁছে না, বরং পৌঁছে থাকে আল্লাহ্‌ভীরুতা।"

তৃতীয় অভিযোগের উত্তর পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

আমাদের দাবি শুধু এটাই নয় যে, ইসলাম তমদ্দুনসম্মত ধর্ম, বরং আমাদের দাবি হলো এ ধর্ম তমদ্দুনের পরিপোষক। এ ধর্ম তমদ্দনকে তার চরম সীমায় পৌঁছে দেবে।

এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, বর্তমানে জাগতিক তমদ্দুনের দিক থেকে ইওরোপ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ইতিপূর্বে তা কোন সময় সেখানে পৌঁছতে পারেনি। এজন্য আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে, এ তমদ্দুনের মৌলিক নীতি কি?

ইওরোপীয় তমদ্দুনের মৌলিক নীতিসমূহকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণী-গুলোর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুনিয়াতে যত জাতি তমদ্দুন ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, তাদের সবাই একই নীতি অবলম্বন করেছে বা করবে।

তামদ্দুনিক উন্নতির জন্য যেসব নীতির প্রয়োজন, সবই ইসলামে বিদ্যমান রয়েছে

১. মানুষের যাবতীয় উন্নতির প্রাথমিক বুনিয়াদ হলো—সে নিজেকে সৃষ্টির সেরা বলে মনে করবে। সে আরো মনে করবে যে, সারা বিশ্বে যা রয়েছে, তা তারই উপকারার্থে রয়েছে।

কুরআনই সর্বপ্রথম এ নীতির শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

"আমি মানুষকে অতি সুন্দর আকারবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছি।"

"তিনি আকাশ ও জমিনের বস্তু সমুদয় তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।"

এ ধরনের আরো অনেক আয়াত পরে বর্ণিত হবে।

২. মানব জাতির সার্বিক উন্নতির দ্বিতীয় বুনিয়াদ হলো—তাকে এ মর্মে বিশ্বাস করতে হবে যে, তার মঙ্গলামঙ্গল, উন্নতি-অবনতি সবই নির্ভর করে চেষ্টার উপর। দীন-দুনিয়ার সমস্ত সাফল্য এ চেষ্টার উপরই নির্ভরশীল। কুরআন মজীদ এ নীতিকে খুব পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছে ঃ

"মানুষ তাঁর চেষ্টা অনুপাতেই ফল লাভ করে থাকে।"

"মানুষ যা লাভ করে, তা তার অর্জনেরই ফল ; পক্ষান্তরে তার যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা তার কর্মেরই প্রতিফল।"

"যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তার পরিণাম ফল তাকেই ভোগ করতে হবে।"

"আল্লাহ্ কোন জাতিকে নিয়ামত দিলে তা আর পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে স্বয়ং তা পরিবর্তন করে।"

"লোকের কর্ম দোষে জল-স্থলে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে।"

"তোমাদের উপর যে বিপদ আসে, তা' তোমাদেরই কর্মফল।"

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, বান্দা যখন কোন কাজে হাত দেয়, তখন আল্লাহ্ তার সহায়তা করে ঃ

"যারা ঈমান এনেছেন ও সৎকাজ করেছেন, আল্লাহ্ তাঁদেরকে তাঁদের ঈমানের বদৌলতে পথ প্রদর্শন করছেন।"

"যারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান গ্রহণ করে না, আল্লাহ্ তাদের পথ প্রদর্শন করেন না। যাঁরা আমার জন্য আত্মিক সাধনা করেন, আমি তাঁদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি।"

"হে মুসলমানেরা, আল্লাহ্কে ভয় করো এবং ঠিক কথা বল। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মকে পরিশুদ্ধ করবেন।"

"হে মুসলমানেরা! তোমরা যদি আল্লাহ্র সাহায্য কর, তবে আল্লাহ্ও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।"

"যখন লোকেরা বাঁকা পথ অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দেন।"

"আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে তার অবস্থার পরিবর্তন করে।"

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ নিজের ভূমিকাকে বান্দার ভূমিকার পরে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "লোকেরা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ও তখন তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিয়েছেন।" উপরিউক্ত অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "হে মুসলমানেরা! আল্লাহ্-ভীরুতা অবলম্বন কর এবং ঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের কর্মকে পরিশুদ্ধ করবেন।" অথচ পরিশুদ্ধির কাজকেই বলা হয় আল্লাহ্-ভীরুতা। কেউ যদি আল্লাহ্-ভীরুতা অবলম্বন করে, তবে তার জন্য সততা ও পরিশুদ্ধির দ্বিতীয় কাজ করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এতে প্রতীয়মান হয় যে, বান্দার চেষ্টার ভূমিকাই কর্মের-সাফল্যের চাবিকাঠি। বান্দা তার ভূমিকা গ্রহণ করলেই আল্লাহ্ নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এখানে এ কথা বলারও প্রয়োজন আছে যে, কুরআন মজীদে এমন অনেক আয়াত আছে, যাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম। সে যা কিছু করে, তা আল্লাহ্রই কাজ। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"তিনি তাঁর বান্দাদের উপর আধিপত্য করে থাকেন।"

"হে মুহম্মদ! আপনি বলুন, সব কিছুই আল্লাহ্র তরফ থেকে হয়।"

খ্রীস্টানেরা প্রায়শ অভিযোগ করে থাকেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যে অলসতা ও ভীরুতা দেখা যায়, তা তাদের সর্বসমর্থিত বাঁধা-ধরা তকদীরেরই ফলশ্রুতি। তারা যে অবনতির শিকারে পরিণত, সেটা তাদের ধর্মনীতিরই অনিবার্য ফল।

যদিও তওক্কুল্-এর সমর্থক অর্থাৎ ভাগ্য-নির্ভর আলিম ও সূফীদের কর্ম ফলে অভিযোগটি প্রকট হয়ে উঠেছে, বস্তুত এটা সম্পূর্ণ অহেতুক।

এর মোটামুটি উত্তর হলো—এই তকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ফলেই সাহাবীদের মধ্য থেকে একা একটি মানুষ দ্বিধাহীন চিত্তে হাজার হাজার শত্রুর ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করতেন এবং শত শত লোককে চিরতরে ধূলায় মিশিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতেন। আজ এই মূল্যবান ও অতুলনীয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলতাকে আমাদের উলামা ও

সূফীরা যদি নিজেদের অকর্মন্যতা ও অলসতার বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করে থাকেন, তবে তাতে ইসলামের কী অপরাধ?

এর সূক্ষ্ম দৃষ্টিসুলভ উত্তর হলো—এতে সন্দেহ নেই যে ইসলাম মানুষকে সর্ব বিষয়ে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সতর্কতামূলক বাণীও উচ্চারণ করেছে যে, স্বাধীনতার এ বিশ্বাস যেন নাস্তিকতার সীমারেখায় প্রবেশ না করে। মানুষ স্বাধীনতার অধিকারী এর দুটো অর্থ হতে পারেঃ একটি হলো স্রষ্টা ও আল্লাহ্ বলে কিছুই নেই; মানুষ পুরোপুরি এখতিয়ারসম্পন্ন; সে যা চায় তাই করে, যা চায় না, তা করে না। দ্বিতীয় অর্থ হলো—আল্লাহ সর্বশক্তিমান। কিন্তু তিনি মানুষকে কাজের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ যা চায়, তাই করে। ইসলাম প্রথম অর্থের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এজন্যই কুরআন বলছেঃ

"তোমরা কিছুই চাইতে পার না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ চান।"

এর অর্থ হলো—তোমাদেরকে ইচ্ছা করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহ্‌রই দেওয়া। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হলে তোমরা এতটুকু ক্ষমতাও পেতে না।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ

"হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, সব কিছু আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই হয়ে থাকে।"

অর্থাৎ সব কিছুর মূল কারণ হলো আল্লাহ্‌র সত্তা।

ইসলাম সক্ষমতার শিক্ষা দিয়েছে নাকি অক্ষমতার—এ ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় হলো—আমাদের দেখতে হবে যে, যাঁরা ইসলামের প্রাণবিন্দু ছিলেন, যাঁরা ইসলামের জীবন্ত ছবি ছিলেন, যাঁরা ইসলামের প্রতিটি রহস্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাঁরা তথা সাহাবিগণ এ বিষয়ে কি বুঝেছিলেন এবং তাঁদের উপর ইসলামী শিক্ষার কি প্রভাব পড়েছিল? ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলামের শিক্ষা তাঁদেরকে স্বাধীনতা, প্রতিজ্ঞা, আত্মনির্ভরশীলতা—এসব গুণের প্রতিচ্ছবি করে তুলেছিল।

৩. তামদ্দুনিক উন্নতির সবচাইতে বড় নীতি হলো—সমতা সাধন অর্থাৎ সকল মানুষের অধিকার সমান। কোন দার্শনিক

বলেছেন ঃ মানবাধিকার অনুধাবনের প্রথম ভূমিকা হলো—সমতা। আর সমতাই যাবতীয় সচ্চরিত্রের বুনিয়াদ।

কিন্তু ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্বে কোন জাতিতে বা কোন দেশে এ ধারণার উদয় হয়নি। অপরাধজনিত কাজের জন্য অতি সভ্য জাতির মধ্যেও অপরাধীর মর্যাদা ও তার শ্রেণীগত গুরুত্ব অনুসারেই শাস্তি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। লরাউস তাঁর বিশ্বকোষে বলেন ঃ "রোমান সাম্রাজ্যে একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেওয়া হতো অর্থাৎ অপরাধীর মর্যাদাও শ্রেণীগত গুরুত্ব মোতাবেক শাস্তি দেওয়া হতো।" এরপর এই গ্রন্থকার অন্যায়-অবিচারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে গিয়ে রোমান সাম্রাজ্য থেকে আরম্ভ করে ফরাসী দেশের সব ঘটনার উদ্ধৃতি দেন। সর্বশেষে তিনি লিখেন যে, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লব এ সমস্ত পার্থক্য মুছে দেয়। যে সমস্ত পদবী বা উপাধি মানুষের ব্যক্তিগত সম্মান বা বংশগত মর্যাদার প্রতীক ছিল, এ বিপ্লব সেসব পার্থক্যের মূলোৎপাটন করে দেয়।

দার্শনিক ফ্রাঙ্ক বলেন ঃ পঞ্চাশ বছর পূর্বে ইওরোপের কোন কোন জাতিতে সাম্যের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। এখন অন্যান্য অংশেও তা প্রসারিত হচ্ছে।

উক্ত দার্শনিকের মতে, সাম্যের সূচনা হয় মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। অথচ ইসলামে বার শ' বছর পূর্বেই এ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুরআন মজীদে আছে ঃ

"হে মানুষেরা! আমি তোমাদেরকে নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পারস্পরিক পরিচিতির জন্য খান্দান ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। আল্লাহ্র কাছে বেশী সম্মানিত হলেন সে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে বেশী আল্লাহ্ ভীরু।"

এগুলো কেবল মৌখিক কথাই ছিল না। এ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ইসলামী সমাজব্যবস্থা। ইসলাম যতদিন সত্যিকার ইসলাম ছিল, ততদিনই এ নীতি কার্যকর ছিল। আরব দেশে বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন মর্যাদা ছিল। যে গোত্রটি বেশী ভদ্র ও বেশী সম্মানিত বলে পরিগণিত ছিল, তার একজন লোককে অন্য গোত্রের কয়েকজন লোকের সমান বলে ধরা হতো। অন্য কথায়, সম্মানিত গোত্রের একজন লোকের রক্তের বিনিময়ে অন্য গোত্রের কয়েকজন লোককে

হত্যা করা হতো। পক্ষান্তরে, একজন দাসের রক্তের বিনিময়ে তার প্রভুকে হত্যা করা হতো না। সাম্যনীতি মোতাবেক ইসলাম এসব পার্থক্য মুছে দেয়। কুরায়েশ বংশের এত বেশী অংহকার ছিল যে, তারা আনসারের গায়ে হাত তোলাকেও নিজেদের জন্য অপমানজনক কাজ বলে মনে করতো। এজন্যেই তারা বদরের যুদ্ধে আনসারদের সঙ্গে লড়াই করতে অস্বীকার করেছিল। সেই কুরায়েশদেরকে ইসলাম আবিসিনিয়া ও ইরানের ক্রীতদাসের সমতুল্য করে দেয়। আবু সুফিয়ান ছিলেন সমস্ত আরবদের নেতা। তিনি নিজেকে রসূলুল্লাহ্ বিরোধী বলে দাবি করতেন। কিন্তু তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁকে বেলাল ও সুহায়েব-এর সমকক্ষ হয়ে থাকতে হয়েছিল। অথচ বেলাল ও সুহায়েব ছিলেন অনাবর ক্রীতদাস।

জাবালা ইব্নুল আইহাম আরবের বিখ্যাত বাদশাহ ছিলেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর আকাংখা ছিল এই যে, সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁকে বেশী ইজ্জত দেওয়া হোক। কিন্তু ইসলামের জীবন্ত ছবি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তা' সহ্য করেন নি। বাদশাহ জেদের বশবর্তী হয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ ক'রে খ্রীস্টানদের সঙ্গে মিলিত হন।

ওমর ফারুক (রাঃ) যখন সিরিয়া সফর করেন এবং বায়তুল্ মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দাস উটের উপর সওয়ার ছিল। আর তাঁর স্বহস্তে ছিল উটের লাগাম। অথচ এটা ছিল এমন একটি মুহূর্ত, যখন সমস্ত মানুষ ইসলামের খলীফার শৌর্য-বীর্য দেখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

এ ধরনের হাজার হাজার ঘটনা আছে। সেগুলোর বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এ সাম্যের ফলাফল সহজেই অনুমেয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম অবিচার ও অসাম্য আরম্ভ হয় সে সময় থেকে, যখন সাধারণ মানুষকে বলা হলো—"রাস্তা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াও।" ইসলামের আদি যুগে মহৎ থেকে মহৎ লোক একজন মামুলি মানুষকেও একথা বলতে পারতো নাঃ "একটু সরে দাঁড়াও।" এ শব্দগুলোর সূত্রপাত হলো আর সঙ্গে সঙ্গে যুলুমেরও সূচনা হলো।

ধর্মনিরপেক্ষতা

তামদ্দুনিক বিকাশ সাধনের একটি বড় উপায় হলো—ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ধর্ম প্রচারে বল প্রয়োগ রহিত করা। সামাজিক দুনিয়ার গোড়া

থেকে সব সময় সবদেশে, সব জাতিতে ও সব শাসনে বিধর্মীদের প্রতি বল প্রয়োগ করা হতো। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হতো না। তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণের শিক্ষা দেওয়া হতো। নানাভাবে তাদেরকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করা হতো। প্রাক-ইসলাম যুগে সারা দুনিয়ায় এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। তখনকার দিনে মানুষের স্বভাব ছিল এই যে, যখনি দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ ঘটতো, তখনি তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তো সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে অর্থাৎ দুই ব্যক্তির মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতো এবং তা সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষের পর্যায়ে গিয়ে পেঁছিতো।

ইসলামই সর্বপ্রথম ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত বিষয়াদির সীমারেখা নির্ধারণ করে। ইসলাম নির্দেশ দিল যে, কারো সঙ্গে যদি ধর্ম নিয়ে মতবিরোধ ঘটে, তবে তার প্রতিক্রিয়া যেন সামাজিক জীবনের উপর না পড়ে। পিতামাতার অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তারা (পিতামাতা) যদি আমার (আল্লাহ্র) সঙ্গে এমন একটি বস্তুকে শরিক করার জন্য চাপাচাপি করে, যে সম্পর্কে তোমার আদৌ জ্ঞান নেই, তবে তাদের (শির্ক্ অবলম্বনের আদেশ) অনুসরণ করো না। তবে দুনিয়াতে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"

অতঃপর সাধারণভাবে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং তোমাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কারও করেনি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। তিনি ন্যায়পরায়ণদের পছন্দ করেন।"

ইসলাম এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তা এ বিষয়টির মূল দর্শনও বাত্লে দিয়েছে। আকৃতি, চরিত্র, ধ্যান-ধারণা ও মতামতের দিক থেকে সকল মানুষ এক হতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ই মানুষের স্বভাবকে তেমন করে সৃষ্টি করেন নি। সুতরাং সকল মানুষ একই ভাবাপন্ন হবে—এ আশা করা যেন মনুষ্য স্বভাবকে বিলুপ্ত করা। এ সূক্ষ্ম কথাটি কুরআন মজীদ এমনিভাবে বলেছে ঃ

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে এক জাতিভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু মানুষ সব সময়ই বিভিন্ন মত পোষণ করবে।

তবে যাঁদের উপর আপনার (নবীজী) আল্লাহ্‌র রহমত রয়েছে, কেবল তাঁরাই একমতাবলম্বী থাকতে পারেন। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌ তাঁদের সৃষ্টি করেছেন।"

"আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমরা শির্‌ক্‌ করতে না।"

"আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে হেদায়াতের উপর ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন।"

"আল্লাহ্‌ চাইলে তোমাদের সবাইকে সত্যপথে আনতে পারতেন।"

"আমি চাইলে প্রত্যেকটি মানুষকে হেদায়ত করতে পারতাম।"

রসূল করীম (সঃ) ছিলেন একজন মানুষ। তাই মানবসুলভ মন-মেজাজের অধিকারী হওয়াই তাঁর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। কাফেরদের অবাধ্যতা ও অনমনীয়তা দেখে কোন কোন সময় তিনি দুঃখিত হতেন। এ উপলক্ষে কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

"হে মুহম্মদ! তাদের অবাধ্যতা যদি আপনার কাছে বেদনাদায়ক হয়, তবে সম্ভব হলে জমিনের অভ্যন্তরে সুরঙ্গ তালাস করুন, নয়তো আকাশের সঙ্গে সিঁড়ি লাগিয়ে দিন, তা'হলে যেন তাদেরকে কোন একটা মুজিযা দেখাতে পারেন। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে সকলকে সত্য পথে আনতে পারতেন। দেখুন, যেন অজ্ঞ না হয়ে পড়েন।"

ওয়াম-নসীহত শুনে সত্য কথা গ্রহণ করবে—এটা অধিকাংশ মানুষেরই স্বভাব। এজন্য ইসলামও ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে ধর্মের প্রতি আহবান করার অনুমতি প্রদান করে। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

"তুমি কৌশল ও উপদেশের মাধ্যমে লোকদেরকে তোমার প্রতি-পালকের প্রতি আহবান কর এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা কর।"

"লোকদের উপদেশ দিন! আপনি হলেন একজন উপদেশক মাত্র ; আপনি বল প্রয়োগকারী নন। সুতরাং যার ইচ্ছা, সে আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন করুক।"

"আপনি কি জোরপূর্বক লোকদের মুসলমান করতে চান?"

বিশ্বাসের সম্পর্ক হলো অন্তরের সঙ্গে। তাই কারো মনে জোর-পূর্বক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এ কারণে ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তি করা অর্থহীন। এ কথাটি জগদ্বাসীর জ্ঞানে আসেনি, যতক্ষণ না ইসলাম বলেছে ঃ

"ধর্মে জবরদস্তি নেই।"

ঝুল সীমন ছিলেন একজন বড় ফরাসী জ্ঞানী। তিনি বলেন ঃ "লোকেরা ধর্মীয় আযাদী লাভ করেছে, বেশী দিন হয়নি। দুনিয়ার সমস্ত ইতিহাস বস্তুত ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব ও হিংসা-বিদ্বেষেরই ইতিহাস।" অতঃপর উক্ত ফরাসী জ্ঞানী প্রথম যুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্য যুগ পর্যন্ত ধর্মীয় কুসংস্কারের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। সর্বশেষে তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত ৪ঠা আগস্ট, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে দার্শনিকগণ ধর্মীয় আযাদী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। মনে রাখা দরকার, ধর্মীয় আযাদীর এ ধারণা কেবল তখনি বাস্তবায়িত হয়, যখন ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে ইহুদীদেরকে যুলুম থেকে রেহাই দেওয়া হয়। তথাপি ফরাসী বিপ্লবের প্রশাসন-ব্যবস্থা ভাল না থাকায় তিনি ধর্মীয় আযাদীর দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হননি।

মহাজ্ঞানী সীমন যে বস্তুটির (ধর্মীয় স্বাধীনতা) সূচনা ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল বলে বর্ণনা করেন, ইসলাম সে আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছে বার শ' বছর পূর্বে। সীমন ইসলামের হকিকত ও ইতিহাসের প্রতি অবহিত ছিলেন না। তিনি অন্যান্য জাতির অবস্থার নিরিখে সারা পৃথিবী সম্পর্কে মোটামুটি একটি অভিমত স্থির করেন। এছাড়া তাঁর গত্যন্তরও ছিল না।

৫. তামদ্দুনিক উন্নতির অন্যতম বড় উপায় হলো—স্ত্রী ও পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়া। প্রাক-ইসলাম যুগে সারা পৃথিবীর কাজ-কর্ম ছিল এ নীতির পরিপন্থী। ইসলামই সর্বপ্রথম নরনারী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের শিক্ষা দান করে।

৬. জাতীয় উন্নতির বড় একটি নীতি হলো—প্রত্যেকটি মানুষকে জাতিগতভাবে আত্মসম্মান লাভের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। ইসলাম প্রথম থেকেই এদিকে লক্ষ্য রেখেছে। মুসলমানদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরাই সেরা জাতি।"

"সম্মান হলো আল্লাহ্র জন্য, তার রসূলের জন্য ও মুমিনদের জন্য।"

প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ ইসলাম যখন সত্যিকার ইসলাম ছিল, তখন সমস্ত মুসলমানের মনে আত্মসম্মানবোধ বদ্ধমূল ছিল। প্রত্যেকটি মুসলমান জাতিগতভাবে নিজেকে বিশ্বের সেরা মানুষ বলে মনে করতো। এটাকেই বলা হয় আত্মসম্মানবোধ। এর ফলেই

মুসলমানদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা ও উচ্চ চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল। আপনারা ইতিহাস গ্রন্থে অবশ্যই পড়ে থাকবেন যে, একজন মামুলি মুসলমানও রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের দরবারে সাহসিকতা ও স্বাধীন চিন্তা সহকারে প্রশ্নোত্তর করতে দ্বিধাবোধ করতো না।

৭. উন্নতির সর্বপ্রধান নীতি হলো—জ্ঞানার্জন। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে তার অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে পরিগণিত করে। কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস জ্ঞানার্জনের প্রতি ভূরি ভূরি তাগিদ রয়েছে। সেগুলো বাদই দিলাম। বাস্তবতার দিকে দেখুন, প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলাম সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলাম যেখানেই পদার্পণ করেছে, সেখানেই জ্ঞান সঙ্গে নিয়ে গেছে। যে সব জাতি আদি থেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ছিল, তারাও ইসলামে দীক্ষিত হওয়া মাত্রই জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিভূষিত হয়ে উঠে। আরবেরা প্রথম থেকেই মূর্খ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়ও বড় বড় কবি লেখাপড়াকে লজ্জাকর বলে মনে করতেন। বিখ্যাত আরব কবি রাবি-ইয়াহ্ ছিলেন একজন শিক্ষিত লোক। কিন্তু এক জায়গায় যখন তাঁকে কিছু লিখতে বলা হলো, তখন তিনি অনুনয়-বিনয় করে বললেন, এ গোপন কথাটা যেন কোথাও প্রকাশ না পায়। আমি যে লিখতে পারিনি, এটা জানাজানি হলে আমার খুবই অখ্যাতি হবে। কিন্তু এ আরব দেশই ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে উঠে। ইমাম শাফেই, ইমাম মালেক ও যুহ্‌রীর ন্যায় মুজ্‌তাহিদ সেখানে জন্মগ্রহণ করতে আরম্ভ করে। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই তুর্কী জাতির অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে তাদের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না। তবুও এই তুর্কী জাতির ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে হাকীম আবু নসর ফরাবী, আমীর খুসরু ও অন্যান্য শত শত বিদ্বান ও কবি জন্মগ্রহণ করতে আরম্ভ করে। যে সব জাতি পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জ্ঞান-ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা কি ছিল এবং পরে কি দাঁড়িয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসন

৮. উন্নতির একটি বড় পন্থা হলো —গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করা। ইসলাম এ পদ্ধতির উপর এত গুরুত্ব আরোপ

করে যে, রসূলুল্লাহ্ স্বয়ং এর বাস্তবায়নের জন্য আদিষ্ট হন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"হে মুহম্মদ! আপনি লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।"

কর্ম বণ্টন

৯. উন্নতির অপর একটি বড় নীতি হলো—কর্ম বণ্টন পদ্ধতি মোতাবেক কাজ করা। অর্থাৎ এক-একটি সম্প্রদায়কে এক-একটি বিশেষ কাজে নিয়োজিত করা, তাহলে যেন প্রত্যেকটি কাজে বিশেষভাবে উন্নতি সাধন করা যায়। ইওরোপে এ পদ্ধতি খুবই উন্নতি লাভ করেছে। সেখানে বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য আলাদা আলাদা চিকিৎসক রয়েছেন। তাঁরা বিশেষ বিশেষ রোগ ছাড়া অন্যান্য পীড়ার চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। প্রকৃতিতেও এ নিয়ম দৃষ্ট হয়। হাত, পা, মাথা, অন্তর, মস্তিষ্ক—প্রত্যেক অঙ্গেরই আলাদা আলাদা ক্রিয়া রয়েছে। ইসলাম এ নীতির প্রতি ইঙ্গিত করে বলে ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে, যাঁরা মঙ্গলের প্রতি আহবান করবেন, সৎকাজের প্রতি আদেশ দেবেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবেন। সব মুসলমানকে এ কাজে উদ্যোগ নিতে হবে না। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে কিছু লোককে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।"

১০. প্রত্যেক যুগে এমন একটি দল পরিলক্ষিত হয়, যারা মানুষ আর মানুষের মধ্যকার ব্যবধান মুছে দিতে চান। ইওরোপের 'অ্যানার্কিস্ট নিহিলিস্ট' মতাবলম্বী (যাদের মতবাদ হলো—বর্তমান সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে জমি ও সম্পত্তির উপর সকলের সমান অধিকার স্থাপন করা এবং সে ভিত্তির উপর নতুন সমাজ গঠন করা) লোকেরাও এ ধরনের চিন্তাধারা পোষণ করেন। বস্তুত এ চিন্তাধারা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যদি এ নীতিকে বাস্তবায়িত করা হয়, তবে প্রত্যেক প্রকার উন্নতি আকস্মিকভাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইসলাম এ দর্শনটি নিম্নলিখিত শব্দে তুলে ধরেছে ঃ

মর্যাদার নিরিখে মানুষের শ্রেণীবিভাগ

আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আমি পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি এবং একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। উদ্দেশ্য হলো, একে অপরকে তার কাজে নিয়োজিত করবে।"

জ্ঞান লাভের সীমা নেই

৯১. উন্নতির মহত্তর নীতি হলো জ্ঞানের গণ্ডিকে সীমিত না করা। অর্থাৎ উন্নতির কোন একটি সীমায় পেঁীছে থেমে না যাওয়া। মানুষের এ কথাই ধারণা করতে হবে যে, উন্নতির আরো অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হবে। ইসলাম এ বিষয়টির উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, বিশ্বনায়ক হযরত (সঃ) মুহম্মদ রসূলুল্লাহ ঐশ জ্ঞান বিভূষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নশব্দে সম্বোধন করেছেনঃ

"বলুনঃ হে আল্লাহ্! আমাকে আরো জ্ঞান দান করুন।"

দীন-দুনিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক

কোন্ ধর্ম সত্য আর কোন্‌টি অসত্য—এ বিষয়টি বিচার করার প্রধান তুলাদণ্ড হলো দীন-দুনিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক। পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত সকল ধর্ম ও সকল জাতিই (ইসলাম ছাড়া) দীন-দুনিয়ার সঠিক সম্পর্ক নিরূপণে ভুল করে আসছে। 'ইবাহিয়া' সম্প্রদায় ও এপিকিউরাসের অনুগামীরা কেবল পার্থিব ভোগ-বিলাসের পক্ষপাতী ছিল। বাকি সব ধর্মই পার্থিব উপভোগকে অর্থহীন মনে করেছে। মানুষ যতই পার্থিব উপভোগ থেকে বিরত থাকতো, সমাজে তাকে ততই কামিল ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক বলে মনে করা হতো। এই ভাবধারাই পৃথিবীতে দুনিয়াবিমুখ, পাদ্রী, মঠাধ্যক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে। এই চিন্তাধারার পুঁজি নিয়ে এ সব লোকেরা জনমনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এদের প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা ও ইজ্জত রয়েছে যে, একজন লাঞ্ছিত ও ছেঁড়া কাপড় পরিহিত লোকের সামনেও বড় বড় বাদশা মাথা নত করছে।

ইওরোপের জনৈক খ্যাতনামা লোক বলেন, ধর্মের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কাজ হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিহার করে চলা, দুনিয়ার কাজ-কর্ম ছেড়ে বিনয় সহকারে বেহেশতের অপেক্ষায় জীবনকে বিলীন করে দেওয়া, প্রত্যেক প্রকার প্রাকৃতিক ভাবাবেগ ও আশা-আকাঙ্খাকে নির্মূল করা।

লওরুস্ বলেন : "দরবেশদের উদ্দেশ্য হলো সম্ভোগেচ্ছার মূলোৎপাটন করা।" কেবল ধর্মই নয়, দর্শন ও বিজ্ঞানক্ষেত্রেও এ ধ্যান-ধারণা পরিলক্ষিত হয়। সক্রেটিস, প্লেটো, কল্‌বী, আবু নসর ফরাবী প্রমুখও পুরোপুরি সন্ন্যাসীদের ন্যায় জীবন যাপন করতেন। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এ মনোভাবটি সারা দুনিয়ায় কিভাবে জাল বিস্তার করে রেখেছে। আমরা যখন শুনতে পাই যে, অমুক ব্যক্তির নজরে দুনিয়া কিছুই নয়, সে মাটিতে পড়ে থাকে, শাক-ভাত খেয়ে জীবিকা নির্বাহ

করে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের অন্তরে তার প্রতি ইজ্জত বৃদ্ধি পায়। অথচ আমরা খতিয়ে দেখি না যে, এ সব কাজ ছাড়া তার মধ্যে আর কোন যোগ্যতা আছে কি-না ?

দীন (ধর্ম) ও দুনিয়াকে তুলনামূলকভাবে দেখা এবং এ দুটোর মধ্যে যথাযথ ও সুষম সম্পর্ক বজায় রাখা জটিল ব্যাপার। ইওরোপের বড় বড় চিন্তাবিদেরা এ দুটোর মধ্যে সুষম সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব বলে মনে করেন এবং এজন্য দুঃখও প্রকাশ করেন। হেন্‌রী গ্রাজিয়া 'রিভিউ অব্ রিভিউ'-এর চব্বিশতম খণ্ডে বলেন: যদি কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি ধর্মীয় কুসংস্কার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে ধর্মের প্রতি যে বিরূপ আচরণ রয়েছে, এ সব নিরসন করে উভয়ের মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্কটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, তবে বিরাট মঙ্গল সাধিত হতো। এটা সম্ভব হলে এ দুটোর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে টানা-হেঁচড়া চলছে, তার অবসান ঘটতো।

এখন দেখুন, ইসলাম কিভাবে দীন ও দুনিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম বৈরাগ্য ও সংসার বিমুখতার ধারণাকে নির্মূল করে দিয়েছে।

বৈরাগ্য উৎখাত

আল্লাহ্ বলেন:

"খ্রীস্টানেরা যে বৈরাগ্য প্রবর্তন করেছে, তা আমি তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিনি। পৃথিবীতে তোমাদের (উপভোগ্য) যে অংশ আছে, তা ভুলে যেও না।"

"হে মুসলমানেরা! যে সব উত্তম বস্তু তোমাদের জন্য আল্লাহ্ হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম করো না। হে মুহম্মদ! আপনি বলুন—যে সব উপভোগ্য বস্তু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোকে হারাম করলো? উত্তম আহার্যসমূহকে কারা হারাম করলো?"

"আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজ আচরণ করতে চান, কঠিন আচরণ নয়।"

অন্যান্য ধর্ম এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, এই ব্যাপক দুনিয়ায় মানুষের করণীয় হলো—প্রাণ বাঁচাতে পারে এমন পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা

এবং দুই গজ কাপড় পরিধান করা। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো—জমিন, ময়দান, পাহাড়, সাগর, বৃক্ষ, চতুষ্পদ জন্তু, রত্নরাজি, ফলফুল, সুরভি—দুনিয়াতে যা কিছু আছে, সব কিছুই মানুষের জন্য। মানুষের উচিত, সেগুলো বৈধ উপায়ে উপভোগ করা। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আল্লাহ্ আকাশ ও জমিনের সবকিছু তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রত্যেক প্রকার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নিয়ামত পুরোপুরি প্রদান করেছেন।"

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্যকে বশীভূত করেছেন। নক্ষত্রও তোমাদের আদেশের অনুগামী।"

"টাটকা গোশ্ত খাওয়ার জন্য সেই আল্লাহ্ সমুদ্রকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। তোমরা যে অলংকার পরিধান করছ, তা সেখান থেকে কুড়িয়ে আন। তোমরা সেখানে নৌকা প্রত্যক্ষ করছ যা পানি চিরে অগ্রসর হয়। সমুদ্রকে বশীভূত করার আরো উদ্দেশ্য হলো তোমরা যেন আল্লাহ্‌র দান (ব্যবসা) অনুধাবন করতে পার।"

"ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরকে তোমাদের আরোহণ ও উপভোগ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রং বে-রংগের অনেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তোমাদের জন্য ফসল, জলপাই, খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল সৃষ্টি করেছেন।"

এ ধরনের শত শত আয়াত রয়েছে। সে সবের উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

এ সব আয়াতে আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে যা কিছু আছে, সবই মানুষের হিতার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই তিনি যাবতীয় বস্তুকে মানুষের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, কুরআনের এই সর্বজনীন করায়ত্তকরণ রূপকার্থে বা কবিজনোচিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কাল-প্রবাহ প্রত্যেক দিনই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, এটা রূপকথা নয়, কবিজনোচিত বাক্য প্রয়োগও নয়, বরং এটা বাস্তব সত্য। বাষ্প, বিদ্যুৎ, তড়িৎ, আওয়াজ,—এসব বস্তুকে কিভাবে বশীভূত করা হয় এবং বিস্ময়কর কাজে লাগানো হয়, তা সবাই দেখতে পাচ্ছে।

এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, যদিও পৃথিবীতে লাখো লাখো উপভোগ্য বস্তু রয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে বিভক্ত করার ইচ্ছা করলে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (১) ধন-সম্পদ, (২) সন্তান-সন্ততি, (৩) জ প্রিয়তা ও চিরস্থায়ী খ্যাতি। এখন দেখুন, ইসলাম এগুলো সম্পর্কে কি বলেছে ?

বিত্ত ও মান-ইজ্জত আল্লাহ্‌র নিয়ামত। তিনি নবীদের সেগুলো দান করে তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ যে সব ইহ্‌সান করেছেন, তার উল্লেখ করে কুরআন বলে ঃ

দুনিয়ার মর্যাদা

"আল্লাহ্ আপনাকে রিক্তহস্ত পেয়েছিলেন। তাই সঙ্গতিসম্পন্ন করেছেন।"

হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে যে রাজত্ব ও ইজ্জত-দৌলত প্রদান করা হয়েছে, কুরআন মজীদে ধুমধামের সঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়। তাতে আরো বলা হয় যে, সুলায়মান (আঃ) স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট সে দৌলত কামনা করেছিলেন। কুরআনে আছে ঃ

"হে আল্লাহ্ ! আমাকে এমন একটি রাজত্ব দিন, যা আমার পরে যেন কেউ না পায়।"

বনু-ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্ যে সব সদয় ব্যবহার করেছেন, তন্মধ্যে বড় বড়গুলোর প্রতি ইংগিত করে তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে পয়গাম্বর ও বাদশাহ সৃষ্টি করেছেন।"

"আমি বনু-ইসরাঈলকে কিতাব, শাসনক্ষমতা ও পয়গাম্বরী প্রদান করেছি।"

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

"তাই আমি (আল্লাহ্) ইব্রাহীমের বংশধরকে কিতাব ও শাসনাধিকার দিয়েছি এবং তাদেরকে খুব বড় রাজ্যও প্রদান করেছি।"

সর্বোপরি মোক্ষম কথা হলো—আল্লাহ্ তাআলা সৎ কাজের বিনিময়ে উম্মত-এ-মুহম্মদিয়াকে খেলাফত্ ও বাদশাহী দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"যাঁরা ঈমান গ্রহণ করেন এবং সৎ কাজ করেন, তাঁদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত (আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব) দেবেন বলে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন।"

যে সব স্থানে মানুষকে সেরা সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেখানে উন্নতির কথাটি যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সেরা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে বৈষয়িক উন্নতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

"এবং আমি বনি-আদমকে সম্মান দিয়েছি এবং জল-স্থলে পৌঁছে দিয়েছি। তাদেরকে উত্তম আহার্য দিয়েছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ মাল-দৌলতকে যে সব প্রতিশব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন, তাতে অনেকটা বোঝা যায় যে, ইসলাম ধন-সম্পদের কতখানি মর্যাদা দেয়।

কুরআনে কি কি শব্দ প্রয়োগ করে মাল-দৌলত অর্থ করা হয়েছে?

ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা পর বোঝা গেছে যে, কুরআন মজীদ ২৫ স্থানে ধন-সম্পদকে 'আল্লাহ্‌র রহমত' (ফয্‌লুল্লাহ), ২১ স্থানে 'মঙ্গল' (খয়ের), ১২ স্থানে 'সৎকাজ' (হাসানাহ্) এবং ১২ স্থানে দয়া (রহমত) বলে আখ্যায়িত ক'রেছে।

আল্লামা আহমদ ইব্‌নে মুহম্মদ আল্ রাযী এসব আয়াতের পুরোপুরি উদ্ধৃতি দেন। আমি এখানে কেবল সে সব আয়াতের উদ্ধৃত দিচ্ছি, যেখানে 'খয়ের' শব্দে ধন-সম্পদের অর্থ করা হয়েছে :

"তোমরা যে 'খয়ের' ব্যয় কর, তা তোমাদেরই জন্য।" "তোমরা যে 'খয়ের' ব্যয় কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন।" "হে মুহম্মদ! আপনি বলুন, তোমরা যে 'খয়ের' ব্যয় করেছ এবং যে 'খয়ের' ব্যয় করছ, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে।" "তোমাদের মৃত্যু যখন আসন্ন বলে মনে হবে, তখন অসিয়ত অবশ্যই করতে হবে, যদি তোমাদের কোন 'খয়ের' রেখে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে।"

"তোমাদের নিজেদের জন্যই 'খয়ের' ব্যয় কর।" "মানুষ 'খয়েরের' মোহে ভীষণভাবে প্রলুব্ধ।"

পার্থিব উপভোগের দ্বিতীয় বস্তু হলো—সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদের এক জায়গায় তাঁর বিশেষ বান্দাদের বিশিষ্ট গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন ঃ

"এবং আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যাঁরা মাটির উপর নম্রভাবে চলেন, এবং বলেন—হে আল্লাহ্! স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়ে আমাদের চোখ জুড়িয়ে দিন।"

তৃতীয় বস্তু হলো—জনপ্রিয়তা ও চিরস্থায়ী খ্যাতি। বান্দার প্রতি সদ্ব্যবহার ও উপকার সাধনের জন্য আল্লাহ্ রসূল করীম (সঃ)-কে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে বলেন ঃ

"আপনার খ্যাতিকে আমি উচ্চে তুলে ধরেছি।"

সর্বশেষে একথাও বলতে হয় যে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ধন-সম্পদের কুৎসাও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশংসা ও কুৎসা উভয় ধরনের কথাগুলোকে তুলনামূলকভাবে দেখলে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হবে যে, অনুচিতভাবে যে ধন-সম্পদ ব্যবহৃত হয়, কুরআনে কেবল তারই কুৎসা করা হয়েছে। এ ধরনের ধন-সম্পদের অপকারিতা কে অস্বীকার করতে পারে?

পরিশিষ্ট

নুবুওয়াত

[ইমাম রাযী-রচিত 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত 'নুবুওয়াত' শীর্ষক অধ্যায়ের সারমর্ম]

প্রথম অনুশীর্ষ

নুবুওয়াতের সমর্থকদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় রয়েছেঃ এক সম্প্রদায়ের অভিমত হলো—নুবুওয়াতের যথার্থতা নিরূপিত হয় মুজিযার মাধ্যমে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি নুবুওয়াতের দাবি করে, তবে আমরা দেখবো যে, তার কাছে মুজিযা আছে কি না? যদি থাকে, তবে তিনি সত্য নবী। নুবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি যেটাকে সত্য বলবেন, সেটা সত্য বলেই পরিগণিত হবে। আর যেটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবেন, সেটা হবে মিথ্যে। এটাই প্রাচীন ও সাধারণ ধর্মসমূহের রায়।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অভিমত হলো—প্রথমে স্বয়ং আমরা এটা স্থির করে নেবো যে, সত্য বলতে কি বোঝায়, আর অসত্য বলতেই বা কি বোঝায়? অতঃপর যখন দেখবো যে, এক ব্যক্তি সত্যের দিকে লোকদের আহ্বান করছেন এবং তাঁর ডাকে তারা অসত্য ছেড়ে সেই সত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন আমরা ধরে নেবো যে, ইনি সত্য পয়গাম্বর। এ পন্থাটি যুক্তিসংগত। এতে সন্দেহের অবকাশ কম।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বিশদভাবে বলছি। কিন্তু এর পূর্বেই নিম্ন সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে ঃ

১. মানুষের পূর্ণতা লাভের জন্য—তার চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি উভয়কেই পূর্ণ হতে হবে। চিন্তাশক্তির পূর্ণতার মানে হলো—তার মধ্যে বস্তুনিচয়ের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকতে হবে অর্থাৎ

তার মনে বস্তুর যে ধারণা অংকিত থাকবে, তা হবে সেটির নিখুঁত চিত্র। কর্মশক্তির পূর্ণতার অর্থ হলো—আত্মায় এমন একটি শক্তি সৃষ্টি হবে, যার ফলে ভাল কাজের উৎপত্তি হতে থাকবে।

২. পৃথিবীতে তিন ধরনের লোক আছেঃ (১) অপরিপক্ক, অর্থাৎ যাদের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি—উভয়ই অপূর্ণাঙ্গ। এরা হলো সাধারণ লোক। (২) স্বয়ং পরিপক্ক; কিন্তু অন্যকে পরিপক্ক ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত করে তোলার ক্ষমতা রাখেন না। এঁরা হলেন ওলী ও সৎলোক। (৩) স্বয়ং পরিপক্ক এবং অন্যান্যদেরকেও পরিপক্ক ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সক্ষম। এঁরা হলেন নবী।

৩. চিন্তাশক্তি এবং কর্মশক্তির পূর্ণতা ও অপূর্ণতার বিভিন্ন স্তর আছে। এগুলোর মধ্যে মাত্রার দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবধান রয়েছে। এগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করা যায় না।

৪. সব লোকের মধ্যেই সাধারণত অপূর্ণতা তথা দোষত্রুটি দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও এমন পরিপক্ক লোক দেখা যায়, যাঁরা অপূর্ণাঙ্গ লোক থেকে অনেক মঞ্জিল উর্ধ্বে রয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করা যায়ঃ

(ক) এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষের মধ্যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। অপূর্ণতা ও ঘাটতির বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে মানুষ এমন এক সীমারেখায় অবতীর্ণ হয়, যেখানে সে বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে নিছক জন্তুর কাছাকাছি হয়ে পড়ে। অপূর্ণতার দিক থেকে যেমন অবনতির চরম পর্যায় রয়েছে, তেমনি পূর্ণতার দিক থেকেও চরম উৎকর্ষের একটি মন্‌জিল রয়েছে, যেখানে পৌঁছে মানুষ ফেরেশতার গণ্ডিতে প্রবেশ করে।

(খ) অবরোহ পদ্ধতিতেও এ তত্ত্বের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। উপাদানবিশিষ্ট পদার্থ তিন প্রকারঃ খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ। এগুলোর মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ হলো—প্রাণীজ, অতঃপর উদ্ভিজ্জ, অতঃপর খনিজ। প্রাণীজগতে অনেক শ্রেণী রয়েছে। তন্মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। আবার মানুষের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন মিসরীয়, ভারতীয়, রোমান, সিরীয়, ফরাসী, ইটালীয়, তুর্কী ইত্যাদি। এদের মধ্যে মধ্য-এশিয়ায় বসবাসকারী লোকেরা সব চাইতে উত্তম।

এ নীতি অনুসারে আবার মধ্য-এশিয়ার লোকদের মধ্যেও পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক থেকে বিভিন্ন ব্যবধান অবশ্যই থাকবে। এঁদের মধ্যে এমন একটি লোক অবশ্যই দৃষ্ট হবেন, যিনি সব চাইতে শ্রেষ্ঠ।

যুগে যুগে একজন সর্বসেরা মানুষ পয়দা হন। সূফীদের ভাষায় তাঁকে 'কুত্ব' (ওলী) বলা হয় এবং সত্যিকারভাবেই বলা হয়। কেননা জড়জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ হলো এ মানুষটি। তিনি তাঁর চিন্তা-শক্তি বলে আধ্যাত্মিক জগত (আলম-এ-আর্ওয়াহ্) থেকে ঐশ শক্তি লাভ করেন এবং কর্মশক্তিবলে পৃথিবীতে উত্তম শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং এ মানুষটি হলেন দুনিয়ার প্রাণ ও আসল উদ্দেশ্য। ইনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম। এজন্য এ লোকটিকে 'বিশ্বকুত্ব' বলা পুরোপুরি সংগত হবে। শিয়া সম্প্রদায় এ লোকটিকে 'নিষ্পাপ ইমাম' 'যুগের অধিপতি' ও 'অদৃশ্য মানব' বলে আখ্যায়িত করে। তাদের এ আখ্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কেননা তিনি সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, তাই নিষ্পাপ। অন্য দিকে যুগের আসল উদ্দেশ্য বলে তিনি যুগেরও অধিপতি। আবার সাধারণ লোকেরা তাঁর পূর্ণতা সম্পর্কে ওয়াকিফ্হাল নয় বলে তিনি চক্ষু থেকে যেন অদৃশ্য।

এ ধারণানুসারে এমন এক ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে হবে, যিনি হবেন সেরাদের চাইতে সেরা। এমন মানুষ শত বছরে বা হাজার বছরে একবার জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই সত্য নবী ও শরীঅত প্রতিষ্ঠাতা। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁরা নবীদের চাইতে নিম্নস্তরের মর্যাদার অধিকারী, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁরা হলেন ইমাম ও পয়গাম্বরের প্রতিনিধি। ইমাম ও নবীর সম্পর্ক এমনি ধরনের, যেমন চাঁদ ও সূর্যের সম্পর্ক। যাঁরা ইমাম থেকে নিম্ন পর্যায়ের মর্যাদার অধিকারী, তাঁদের ও নবীদের মধ্যে এমনি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে, যেমন সূর্যের সঙ্গে রয়েছে সাধারণ নক্ষত্ররাজির। বাকি রইলো জনসাধারণের কথা। তাদের অস্তিত্ব হলো স্বর্গমণ্ডলের আবর্তে উদ্ভূত দৈনন্দিন ঘটনাবলী মাত্র।

পয়গাম্বর মানবোৎকর্ষের চূড়ায় অবস্থিত। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানব জাতির প্রত্যেকটি শ্রেণী উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করে অন্য শ্রেণীর সীমারেখায় প্রবেশ করে। মানবোৎকর্ষের চরম সীমা হলো আধ্যাত্মিক জগতে উপনীত হওয়া। এজন্যই পয়গাম্বরদের মধ্যে

আধ্যাত্মিক গুণাবলী দৃষ্ট হয়। জড়জগতের প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণ থাকে না। তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাই প্রবল হয়। তাঁদের চিন্তাশক্তির দর্পণে ঐশ জ্ঞান প্রতিফলিত হয়। তাঁদের কর্মশক্তি জড়জগতে বিভিন্ন ধরনের ওলট-পালট তথা বিপ্লব সাধন করতে পারে। এটাকেই বলা হয় মুজিযা।

পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মার শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। কোন কোন আত্মার চিন্তাশক্তি খুবই উচ্চ হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের কর্মশক্তি হয় দুর্বল। আবার কতগুলো হয় তার বিপরীত। কোন কোন আত্মা চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি উভয় দিক থেকেই উচ্চ হয়। কিন্তু এরূপ আত্মা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। আবার কোন কোন আত্মা উভয় দিক থেকেই দুর্বল হয়, যেমন আমরা সাধারণ লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই।

উক্ত সূত্রগুলোর আলোকে এটা বুঝে নিতে হবে যে, আত্মার পীড়া হলো আল্লাহ্ বিমুখতা ও দুনিয়া-প্রলুব্ধতা। যে ব্যক্তি এ পীড়ার চিকিৎসক অর্থাৎ যিনি লোকদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান করেন এবং দুনিয়া প্রলুব্ধতা থেকে তাদের সরিয়ে রাখেন, তিনিই পয়গাম্বর। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, এ গুণের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ গুণ অতি মাত্রায় পরিলক্ষিত হবে, তিনি হবেন সর্বোচ্চ নুবুওয়াতের অধিকারী। আর যে ব্যক্তির মধ্যে এ গুণ কম মাত্রায় থাকবে, তাঁর নুবুওয়াতের মর্যাদাও হবে তুলনামূলকভাবে নিম্ন পর্যায়ের।

দ্বিতীয় অনুশীর্ষ

কুরআন মজীদের ভাষ্যানুসারে বোঝা যায় যে, নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই সর্বোত্তম পন্থা। কুরআনের কোন কোন সূরার উদ্ধৃতি দিয়ে আমি সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছি। তাতে এ দাবির সত্যতা প্রমাণিত হবে। কুরআন মজীদে আছেঃ "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল্ আ'লা.....।" আল্লাহ্-তত্ত্ব হলো কুরআনের আসল বস্তু এবং নুবুওয়াত হলো তার শাখা বিশেষ। এ জন্য কুরআন মজীদের সাধারণ পদ্ধতি হলো—প্রথমে আল্লাহ্-তত্ত্ব বর্ণনা করা। তাই আল্লাহ্ তাআলা উক্ত সূরায় আল্লাহ্-তত্ত্বযোগে বিষয়টি আরম্ভ করেন এবং বলেনঃ "তুমি নিজ আল্লাহ্‌র তস্‌বীহ্ পাঠ কর, যিনি সবার ঊর্ধ্বে" অর্থাৎ জড়জগতের সঙ্গে যাঁর কোন সামঞ্জস্য নেই।

কেননা জড়জগত হলো উপাদানবিশিষ্ট ও আকারের যৌগিক। এগুলোর সত্তা বা গুণ পরিবর্তনীয় ও ধ্বংসনীয়। কিন্তু আল্লাহ্ এ সবের উর্ধ্বে।

"আল্লাযী খালাকা ফা-সাও-ওয়া"—"আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন ও সুষমামণ্ডিত করেছেন।" এর উদ্দেশ্য হলো—কায়ার সৃষ্টি কৌশল বর্ণনা করা।

"ওয়াল্লাযী কাদ্দারা ফা-হাদা"—এবং যে আল্লাহ্ নিরূপণ করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন।"—এখানে আত্মার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

"ওয়াল্লাযী আখ্‌রাজাল্ মার্‌আ"—"এবং যে আল্লাহ্ পশুর আহার্য সৃষ্টি করেছেন"—এখানে উদ্ভিদ জগতের প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে। সার কথা হলো—জড়জগত, উদ্ভিদ জগত, প্রাণীজগত ও আত্মা—এসবই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ।

আল্লাহ্-তত্ত্ব বর্ণনার পর আল্লাহ্ তাআলা নুবুওয়াতের বর্ণনা দেন। আগেই বলা হয়েছে যে, নবীদের পূর্ণাঙ্গতা নির্ভর করে চারটি বস্তুর উপরঃ চিন্তাশক্তি, কর্মশক্তি, অন্যান্যদের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তির পূর্ণতা সাধন। তাই আল্লাহ্ তাআলা ক্রমানুসারে এ চারটি বস্তু বর্ণনা করেনঃ

"সা-নুক্‌রিউকা ফালাতান্‌সা"—"আমি আপনাকে পড়িয়ে দেবো। এরপর আপনি তা আর ভুলবেন না।"—এটা হলো চিন্তাশক্তির পূর্ণতার বর্ণনা অর্থাৎ হে পয়গাম্বর! আপনাকে পবিত্র আত্মা দান করা হয়েছে, যা ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তবে মনুষ্যসুলভ কোন ভুল-ভ্রান্তি যদি হয়, তা স্বতন্ত্র কথা।

"ওয়া-নুইয়াস্‌সিরুকা লিল্-ইউস্‌রা"—"এবং আমি আপনাকে আস্তে আস্তে সহজ পথে নিয়ে যাবো।" এতে কর্মশক্তির পূর্ণতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে অর্থাৎ আপনার মধ্যে এমন একটি শক্তি সৃষ্টি করবো, যাতে আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও সৌভাগ্যের কাজ করতে পারেন।

"ফা-যাক্‌কির্ ইন্-নাফাআতিয্-যিক্‌রা"—"যদি আপনার উপদেশ উপকারে আসে, তবে তাদের বুঝিয়ে বলুন!" এখানে অপূর্ণাঙ্গ লোকদের পরিশোধনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কারণ

উপদেশ দান ও উপলব্ধি করানোর উদ্দেশ্য হলো—অপূর্ণাঙ্গদের সংশোধিত করা। এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, সকল ব্যক্তি সংশোধনযোগ্য নয়। কেননা মানব আত্মার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কোন কোন লোককে বুঝালে লাভ হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয় না। এমনও লোক আছে, যাদের বুঝালে উল্টো ফল হয়। কেননা তাদের বুঝালে বিবাদ, ক্রোধ ও হঠকারিতা আরো বেড়ে যায়।

এরপর আল্লাহ্ উভয় প্রকার লোকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন ঃ "সাইয়ায্যাক্কারু মাঁয়্ইয়াখ্শা"—"যে আল্লাহ্কে ভয় করে, সে শিগগির উপদেশ গ্রহণ করবে"—অর্থাৎ যারা সংশোধনযোগ্য, তারাই উপদেশ গ্রহণ করবে। এদের চিহ্ন হলো—এরা সব সময় আল্লাহ্র ভয়ে কম্পমান থাকবে।

"ও-ইয়াতাজান্নাবুহাল্ আশ্কাল্লাযী ইয়াস্লান নারাল্ কুব্রা"—"উপদেশ থেকে সেই হতভাগ্যই দূরে থাকে, যে মহাআগুনে প্রবেশ করবে"—অর্থাৎ যে ব্যক্তি হতভাগ্য, সে-ই উপদেশের প্রতি বিরাগ-ভাজন হয়ে থাকে। ফলত সে দুনিয়াতেও বিপদগ্রস্ত হয়, পরকালেও।

"সুম্মা লাইয়ামূতু ফীহা ওয়ালা ইয়াহ্ইয়া"—"অতঃপর এ হতভাগ্য মরবেও না, বাঁচবেও না"—তার মানে হলো—মানুষ মরলেও মূলত মরে না। কেননা আত্মা সব সময় জীবিত থাকে। 'বাঁচবেও না'—এর মানে এরূপ বাঁচা সত্যিকার অর্থে বাঁচা নয়।

"কাদ্আফ্লাহা মান্ তাযাক্কা"—"সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে পরিশুদ্ধি অর্জন করেছে।" নবীদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দু'টো ঃ অন্যায় দূর করা ও ন্যায়ের শিক্ষা দেওয়া। "মান্ তাযাক্কা" দিয়ে প্রথম উদ্দেশ্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কেননা পরিশুদ্ধি অর্জনের অর্থ হলো কুচরিত্র দূর করা।

"ওয়া-যাকারাস্মা রাব্বিহী ফাসাল্লা"—"এবং তার আল্লাহ্কে স্মরণ করেছে ও নামায সম্পন্ন করেছে"—এ আয়াতে মঙ্গলের শিক্ষা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের পূর্ণতার বর্ণনা রয়েছে। কেননা সেরা জ্ঞান হলো—আল্লাহ্র পরিচিতি লাভ এবং সেরা ইবাদত হলো—নামায।

"বাল্ তুসিরুনাল্ হাইয়াতাদ্ দুনিয়া"—"বরং এরা পার্থিব জীবনকে উত্তম বলে মনে করে"—অর্থাৎ লোকেরা নবীর শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এর কারণ হলো—তারা দুনিয়ার ভালবাসায় প্রলুব্ধ।

"ওয়াল্ আখিরাতু খাইরোঁও-ওয়া-আব্কা"—"এবং পরকাল অধিকতর ভাল ও চিরস্থায়ী।" আল্লাহ্ পরকালের শ্রেষ্ঠত্ব দু'ভাবে প্রমাণ করেন। প্রথম হলো—আধ্যাত্মিক উপভোগ পার্থিব উপভোগ থেকে অনেক শ্রেয়। দ্বিতীয় হলো—পরকালীন উপভোগ স্থায়ী ও স্থিতিশীল।

সারকথা হলো—উক্ত আয়াতসমূহে চারটি বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ (১) আল্লাহ্র গুণাবলী (২) নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য (৩) হতভাগ্য ও ভাগ্যবান—এই দুই শ্রেণীতে লোকদের বিভক্ত করা ও তাদের পরিণাম ফল বর্ণনা করা (৪) দুনিয়ার উপর পরকালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এ চারটি বস্তু হলো—জ্ঞান ও কর্মের ভিত্তি। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ "ইন্না হাযা লাফিস্ সুহুফিল্ উলা"—"এ কথা-গুলো আগেকার গ্রন্থসমূহেও রয়েছে।"—অর্থাৎ পূর্বে যত নবী বিগত হয়েছেন, সকলেরই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এ চারটি বস্তু।

এমনিভাবে সূরা-এ-'ওয়াল-আস্রে'-এর মধ্যেও এসব বস্তুর বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য আমি এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করছি ঃ

"ইন্নাল্ ইন্সানা লাফী খুস্রিন"—"নিঃসন্দেহে মানুষ লোকসানে আপতিত।" আগেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র ১৯টি শক্তি আছে। ১০টি হলো বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। দু'টো হলো—কাম ও ক্রোধ। ৭টি হলো উদ্ভিজ্জ শক্তি। দেহ-নরকে এই ১৯টি চৌকিদার রয়েছে। এসব শক্তি মানুষকে দুনিয়ার দিকে আকর্ষণ করে। কেবল মাত্র বিবেক-বুদ্ধিই মানুষকে এ আকর্ষণ থেকে বিরত রাখতে চায়। কিন্তু এ শক্তি সে সবের তুলনায় দুর্বল। এতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত মানুষ ঘাটতিতে আপতিত। কেবল তাঁরাই এর ব্যতিক্রম, যাঁরা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির ক্ষমতা রাখেন। এ ক্ষমতা চারটি বস্তুর যৌগিক ঃ (১) প্রথম হলো চিন্তা শক্তির পূর্ণতা। এ শক্তির প্রতি ইংগিত করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"ইল্লাল্লাযীনা আমানূ"—"কিন্তু যাঁরা ঈমান গ্রহণ করেছেন।" (২) দ্বিতীয় হলো কর্মশক্তির পূর্ণতা। এ দিকে ইংগিত করে আল্লাহ বলেন ঃ "ওয়া-আমিলুস্ সালিহাতি"—"এবং যাঁরা সৎকাজ করেছেন"।

(৩) তৃতীয় হলো—চিন্তাশক্তির পূর্ণতা সাধনের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন। এর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন : "ওয়া-তওয়াসাও বিল্ হাক্কি"—"এবং যাঁরা লোকদের সততার উপদেশ দেন।" (৪) চতুর্থ হলো—কর্মশক্তির পূর্ণতা সাধনের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ "ওয়া-তওয়াসাও বিস্‌সাব্‌রি"—"এবং যাঁরা লোকদের ধৈর্যের উপদেশ দেন"। এখানে সন্দেহ হতে পারে এবং এ ধারণা কারো মনে জাগতে পারে যে, শুধু ধৈর্য দিয়ে কর্মশক্তির পূর্ণতা কিভাবে সাধিত হতে পারে? এর উত্তর হলো—মানুষ যত রকমের অসৎ কাজ করে, তা' মাত্র দু'টি বস্তুর ফলশ্রুতি : কাম ও ক্রোধ। কামুকতা হলো প্রত্যেক প্রকার কুপ্রবৃত্তিজনিত কর্মের মূল কারণ। আর ক্রোধ হলো—রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের উৎসমূল। এজন্যেই আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন ফেরেশতাগণ বললেন, "আপনি (আল্লাহ্) কি পৃথিবীতে এমন একটি লোক সৃষ্টি করতে চান, যে ব্যক্তি তথায় ফ্যাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে?" সুতরাং মানুষ যদি ধৈর্য-বলে কাম ও ক্রোধকে দাবিয়ে রাখতে পারে, তবে কর্মশক্তির গুণাবলী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিকশিত হবে।

অনেক আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য এ চারটি গুণই যথেষ্ট, মুজিযার কোন প্রয়োজন নেই। কাফেরগণ যখন রসূলুল্লাহ্‌র নিকট মুজিযার দাবী করে বললো: আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যতক্ষণ না আপনি জমিন থেকে ঝরনা প্রবাহিত করেন। তখন আল্লাহ্ উত্তরে বললেনঃ "হে মুহম্মদ! আপনি বলুন, আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি তো কেবল একজন মানুষ ও পয়গাম্বর"—অর্থাৎ পয়গাম্বরীর জন্য এসব ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। শুধু পূর্ণাঙ্গ চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তিই এর জন্য যথেষ্ট।

'শুয়ারা' নামক এই সূরায় আল্লাহ্ যেখানে বলেছেন যে, কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র বাণী, শয়তানের বাণী নয়, সেখানে একথাও বলেছেন যে, আমি কি তোমাদের বাতলে দেবো যে, শয়তান কার কাছে আসে? আল্লাহ্ বলেন : "শয়তান মিথ্যাবাদী ও পাপীদের কাছেই আসে"—অর্থাৎ কুরআনের বাণী যদি শয়তানের দিক থেকে হতো, তবে এ বাণীর প্রচারক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীরাই হতো এবং আল্লাহ্ এসবের শিক্ষা দিতেন না। কারণ শয়তানই মিথ্যা ও পাপাচারের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

রসূলুল্লাহ্ তো দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হওয়ারই শিক্ষা দিতেন। এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌র নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য কেবল একথাই বলা হয়েছে যে, তিনি দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হওয়ার শিক্ষাই দেন। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, নুবুওয়াতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, মুজিযার প্রয়োজন নেই।

কাফেররা বলতো, মুহম্মদ একজন কবি এবং প্রত্যেক কবির কাছেই একজন শয়তান থাকে সে তাকে তার কাব্য রচনায় সাহায্য করে। তদুত্তরে আল্লাহ বলেন, কবিরা অলি-গলিতে মাথা কুটে মরে—অর্থাৎ তারা পার্থিব ভোগ-বিলাসের শিক্ষা দেয় এবং সেদিকেই উৎসাহিত করে। অথচ রসুলুল্লাহ দিচ্ছেন আল্লাহ্‌ভীরুতার শিক্ষা। তাই শয়তান তাঁর দোসর ও সাহায্যকারী হতেই পারে না। এসব আয়াতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, নুবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই উত্তম পন্থা।

তৃতীয় অনুশীর্ষ

পয়গাম্বরের প্রচার পদ্ধতি

নুবুওয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো—লোকদের পার্থিব মোহ থেকে বিরত রাখা, এবং এর পরিণামের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। কিন্তু মানুষ পার্থিব সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না বলেই পয়গাম্বর-দেরকেও বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে পয়গাম্বরের যে কর্তব্য রয়েছে, তা প্রধানত তিনটি নীতিতে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. নবিগণ শিক্ষা দেবেন যে, বিশ্ব অস্থায়ী এবং এর একজন স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান আছেন এবং অনন্ত-কাল থাকবেন। তাঁর সঙ্গে জড় জগতের কোন সাদৃশ্য নেই। তাঁর মধ্যে পূর্ণতার সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটেছে সমস্ত সম্ভাব্য সৃষ্টির উপর তাঁর শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী। তিনি একক ও অতুলনীয় অর্থাৎ তাঁর কোন অঙ্গ নেই, সহযোগী নেই, প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। তাঁর স্ত্রীও নেই, সন্তান-সন্ততিও নেই। এরপর নবিগণ এ শিক্ষা দেন যে, বিশ্বে যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহ্‌র আদেশ ও তাঁর ইচ্ছায়ই ঘটে থাকে। আল্লাহ যুলুম ও অপ্রয়োজনীয় কাজ করেন

না। এসব বস্তু শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবিগণ নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন :

২. নবিগণ ধর্মীয় বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিতর্কের পথ বেছে নেন না। কেননা এতে অভিযোগের পথই প্রশস্ত হয়। তাঁরা যদি অভিযোগ খণ্ডনে রত হন, তবে তা বেড়েই চলবে, আর আসল উদ্দেশ্য পড়ে থাকবে পেছনে। এজন্য নবিগণ সম্বোধন-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এতে উৎসাহ দান এবং ভয় প্রদর্শনের কাজও সম্পন্ন হয়। উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনের দরুন মানুষের মন বিমোহিত হয় এবং তাতে সমালোচনারও অবকাশ থাকে না। এ ধরনের প্রমাণ স্বভাবতই দৃঢ়ভিত্তিক হয়। তাই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তা গ্রহণ না করে পারেন না।

৩. পয়গাম্বরগণ হঠাৎ এ কথা বলেন না যে, সবদিক থেকে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিরাজি থেকে স্বতন্ত্র। কারণ সাধারণভাবে এরূপ কিছু বলা হলে তা মানুষের জ্ঞান আসতে পারে না। তাই তাঁরা প্রথমে বলেন, জড় বস্তুর সঙ্গে আল্লাহ্‌র কোন তুলনা হয় না। যেমন কুরআনে আছে : "লাইসা কামিস্‌লিহি শাইউন্"—"তাঁর আল্লাহ্‌র মত আর কোন বস্তু নেই।" অতঃপর তাঁর শিক্ষা দেন যে, আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান। সমস্ত ভাল কাজের উৎস হলেন তিনি। তিনি আর্‌শের উপর অবস্থিত। কিন্তু এসব জটিল ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে তাঁরা লোকদের বিরত রাখেন। তবে যদি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি হয়, তবে এরূপ চিন্তা-ভাবনায় দোষের কিছু নেই। অতঃপর তাঁরা শিক্ষা দেন যে, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা যা ইচ্ছা করে, তাই করতে পারে। যা করার ইচ্ছা নেই, তা ছেড়ে দিতে পারে। অন্যদিকে নবিগণ এ শিক্ষাও দেন যে, আল্লাহ্ মানুষকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা দান করলেও পৃথিবীতে যা কিছু হয়, সে সব আল্লাহ্‌র হুকুমেই হয়। একটি ধূলিকণাও তাঁর আদেশ ছাড়া নড়তে পারে না। এ দু'টো ধারণা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও নবিগণ সেগুলোকে যেমনি অবস্থায় আছে, তেমনি অবস্থায় রেখে দেন। তাঁরা লোকদেরকে এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) তালীমের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এ পদ্ধতিই সর্বোত্তম। তিনি সর্বপ্রথম জোরালোভাবে

আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করেন এবং এ আয়াতগুলো পেশ করেনঃ "ওয়াল্লাহুল্ গনিইউ-ওয়া-আন্তুম্ ফুকারাউ" —"আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু তোমরাই মুখাপেক্ষী।" এ আয়াতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র কোন বস্তুরই প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি মুখাপেক্ষী নন, আর মুখাপেক্ষী না হলে কোন বস্তুরই প্রয়োজন হয় না। তাঁর যখন কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই, তাই তিনি যৌগিকও হবেন না; আবার স্থান জুড়েও থাকবেন না। যৌগিক হলে বা স্থান জুড়ে থাকলে তাঁর জন্য অঙ্গ ও স্থানের প্রয়োজন হতো। "লাইসা কামিস্‌লিহি-শাইউন্" —"তাঁর মত আর কোন বস্তু নেই"—এ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ শরীরী নন। কারণ শরীর থাকলে কোন পদার্থের সাথে তাঁর সাদৃশ্য থাকতো। এর সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে বারবার তাগিদ দিয়ে বর্ণনা করেন। এরূপ করার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। কারণ এরূপ না করা হলে লোকেরা মনে করতো যে, আল্লাহ্‌র যখন শরীর নেই, দিক্‌ও নেই, তখন তিনি মূলতই নেই। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন। কুরআন মজীদে আছেঃ "তাঁর (আল্লাহ্‌র) কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি, যে সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" "স্ত্রীলোক কিরূপ সন্তান গর্ভধারণ করে, তা আল্লাহ্‌ই জানেন"—কিন্তু আল্লাহ্‌র এ অবগতি তাঁর সত্তাভুক্ত, নাকি সত্তাবহির্ভূত—এ নিয়ে রসূলুল্লাহ্ আলোচনা করেন নি। অতঃপর তিনি বলেন, মানুষ কর্মকর্তা, শিল্পী, স্রষ্টা—এ সবই হতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন, ভাল-মন্দ যা কিছু হয়, সব আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই হয়। এ দুই ধরনের কথার মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ ও গরমিল দেখা যায়, সে দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নি। বরং তিনি এগুলোর প্রতি মোটামুটি বিশ্বাস স্থাপন করতে আদেশ দেন।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্‌র শিক্ষার মূল কথা হলো—আল্লাহ্‌কে দোষ-মুক্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মেনে নিতে হবে। এতে পারস্পরিক বিরোধ বা গরমিল দেখা দেয় কিনা—এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। এতে রহস্য হলো এই যে, মানুষকে যদি কুকাজের স্রষ্টা বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে আল্লাহ্ জুলুম ও অন্যায়ের অভিযোগ থেকে রেহাই পান। কিন্তু এতে তাঁর ক্ষমতা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আর যদি

বলা হয় যে, মন্দ কাজের স্রষ্টাও আল্লাহ্, তবে অবশ্য আল্লাহর শক্তির ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাঁর প্রতি যুলুম ও অবিচারের অভিযোগ এসে বর্তায়। এ জন্য রসূলুল্লাহ এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌কে যাবতীয় কর্মের স্রষ্টাও মানতে হবে, আবার জোর-যুলুম থেকে মুক্ত বলেও বিশ্বাস করতে হবে।

নবীদের শিক্ষার দ্বিতীয় নীতি হলো—মানুষ তিনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ঃ অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধন-সম্পদের মাধ্যমে। প্রথম প্রকার ইবাদত হলো আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। দ্বিতীয় হলো—নামায, রোযা ইত্যাদি। তৃতীয় হলো যাকাত ইত্যাদি।

নবীদের শিক্ষার তৃতীয় নীতি হলো—কেয়ামত ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এ তিনটি বস্তু হলো নবীদের শিক্ষার মৌলিক নীতি।

প্রধান প্রধান ধর্মীয় কর্তব্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ সৎ কাজ সম্পন্ন করা এবং অসৎ কাজের পথ রুদ্ধ করা। দ্বিতীয় প্রকার কর্তব্য প্রথমেই পালনীয়। কেননা বোর্ডের উপর যদি ভুল লেখা থাকে, তবে তা আগেই মুছে ফেলতে হয়। এ জন্যেই সূরা-এ-বাকারার মধ্যে যে সাত প্রকার ধর্মীয় কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে তাক্‌ওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভীরুতার কথাই সর্বাগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "হুদাল্ লিল্‌মুত্তাকীন"--"কুরআন আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য পথ-প্রদর্শক।" কারণ কুকাজ থেকে বেঁচে থাকাই হলো আল্লাহ্‌ভীরুতা। বাকী ধর্মীয় কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে আত্মার গুরুত্ব অনুধাবন করা। এটা মানতেই হবে যে, আত্মার মর্যাদা, দেহ ও ধন-সম্পদের মর্যাদার চাইতে অনেক বেশী। এজন্য আল্লাহ্‌ভীরুতার পর সর্বপ্রথম বলা হয়েছে ঃ "ইউমিনূনা-বিল্-গাইবি"—"তাঁরা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান গ্রহণ করে।" কেননা ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা আধ্যাত্মিক ব্যাপার।

অতঃপর আল্লাহ নামাযের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ "ওয়া-ইউ-কীমূনাস্‌সালাতা"—"এবং তাঁরা সুচারুরূপে নামায আদায় করেন।" কেননা নামায শারীরিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আল্লাহ যাকাতের বিষয় বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ "ওয়া-মিম্মা রাযাক্‌নাহুম ইউন্‌ফিকূন"—"এবং আমি তাঁদেরকে যে

জীবিকা দিয়েছি, সেখান থেকে তাঁরা ব্যয় করেন।” কেননা যাকাত হলো ধন সম্পর্কিত ব্যাপার।

এ চারটি বিষয় ছিল আল্লাহ্‌তত্ত্ব সম্পর্কিত। এ গুলো বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ নুবুওয়াত সম্পর্কিত বিষয়াদি বর্ণনা করেন এবং বলেন:

“ওল্লাযীনা-ইউমিনূনা বিমা উন্‌যিলা ইলাইকা”—“এবং যাঁরা আপনার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন।” এখানে রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ বলেন:

“ওমা উন্‌যিলা মিন্‌কাবলিকা”—“এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে (অন্যান্য নবীদের প্রতি)”—অর্থাৎ আগেকার নবীদের প্রতি ঈমান গ্রহণ করাও শর্ত। আল্লাহ্‌তত্ত্ব ও নুবুওয়াতের বর্ণনার পর আল্লাহ্‌তাআলা অতীতের কথা স্মরণ করিয়েছেন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য যা করণীয় রয়েছে, সেগুলোরও বিবরণ পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন:

“উলাইকা আলা হুদাম্ মির্‌রাব্বিহিম্ ওয়া-উলাইকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন” —“এঁরাই তাদের প্রভুর নির্ধারিত সত্য পথে রয়েছেন এবং এঁরাই সফলকাম হবেন।” এখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, যতদিন মানুষ পৃথিবীতে আছে, ততদিনই সে মুসাফির। মুসাফিরের জন্য প্রয়োজন পথের চিহ্ন ও অবস্থা জেনে নেওয়া। এজন্যই যাঁরা উক্ত কর্তব্য পালন করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন: এঁরা পথের সঙ্গে পরিচিত এবং এঁরাই মৃত্যুর পর সফলকাম হবেন অর্থাৎ উদ্দিষ্ট মনজিলে পৌঁছতে পারেন। এ উক্তির পর ইমাম রাযী বলেন, ইসলামের প্রতি আহবান করার এটাই সর্বোত্তম পন্থা। আমি যদি ইসলামী শরীঅতের রহস্যের আরো বর্ণনা দিই, তবে তা একটি বড় গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। এজন্য সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি বলে এখানেই ক্ষান্ত করছি।

চতুর্থ অনুশীর্ষ

মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

আগেই বলা হয়েছে যে, পয়গাম্বরের কাজ হলো মানবাত্মার চিকিৎসা করা। তাই এ গুণ যে নবীর মধ্যে যত বেশী থাকবে, তিনিই

নুবুওয়াতেও ততবেশী কামিল ও পূর্ণাঙ্গ হবেন। এখন পূর্বসূরী নবীদের কথা ভেবে দেখুন। হযরত মূসা (আঃ)-এর শিক্ষার প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল বনীইসরাইলের মধ্যে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষা বলতে গেলে অকার্যকরই ছিল। যারা আজ খৃীস্টধর্মের দাবী করছে, তারা ত্রিত্ববাদের পক্ষপাতী। এটা স্পষ্ট কথা যে, হযরত ঈসা (আঃ) ত্রিত্ববাদের শিক্ষা দেন নি। তাই যারা নিজেদের খৃীস্টান বলে পরিচয় দিচ্ছে, বস্তুত তারাও খৃীস্টান নয়। এখন রসূলুল্লাহ্‌র নুবুওয়াত সম্পর্কে ভেবে দেখুন।

রসূলুল্লাহ্‌র পূর্বে সারা বিশ্ব বিপদগামী ছিল। মূর্তিপূজকেরা পাথরের পূজা করতো। ইহুদীরা আল্লাহ্‌কে শরীরী বলে মনে করতো। অগ্নিপূজকেরা দুই আল্লাহ্ মানতো এবং মাতা ও কন্যাকে বিয়ে করতো। খৃীস্টানেরা ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসী ছিল। সায়েবীন নক্ষত্র পূজা করতো। এভাবে সারা দুনিয়া পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত ছিল। রসূলুল্লাহ্‌র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাতিল ধর্ম ধূলোর মত উড়ে গেল এবং তওহীদ-সূর্যের আলো সারা পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত হলো। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ্‌র প্রচার ও হেদায়তের প্রভাব পূর্ববর্তী নবীদের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর ছিল। এজন্য নুবুওয়াতের দিক থেকে তিনি হলেন নবীদের সেরা।

পঞ্চম অনুশীর্ষ

নিম্ন পদ্ধতিতে নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা মুজিযা দিয়ে প্রমাণ করার চাইতে অধিকতর শ্রেয়

মুজিযা দিয়ে নুবুওয়াত প্রমাণ করার মানে হলো—কর্ম দিয়ে কর্মকর্তাকে প্রমাণ করা। পূর্বক্ষণে নুবুওয়াতের যে সব প্রমাণ দেওয়া হলো, তাতে তার হকিকত সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে থাকবে। সে প্রমাণগুলোর সার হলো—রসূলুল্লাহ্ হলেন আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসক। আর আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসককেই বলা হয় পয়গাম্বর।

এ বর্ণনায় এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, রসূলুল্লাহ্‌র জন্য তর্কশাস্ত্র, দর্শন, জ্যামিতি, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা এসব বস্তু আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এ বিবরণের ফলে নুবুওয়াতের প্রতি

আনীত অভিযোগগুলো খণ্ডিত হওয়ার কথা। নুবুওয়াতের প্রতি এ অভিযোগ করা হয় যে, প্রত্যেক নবী পূর্ববর্তী নবীদের শরীঅতকে নাকচ করে দেন। এটা হলো একটি অকাজ। এর উত্তর হলো—শরীঅতের দু'টো দিক আছে ঃ চিন্তামূলক ও ব্যবহারিক। চিন্তামূলক দিকটার কোন রদ-বদল নেই। তা হলো—কেবল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করা ও মানবতার হিত কামনা করা। এতে রদ-বদল মোটেও নেই। কুরআন বলছে ঃ

"আসুন, আমরা এবং আপনারা এমন একটি মতে ঐক্যবদ্ধ হই, যা আমাদের উভয়ের কাছে সমর্থনযোগ্য। তা হলো—আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না।"

শরীঅতের দ্বিতীয় দিক হলো ব্যবহারিক বিধি-বিধান অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ ও আইন-কানুন। এটা অবশ্য রদ-বদলযোগ্য। এর তাৎপর্য হলো এই যে, মানুষ যখন কোন কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করতে থাকে, তখন তাতে আর কোন প্রেরণা থাকে না। তখন সে অভ্যাস-বশতই সে কাজ করতে থাকে—প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে নয়। বিধি-বিধানের রদ-বদলের দরুন নতুনত্বের সৃষ্টি হয়। তখন লোকেরা উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে সেকাজ করতে আরম্ভ করে।

শরীঅতের প্রতি আরো একটি অভিযোগ হলো এই যে, এতে যুগে যুগে যে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়, তা করতে গিয়ে হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত ঘটানো মোটেও সমীচীন নয়। এর উত্তর হলো শরীঅতের অঙ্গ বিশেষ বজায় রাখার জন্য যদি এরূপ না করা হয়, তবে লোকেরা মৌলিক ধর্মকেও অমান্য করবে। কিন্তু আমার মতে, ইসলামী শরীঅতে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ ছাড়া অন্য কোন অবস্থায়ই হত্যা ও রক্তপাতের অনুমতি নেই। (শিবলী নুমানী)

সর্বশেষ অভিযোগ হলো এই যে, কুরআন মজীদে তুলনাবোধক বহু শব্দ রয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ শরীরী ও স্থানী। এর উত্তর হলো—মানবিক ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহ্‌র ধারণা দেওয়া হলে সাধারণ লোকের জ্ঞানে তা আসতে পারে না। এজন্যই মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হলো।

ইমাম গাযালীর 'মাআরিজুল্ কুদ্‌স্' থেকে কিছু কথা

'নুবুওয়াত ও রিসালত' শীর্ষক অধ্যায়ের সারকথা

এ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে :

১. নুবুওয়াতের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বর্ণনা করা কি সম্ভব ?

২. নুবুওয়াত কি অর্জন করার বস্তু, না কি তা আল্লাহ্ প্রদত্ত ?

৩. নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ

৪. নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য তথা মুজিযার বর্ণনা

৫. নুবুওয়াতের প্রচার

প্রথম আলোচ্য বিষয়

নুবুওয়াতের অর্থ বোঝার জন্য যুক্তিবিদ্যাসম্মত পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা শত শত বরং হাজার হাজার বস্তুর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা ও স্বরূপ জানি না। তথাপি সেগুলোর মর্ম আমরা বুঝে নিচ্ছি। এতে বোঝা গেল যে, কোন বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধি, আত্মা ও অজড় পদার্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণা রয়েছে নিশ্চয়ই। অথচ সেগুলোর গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। মনে করুন, কোন ব্যক্তি যদি কোন পয়গাম্বরকে নুবুওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, তবে তিনি কি তার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বাত্‌লে দিতেন ? আর যদি বাত্‌লে না দিতেন, তবে সে ব্যক্তির পক্ষে নুবুওয়াতের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা না পাওয়া পর্যন্ত ঈমান থেকে বিরত থাকা কি সমীচীন হতো ?

মনুষ্যত্ব যেমন পশুত্বের ঊর্ধ্বে, তেমনি নুবুওয়াত হলো সাধারণ মনুষ্যত্বের ঊর্ধ্বে। মানুষ প্রাণীজগতকে বশীভূত করে। কিন্তু প্রাণী-জগত এ ওজর দিতে পারে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে মানুষের গূঢ় তত্ত্ব বাতলানো না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তার আনুগত্য স্বীকার করবো না। সাধারণ মানুষ এবং পয়গাম্বরের মধ্যেও এ ধরনের

সম্পর্ক রয়েছে। ফিরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে বারবার আল্লাহ্‌র স্বরূপ জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, বরং তিনি আল্লাহ্‌র শক্তির নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন। কেননা আল্লাহ্‌র স্বরূপ বর্ণনা করাই ছিল অসম্ভব। ঈমান গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌র হকিকত জানার প্রয়োজনও ছিল না।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় ঃ

নুবুওয়াত অর্জন করার বস্তু নয়, বরং আল্লাহ্ যে ব্যক্তির মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি করেন, তিনিই নবী হতে পারেন। কুরআন শরীফে আছে ঃ "পয়গাম্বরীর জন্য কা'কে বাছাই করা হবে, তা আল্লাহ্ই জানেন।" তবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধ্যানের অনুশীলন—এসব নুবুওয়াতের জন্য আবশ্যক। এগুলো পাওয়া গেলে নবী ওহী প্রাপ্তির উপযুক্ত হন। এর উদাহরণ হলো—মানুষের জন্য মনুষ্যত্ব লাভ করা অর্জনীয় বস্তু নয়। কিন্তু তার হাতে যে সব কর্ম সম্পন্ন হয়, তাতে তার চেষ্টা ও সাধনার অংশ থাকবে নিশ্চয়ই। এমনিভাবে নুবুওয়াত অর্জনীয় বস্তু নয়। কিন্তু নবী যদি ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনা করেন, তবেই তো তাঁর কাছে নুবুওয়াতের নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে। এজন্য নবীজী এত বেশী ইবাদত করতেন, যার ফলে তাঁর পা ফুলে যেতো।

নবী স্বভাবতই সুমতি-গতিসম্পন্ন ও সুশ্রী হয়ে থাকেন। তাঁর লালন-পালন যথাযথভাবেই হয়। তাঁর চরিত্র পরিমার্জিত হয়। তাঁর চেহারা থেকে যেন নূর বিচ্ছুরিত হয়। ধৈর্য, আত্মসম্মানবোধ, বিনয়, সত্যবাদিতা, সততা—এসব গুণ তার স্বভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি প্রত্যেক প্রকার কুকাজ ও অশোভন আচার-আচরণের দোষ থেকে মুক্ত। ক্ষমা, ইহ্‌সান, প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ, উৎপীড়িতের সাহায্য-দান—এসব গুণ তাঁর মধ্যে স্বভাবতই দেখা যায়। তিনি প্রকৃতিগত-ভাবেই ভাল কাজ পছন্দ করেন এবং মন্দ কাজকে ঘৃণা করেন। নবী কখনো অহংকারী, যালিম, নিষ্ঠুর ও দুশ্চরিত্র হন না। তিনি নিশ্চুপ থাকলেও লোকের উপর তাঁর প্রভাব না পড়ে পারে না। তাঁর কথা বলার সময় কেউ হস্তক্ষেপ করে না। তাঁর চাল-চলনে গাম্ভীর্য পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত লোক, সন্তুষ্ট চিত্তে হোক বা অসন্তুষ্ট চিত্তেই হোক, তাঁর কাছে মাথা নত করে।

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ঃ

নুবুওয়াতের প্রমাণ ঃ

নুবুওয়াত প্রমাণের দুটি পদ্ধতি আছে ঃ মোটামুটি প্রমাণ ও বিস্তারিত প্রমাণ। আমি উভয় প্রকার প্রমাণ আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করছি। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষের আত্মাই তাকে প্রাণীজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। এটাই মানুষকে পশুর উপর প্রাধান্য দেয়। এর বলেই মানুষ প্রাণীজগতকে বশীভূত করে; তাদের উপর হস্তক্ষেপ করে। এমনিভাবে নবীদের মধ্যেও এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধিমত্তা থাকে। এর বদৌলতে তাঁরা মানব সমাজে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন। সমস্ত মানুষ তাঁদের আদেশ ও পরিচালনাধীন থাকে। মানুষের কাজ-কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান যেমন প্রাণীদের জন্য মুজিযাস্বরূপ, তেমনি নবীদের কাজ-কর্মও সাধারণ মানুষের জন্য মুজিযাস্বরূপ অর্থাৎ সাধারণ লোক থেকে এরূপ মুজিযা ঘটতে পারে না।

নবীদের বুদ্ধিমত্তা যেমন অন্যান্যদের বুদ্ধিমত্তা থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি তাঁদের আত্মা, স্বভাব, আর মতিগতিও সমস্ত লোক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। কারো সঙ্গে যদি তাঁদের সামঞ্জস্য থাকে, তবে রয়েছে ফেরেশতাদের সঙ্গে।

প্রত্যেকটি প্রাণী যেমন মানুষ হতে পারে না, তেমনি সকল মানুষও নবী হতে পারে না। আল্লাহ্ জানেন, কার মধ্যে নুবুওয়াতের যোগ্যতা রয়েছে এবং কার মধ্যে নেই। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ নুবুওয়াতের জন্য বাছাই করেন, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর মতিগতি—সবই স্বতন্ত্র ধরনের হয় অর্থাৎ অন্যান্য লোকের বুদ্ধি ও মেজাজের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই হয় না। আকারের দিক থেকে অন্যান্য মানুষের মত হলেও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর দিক থেকে তিনি সকল মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। তিনি মানুষ বটে; কিন্তু তাঁর মধ্যে বিদ্যমান মানবিক গুণ ওহী গ্রহণের যোগ্যতা। কুরআন মজীদে আছে ঃ "হে মুহম্মদ! আপনি বলুন, আমি আপনাদের মতই একজন মানুষ, তবে আমার কাছে ওহী অবতীর্ণ হয়।" এ আয়াতে উক্ত কথাগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

বিস্তারিত প্রমাণের তিনটি পদ্ধতি আছে ঃ

প্রথম প্রদ্ধতি ঃ

মানুষের মধ্যে তিনটি শক্তি আছে ঃ চিন্তাশক্তি, প্রকাশ শক্তি ও কর্ম শক্তি। এসব শক্তি বলে যে কাজ সম্পন্ন হয়, তা ভালও হয়, আবার খারাপও হয়। এই পরস্পর বিরোধী কাজের নামও ভিন্ন ভিন্ন। চিন্তা-ধারার ভাল-মন্দ হওয়াকে বলা হয় ন্যায় বা অন্যায়। প্রকাশ-প্রাপ্ত কথাবার্তাকে বলা হয় সত্য বা মিথ্যা এবং কর্মকে ভাল-মন্দ বলে অভিহিত করা হয়। এটা স্পষ্ট কথা যে, সকল কাজ করণীয় নয়, আবার সকল কাজ পরিত্যাজ্যও নয়। বরং কতক কাজ করণীয়, আর কতক পরিত্যাজ্য।

এখন প্রশ্ন হলো—কোন্ কাজ করণীয়, আর কোন্‌টা পরিত্যাজ্য—এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, না-কি কোন ব্যক্তিই এ বিষয়ে সক্ষম নয়? না-কি কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব আর কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয়? প্রথম বিকল্প দু'টো স্পষ্টতই বাতিল। এখন বাকি রইলো তৃতীয় বিকল্পটি অর্থাৎ কতক লোক এটা যাচাই করতে পারে যে, কোন্ কাজটি করণীয় আর কোন্‌টি পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ

এটা স্পষ্ট কথা যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পারস্পরিক সহানুভূতি না হলে কোন মানুষই বাঁচতে পারে না। মানব জাতির ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত কিছুই টিকে থাকতে পারে না। সমাজ ব্যবস্থা ও পারস্পরিক সহানুভূতির জন্য যে বিধি-বিধান রয়েছে, সেটাকেই বলা হয় শরীঅত। আরো পরিষ্কার কথায়, মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য, তার জান-মালের হেফাযতের জন্য দু'টো ব্যবস্থার প্রয়োজন ঃ পারস্পরিক সাহায্য ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমেই তারা আহার্য, পোশাক, বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটায়। প্রতিরোধ ব্যবস্থার দরুন মানুষের জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায়। তাই পারস্পরিক সাহায্য ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য একটি সংবিধান থাকা আবশ্যক।

এটা পরিষ্কার কথা যে, যে কোন ব্যক্তি এ সংবিধান রচনা করতে পারে না। গোটা মানব জাতির অবস্থানুরূপ ও প্রত্যেকটি মানুষের প্রয়োজন মোতাবেক একটি সংবিধান কেবলমাত্র সে ব্যক্তিই রচনা করতে পারেন, যিনি ঐশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, যিনি আধ্যাত্মিক জগত থেকে সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন এবং যাঁর হাতে রয়েছে বিশ্ব-শৃঙ্খলার ডোর। ঐশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধর্মের রহস্যাবলী জানেন। তিনি প্রত্যেক কাজে ন্যায়নীতির অনুসরণ করেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জ্ঞানমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে সম্বোধন করেন; মানুষের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। এ ব্যক্তিই হলেন পয়গাম্বর ও রসূল।

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ

এ পদ্ধতি বুঝতে হলে নিম্নলিখিত সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে ঃ

১. যে বস্তু সম্ভাব্য, তা অস্তিত্ব লাভ করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। তাই তার অস্তিত্ব লাভের জন্য কোন একটি প্রয়োজন অবশ্যই থাকতে হবে। এই প্রয়োজনই তার অস্তিত্বের কারণ।

২. প্রত্যেক প্রকার গতির জন্য একজন গতিস্রষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। সেই স্রষ্টা নিত্য নতুনভাবে গতি সৃষ্টি করতেই থাকে। গতি দুই প্রকার ঃ স্বাভাবিক ও ঐচ্ছিক। ঐচ্ছিক গতির জন্য গতি-স্রষ্টার মধ্যে অবশ্যই ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকতে হবে। ঐচ্ছিক গতি দুই প্রকার ঃ ভাল ও মন্দ। প্রথম প্রকারের জন্য গতিস্রষ্টাকে অবশ্যই বুদ্ধিমান ও শৃঙ্খলা-শক্তির অধিকারী হতে হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে আকাশে তাঁর আদেশ পাঠিয়েছেন।"

৩. গতি সৃষ্টির জন্য যেমন মানুষের মধ্যে ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োজন, তেমনি সে গতিকে ঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য এমন একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন, যিনি ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন।

৪. আল্লাহ্‌র আদেশ দুই প্রকার ঃ শৃঙ্খলামূলক ও কার্যমূলক। প্রথম আদেশটি বিশ্ব-জোড়া। সে আদেশের ফলেই সমগ্র বিশ্বে শৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যায়। কুরআন মজীদে আছে ঃ

"সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র—সবই তাঁর হুকুমের তাবেদার। মনে রাখুন, সৃষ্টি ও আদেশ আল্লাহ্‌র জন্যই।"

উক্ত সূত্রগুলো থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের সমস্ত গতি সম্ভাব্য। তাই সেগুলোর অস্তিত্বের জন্য কোন একটির প্রয়োজন থাকতেই হবে। যে গতি ঐচ্ছিক, তার জন্য বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োজন। এই বুদ্ধির ফলে ভাল-মন্দ উভয়ই সাধিত হতে পারে। এজন্য একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। এই পথপ্রদর্শককে বলা হয় পয়গাম্বর। বিশ্বে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আল্লাহ্‌র যে শৃঙ্খলামূলক আদেশ রয়েছে, তা ফেরেশতাযোগেই প্রচারিত হয়। তেমনি মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র কার্যমূলক (কাজে নিয়োজিত করার) আদেশ পৌঁছানোর জন্যেও একটি মাধ্যমের প্রয়োজন। সেই মাধ্যম হলেন পয়গাম্বর। কতক লোকের ধারণা হলো এই যে, আদেশ, নিষেধ, উৎসাহদান, ভয় প্রদর্শন, সতর্কবাণী উচ্চারণ, তিরস্কার— এসব কাজ নবিগণ নিজের তরফ থেকেই করে থাকেন; এসবের সঙ্গে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক নেই; আল্লাহ্‌র সঙ্গে এসব কাজের যে সম্পর্ক সাধারণত জুড়ে দেওয়া হয়, তা কেবল মৌল সৃষ্টির দিকটি বিবেচনা করেই দেওয়া হয়। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই এরা নবিগণকে মিথ্যাবাদী ও আত্মসাৎকারীতে (আল্লাহ্ মাফ করুন!) পরিণত করেছে। এটা সবাই সমর্থন করে যে, আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের বাদশাহ্ এবং বাদশাই সাধারণত আদেশ, নিষেধ, সতর্কবাণী, তিরস্কার, উৎসাহদান, ভয় প্রদর্শন—এ সবই করে থাকেন। তা হলে আল্লাহ্‌র পক্ষে এসব করানো অসম্ভব কোথায়?

নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য

নুবুওয়াতের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে: (১) কল্পনা শক্তিভিত্তিক (২) চিন্তাশক্তিভিত্তিক (৩) কর্মশক্তিভিত্তিক। প্রথম বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে:

কল্পনাশক্তিতে বস্তুসমূহের আকার অঙ্কিত হওয়ার যে যোগ্যতা রয়েছে, তা বিভিন্ন পর্যায়ের। কতক মানুষের মধ্যে এ যোগ্যতা খুবই দৃঢ় হয়; কতকের মধ্যে দুর্বল, আবার কতকের মধ্যে মোটেই থাকে না। কল্পনাশক্তি দৃঢ় ও গভীর হলে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বস্তুর ঊর্ধ্বে চলে যায় এবং তাতে আকারসমূহ প্রতিবিম্বিত হতে আরম্ভ করে। কল্পনাশক্তির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা একই অবস্থায় থাকে না, বরং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়

উপনীত হয়। পরবর্তী অবস্থাটি পূর্ববর্তী অবস্থার অনুরূপও হতে পারে, আবার স্বতন্ত্র ধরনেরও হতে পারে। যেমন একজন মানুষ কোন একটি বস্তুকে বাহ্য চোখে দেখছে। এ দেখার মধ্য দিয়ে তার খেয়াল সামান্য একটুখানি সূত্র ধরে অন্য একটি বস্তুর দিকে ছুটে চলে। অতঃপর সে বস্তু ছেড়ে তার ধারণা অন্য একটি বস্তুর দিকে ধাবিত হয়। এমন কি সে প্রথম বস্তুর কথাটাই ভুলে যায়। এমতাবস্থায় সে ভাবতে শুরু করে যে, তার মনে এমন ধারণার উদয় কেনই বা হলো? এই সূত্র ধরে সে আবার পেছনে ফেলে আসা স্তরগুলো পুনঃঅতিক্রম করে প্রথম বস্তুতে ফিরে যায়।

এ শক্তি কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে এত প্রবল হয় যে, যেই আকৃতি তার ধারণায় একবার প্রতিবিম্বিত হয়, তা পরেও অক্ষুণ্ণ থাকে। তার কল্পনাশক্তি এ ছবিটিকে দূরে সরিয়ে অন্য বস্তুর ছবি গ্রহণ করতে পারে না। এরূপ শক্তিযোগে মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

কল্পনাশক্তি সাধারণত সে সময়েই কাজ করে, যখন বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলো অকেজো হয়ে পড়ে। এজন্যই নিদ্রার সময় এ শক্তি বেশী প্রবল হয়ে উঠে। কারণ সে সময় বাহ্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোন কোন লোকের মধ্যে এ শক্তি এত বেশী দৃঢ় হয় যে, বাহ্য ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও তা নিজ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে থাকে। তাই জাগ্রত অবস্থায়ও এ শক্তির অধিকারী ব্যক্তি এমন সব বস্তুও দেখতে পায়, যা অন্যান্য লোকেরা স্বপ্নলোকে অবলোকন করে থাকে।

কল্পনাশক্তি বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ ক'রে সেগুলোকে নিজ আয়ত্তে এনে রদ-বদল সহকারে সাধারণ জ্ঞান বা অনুভূতির কাছে সোপর্দ করে। এমতাবস্থায় মানুষ আশ্চর্য ধরনের ঐশ আকৃতি ও ঐশ আওয়াজ দেখতে পায়, শুনতেও পায়। এসব আকৃতি ও আওয়াজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকৃতি ও আওয়াজের মতই দৃষ্ট ও শ্রুত হয়। এটা হলো নুবুওয়াতের নিম্ন পর্যায়। এর চাইতে উন্নত পর্যায় হলো— কল্পনাশক্তি সেগুলোতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। বরং সেই আকৃতিগুলো হুবহু সাধারণ জ্ঞান বা অনুভূতিতে রূপায়িত হয়।

এর চাইতেও উন্নত স্তর হলো—কল্পনাশক্তির সঙ্গে চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তির সমন্বয় সাধিত হওয়া। নুবুওয়াতের এ পর্যায়ে উক্ত তিনটি শক্তির সমাবেশ ঘটে। কুরআন মজীদে বর্ণিত কাহিনীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখতে পাবেন, রসূলুল্লাহ্ এক-একটি খণ্ড ঘটনাকে কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন! মনে হয় যেন তিনি সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং সেগুলোকে তিনি সম্পূর্ণ সত্য বলেই উপলব্ধি করেছেন।

এটা সকলেই স্বীকার করে যে, কল্পনাশক্তিতে যে সব রূপ অঙ্কিত হয়, সে সবই সাধারণজ্ঞান বা অনুভূতির স্তরে নেমে এসে চোখের সামনে ধরা দেয়। পাগলদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তারা যা কিছু কল্পনা করে, সেটাই তাদের নজরে ভেসে উঠে। আসল কথা হলো কল্পনাশক্তিটি চিন্তাশক্তি ও সাধারণ অনুভূতি—এ দু'টোর মাঝখানে অবস্থিত। সাধারণজ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূত রূপগুলোকে কল্পনাশক্তির সামনে উপস্থিত ক'রে সেগুলোকে পুনরায় নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। চিন্তাশক্তির কাজ হলো কল্পনাশক্তিকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে বিরত রাখা। সাধারণ অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি—এ দুটোর টানা-হেঁচড়া ও পারস্পরিক বিরোধের ফলে কল্পনাশক্তি তার কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে না। কিন্তু যখনই এ দু' শক্তির মধ্যে একটার জোর কমে যায়, তখনি কল্পনাশক্তি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ অনুভূতির চাপ যখন কল্পনাশক্তির উপর পড়ে না, তখন তা (কল্পনাশক্তি) চিন্তাশক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং নিজেকে কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত করে। আরো পরিষ্কার কথায়, কল্পনাশক্তি তখন তার সঞ্চিত রূপগুলোকে হুবহু সাধারণ অনুভূতির কাছে সোপর্দ করে। নিদ্রালোকে এই অবস্থাই ঘটে। আরো বিস্তারিত বিবরণে বলা যায় যে, যখন কল্পনাশক্তি চিন্তাশক্তির প্রাধান্য থেকে রেহাই পায় এবং সাধারণ অনুভূতির উপর তার আধিপত্য অর্জিত হয়, তখন তা' কাল্পনিক রূপগুলোকে সাধারণ অনুভূতির কাছে এমনিভাবে পাঠিয়ে দেয়, যাতে সেগুলোর দৃশ্য নজরে ভেসে উঠে। উন্মাদ ও ভীতির সময় এমনি অবস্থাই ঘটে থাকে। এজন্যই পাগলেরা উন্মত্ততার ভয়াল রূপসমূহ দেখতে পায়।

উক্ত বিবরণ থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, অদৃশ্য বস্তুর (গায়েবের) খবর দেওয়া কারো পক্ষে কেবল সে সময়েই সম্ভব, যখন তার ইন্দ্রিয় শক্তি অকেজো হয়ে পড়ে এবং তার উপর তন্ময়তা বিরাজ করে।

কোন কোন সময় কল্পনাশক্তি অত্যধিক কাজ করার দরুন দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সম্পূর্ণ বাদ দেয় এবং বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা তথা বিবেকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এমতাবস্থায় তা অজড় রূপসমূহ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে। গণকেরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে, তা এমনি অবস্থায়ই করে থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠে যে, পাগল, গণক ও ভূতাবিষ্ট লোকেরা যদি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, তবে নুবুওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব রইলো কোথায়?

এর উত্তর হলো—কল্পনার বিভিন্ন পর্যায় আছে এবং সেগুলো পরস্পর বিরোধীও হয়। কোন কোন দার্শনিকের মতে, এর সর্বোচ্চ পর্যায় হলো—চন্দ্রলোকের নিয়ন্তার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটা এবং তাতে সেখানকার জ্ঞান-রূপ আকারগুলো প্রতিফলিত হওয়া।

কল্পনার সর্বনিম্ন অস্তিত্ব জীবজন্তুর মধ্যে দৃষ্ট হয়। কোন কোন জন্তুর মধ্যে এ শক্তি মোটেও দেখা যায় না। বিভিন্ন লোকের কল্পনার মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, তার কারণ হলো—কোন কোন কল্পনা সত্য ও সঠিক হয়, কারণ সেগুলোর উৎস হলো পবিত্র আত্মা। আবার কোন কোন কল্পনা নিছক মিথ্যা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। কারণ সেগুলোর উৎস হলো—কলুষিত আত্মা। আবার কোন কোন কল্পনার অবস্থান এ দুটোর মাঝামাঝি। এখানে মনে রাখা উচিত, চিন্তা, কল্পনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে রকমারি রয়েছে:

১. নিছক চিন্তা, যাতে কল্পনার কোন আমেজ নেই।
২. নিছক কল্পনা, যাতে চিন্তার লেশমাত্র নেই।
৩. এমন চিন্তা, যা পুরোপুরি কল্পনাপ্রসূত।
৪. এমন কল্পনা, যা পুরোপুরি চিন্তাপ্রসূত।
৫. এমন ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যা কল্পনা থেকে উদ্ভূত।
৬. এমন কল্পনা, যা ইন্দ্রিয় জ্ঞান থেকে উদ্ভূত।

এমনিভাবে কোন কোন জ্ঞান পুরোপুরি অনুমানের পর্যায়ভুক্ত। আবার কোন কোন অনুমান জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত।

কুরআন মজীদে যেখানে 'জিন্'-এর কথা আছে, সেখানে 'অনুমান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিনের অস্তিত্ব ও সে সম্পর্কে বিদ্যমান ধারণা কল্পনাপ্রসূত। এদের আকার কেবল কল্পনার চোখেই দেখা যেতে পারে। কল্পনা, ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও চিন্তা-

শক্তি— এ দুটোর মাঝখানে অবস্থিত। তাই যে বস্তু কাল্পনিক, তার অবস্থান হবে জড়াত্মক ও আধ্যাত্মিক—এ দুটির মাঝামাঝি, যেমন জিন ও শয়তান। আর যে বস্তু মাঝামাঝি ধরনের হয়, তা হয়তো দু'দিকের যৌগিক হবে, নয়তো দু'দিক থেকে স্বতন্ত্র।

নুবুওয়াতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

এ বৈশিষ্ট্যটি চিন্তাশক্তির আওতাভুক্ত।

অজ্ঞাত বস্তু উপলব্ধি করার পদ্ধতি হলো—কয়েকটি জ্ঞাত বস্তুকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে অজ্ঞাত নতুন একটি বস্তু জ্ঞাত হয়। যেমন, আমরা জানতাম, বিশ্বে নিত্য পরিবর্তন সাধিত হয়। আরো জানতাম, যে বস্তুতে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা ধ্বংসনীয়। এ দু'টি ভূমিকাকে (অবলম্বনকে) আমরা যখন এভাবে সাজালাম—বিশ্ব পরিবর্তনীয় এবং যা পরিবর্তনীয়, তা নশ্বর, তখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম—'বিশ্ব নশ্বর'। এ অনুসিদ্ধান্তটি আমাদের কাছে জ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আশ্রয়বাক্যগুলো (ভূমিকা)-পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল। নবীর জ্ঞান লাভের জন্য এরূপ অবলম্বনের (ভূমিকার) প্রয়োজন নেই। বস্তুসমূহের জ্ঞান তাঁর অন্তরে এক দফায়ই ঢেলে দেওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়ঃ এ শক্তি তো নবী ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। কেউ যদি কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে, তবে সংশ্লিষ্ট বেশীর ভাগ জ্ঞান তার অন্তরে একবারেই উদিত হয়। তা হলে নবীর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এর উত্তরে বলা হবে যে, এ শক্তির বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। নবীর বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁর এ শক্তি উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হয়।

নুবুওয়াতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, দেহের উপর মানুষের ধ্যান-ধারণার প্রভাব অনিবার্য। মানুষ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, তখন তার দেহে বিশেষ এক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ক্রোধান্বিত হলে তখন তার দেহ অন্য একটি অবস্থা ধারণ করে। বন্ধুর রূপ মনে উদিত হলে তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষ ধরনের স্পন্দন অনুভূত হয়। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মিক শক্তি দেহের উপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। এখন কথা হলো—কোন ব্যক্তির আত্মা যদি নিজ

দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে কোন কোন শক্তিশালী আত্মার পক্ষে অন্যান্য পদার্থের উপর প্রভাব বিস্তার করা— যেমন শীতল করা, গতিশীল করা, গতিহীন করা, ঘনীভূত করা, কোমল করা (এবং এর ফলে মেঘ সৃষ্টি হওয়া, ভূমিকম্প হওয়া, ঝরনা প্রবাহিত হওয়া)—এসব মোটেও বিস্ময়কর নয়।

এরূপ শক্তির অধিকারী আত্মা যদি পূত-পবিত্র হয়, তবে তার অতিপ্রাকৃতিক কার্যাবলীকে বলা হয়—'মুজিযা' বা কারামত। আর যে আত্মা পূত-পবিত্র নয়, তার এসব কাজকে যাদু বা মন্ত্ররূপে অভিহিত করা হয়। আত্মার পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ফলেই এ শক্তি উন্নতি লাভ করে।

এখানে এটাও বলে রাখা উচিত, এ বিষয়গুলো কাল্পনিক নয়, বরং অভিজ্ঞতালব্ধ। তাই এগুলোর কারণ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হয়ে থাকে। কেউ যদি আত্মিক ক্ষমতার অধিকারী ও এরূপ আলোচনার যোগ্য হন এবং এসব ঘটনার পেছনে নিহিত কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাও করেন, তবে তিনি ভাবাবিষ্টও হবেন এবং এসবের যৌক্তিকতা অনুধাবনেও সক্ষম হবেন।

সমাপ্তি

মানবগোষ্ঠীতে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যাঁর ধারণাশক্তি এত প্রবল যে, শিক্ষা-দীক্ষার কোন প্রয়োজনেই তাঁর হয় না এবং তাঁর কল্পনাশক্তি এত নিখুঁত ও বলিষ্ঠ যে, জড় জগত তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না; আত্মিক ক্ষমতা-বলে তিনি যা উপলব্ধি করেন, তাই তাঁর সামনে রূপ ধরে উপস্থিত হয়; তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি এত প্রবল যে, কেবল জড় জগতের উপরই তিনি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম নন, বরং স্বর্গমণ্ডলও তাঁর ক্ষমতাধীন।

এর পরবর্তী মর্যাদা হলো সে ব্যক্তির, যিনি প্রথমোক্ত দু'টি ক্ষমতার অধিকারী। অতঃপর স্থান হলো সে ব্যক্তির, যাঁর শুধু চিন্তা-শক্তিই প্রবল। এর চাইতে নিম্নতর মর্যাদার অধিকারী হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর কাছে রয়েছে কেবল প্রবল কর্মশক্তি।

যিনি একাধারে এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তিনি যেন সম্রাট। উর্ধ্ব জগতের সঙ্গে তাঁর এত গভীর সম্পর্ক থাকে যে, তিনি ইচ্ছা করলেই সেই জগতের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।

আধ্যাত্মিক জগতের তো তিনি বাসিন্দাই। জড় জগতের উপর তিনি যেমন ইচ্ছা, তেমন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

এর চাইতেও যাঁর মর্যাদা কম, তিনি হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর বাদশাহ্। এর পরবর্তী শ্রেণীর লোকেরা উম্মত-এ-মুহম্মদীর মধ্যে 'শরীফ' বলে পরিগণিত।

যাঁদের মধ্যে কোনরূপ শক্তি নেই, কিন্তু সচ্চরিত্রের গুণে গুণান্বিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, তাঁরা হলেন জাতির সমঝদার লোক। তাঁরা জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র।

---

* আল্-হাম্‌দু লিল্লাহি রব্বিল্ আলামীন ওয়াল ওল্-আকিবাতু লিল্ মুত্তাকীন *

IFP—81-82—P—3250—1.9. 1981

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ